PARICHAYA :: APRIL 1963 :: Regd. No. C 3953



দাম : এক টাকা

পরিচয়ের পৃষ্ঠপট	১১৭৯	ভবানী সেন
আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ	১১৮৯	সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
গোলাপ হয়ে উঠবে (উপন্যাস)	১১৯৫	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপনারানের কূলে (স্মৃতিকথা)	১২০৯	গোপাল হালদার
শক্তি ও প্রযুক্তি বিদ্যা	১২১৫	কপিল ভট্টাচার্য
লণ্ডনের আর্ট গ্যালারিতে	১২২৩	অশোক রুদ্র
কবিতাগুচ্ছ	১২৩০	বিষ্ণু দে
	১২৩১	বিমলচন্দ্র ঘোষ
	১২৩২	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
	১২৩৩	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	১২৩৪	চিত্ত ঘোষ
	১২৩৭	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
	১২৩৯	তুষার চট্টোপাধ্যায়
	১২৪০	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
	১২৪১	মালিনী বসু
শিল্পীর স্বধর্ম	১২৪২	অসীম রায়
বাবলতলীর মাঠ পেরিয়ে (গল্প)	১২৫১	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
টয়েনবি : নূতন পর্যায়	১২৬১	সুশোভন সরকার
বিমূর্ত শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীনতা	১২৬৮	শঙ্কর আচার্য
"সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা"	১২৯০	সতীন্দ্র চক্রবর্তী
কবিতাগুচ্ছ	১৩১২	অরুণ মিত্র
	১৩১৩	রাম বসু
	১৩১৪	সিদ্ধেশ্বর সেন
	১৩২১	পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী
	১৩২২	তরুণ সান্যাল
	১৩২৩	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
	১৩২৫	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মস্কো থেকে প্রকাশিত বাংলা বই

সোভিয়েত ইউনিয়নে

রবীন্দ্রনাথ



রাশিয়ার চিঠির অধিকাংশ চিঠি সহ রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমনকালে তাঁর বিভিন্ন ভাষণ, আলাপ আলোচনার অনুলিপি, তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা সে দেশের কবির কবিতা ও আলোকচিত্র প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ ০'৮৭

ম্যাকসিম গর্কি

মা

ম্যাকসিম গোর্কির বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।
কাপড়ে বাঁধাই সুদৃশ্য জ্যাকেট ২'৫৬

কবিপক্ষ উপলক্ষে ২১শে মে পর্যন্ত আমাদের, পি, পি. এইচ ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের ও বিশ্বভারতীর বইয়ের খুচরা ক্রেতারা ১২% কম পাবেন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

বিষ্ণু দে-র নবতম কাব্যগ্রন্থ

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ বিষ্ণু দে-র রচনা আজ আর নূতন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনা প্রথম থেকেই পাঠক ও সমালোচক-সমাজে কাব্য বিষয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলেছিল। বিষ্ণু দে-র কবিতাকে সংবর্ধনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'এ তাজা মনের লেখা, যৌবনের ঢেউ পাথুরে উপকূলের উপরে উদ্বেল হয়ে উঠচে—কঠিনের সঙ্গে তরলের চলেচে লীলা। বাঁধা নিয়মে সুঠাম ভঙ্গীতে স্রোতের ধারা চলচে না—সহজে গা-ভাসিয়ে-দেবার মতো প্রবাহ নয়, থেকে থেকে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে ওঠে, ধাক্কা খেতে হয়।'

বর্তমান গ্রন্থে কবির ১৯৫৫—১৯৬১-র কবিতা সংকলিত হয়েছে। যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫'০০

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড

বাইশ স্ট্র্যাণ্ড রোড ॥ কলিকাতা এক

সূচীপত্র

কলকাতা (গল্প)	১৩২৬	দেবেশ রায়
ডাকবাংলার ডায়রি	১৩৩৮	সুবচনী
সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র	১৩৫৬	ধ্রুব গুপ্ত
পাঠকগোষ্ঠী	১৩৬১	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদকীয়	১৩৬২	গোপাল হালদার
	১৩৬৪	সিদ্ধেশ্বর সেন

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক
গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ...

কোন অলস দুপুরে নিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়েছেন কখনও? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত থেকে বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা' জলাশয়ের তটকে স্পর্শ করে? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেও যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলও এমনি সুদূরপ্রসারী—কোন বিশেষ ট্রেনের যাত্রাই শুধু তা'তে বিলম্বিত হয় না, পর পর বহু ট্রেনই বিলম্বিত হয়। ফলে, যাত্রী ও রেল-প্রতিষ্ঠান—উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, এই ঘটনার সঙ্গে একেবারেই সংশ্রবহীন সাধারণ মানুষই এই ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন।

পূর্ব রেলওয়ে

* অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই বিপদ-শৃঙ্খল, অযথা ব্যবহারের জন্য নয়।



ER/PA/D

পরিচয়ের পৃষ্ঠপট

ভবানী সেন

বাংলাদেশে প্রগতি-সাহিত্য এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার সমগ্র ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে 'বঙ্গদর্শন' যে নূতন আদর্শে বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল নতুন একটি পথরেখা, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে 'পরিচয়' পত্রিকা তাকেই দিয়েছিল স্পষ্টতর সূচি এবং দৃঢ়তর লক্ষ্য। 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'পরিচয়' পর্যন্ত বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস পরীক্ষা করলে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলার সামাজিক চেতনা যুক্তিবাদ, সামাজিক প্রগতি এবং বিজ্ঞানশীলতা নিয়ে আরম্ভ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় যখন পরিণত হয়েছিল ঠিক তখনই 'পরিচয়' তার বর্তমান বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন দু-দুটো যুগ পেরিয়ে এসে এখন তার তৃতীয় যুগে পদার্পণ করেছে। প্রথম যুগ হলো—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নব-জোয়ারের অধ্যায়, ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। এই নতুন জোয়ারের মধ্যেই 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ, ১৯৩১ সালে। (শ্রাবণ, ১৩৩৮)

দ্বিতীয় যুগে শুরু হয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের নব-জোয়ারের অধ্যায়। এই সময় 'পরিচয়' পত্রিকার নতুন পর্যায় আত্মপ্রকাশ করে। (শ্রাবণ, ১৩৫০ ; জুলাই, ১৯৪৩)

তৃতীয় যুগটি হলো স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কাল। এই সময়ই দেখা দিয়েছে নতুন পর্যায়ের প্রয়োজন। কারণ, বাংলার সংস্কৃতি আজ এমন এক

চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে তার ঐতিহ্যবিজয়ী যাত্রার দিক্‌নির্ণয় বহু বিবাদের সম্মুখীন।

প্রথম যুগ

বাংলা সংস্কৃতিতে আধুনিক কালের প্রগতি-চিন্তার প্রথম যুগটি সুস্পষ্টভাবে শুরু হয় ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি। তখন সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের চাঞ্চল্যকর সাফল্য জনমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, অভ্যুদয় ঘটছে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ঐক্যের ; ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল ভাবধারার স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি এখানেও পুরোধার কীর্তি। বাংলার লেখক-সমাজ তখন সাংস্কৃতিক অভিযানের ভিতর প্রতিক্রিয়া এবং প্রগতি এই দুই ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন এবং কৃষ্টির সঙ্গে সামাজিক প্রগতির যে একটি সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে তা আর উপেক্ষা করছেন না। "কৃষ্টির জন্য কৃষ্টি" এই প্রাচীন ভাবধারার স্থানে তখন সামাজিক প্রগতির স্বার্থানুগামী কৃষ্টির লক্ষ্য-সাধনা সচেতনভাবে বাংলার সংস্কৃতিবিদদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মৃত্যুর পূর্বে চিরতরুণ রবীন্দ্রনাথ, নিত্যনতুন যুগধর্মের চারণ কবির মতোই এই নতুন আন্দোলনের অভিষেকে পৌরোহিত্য করে যান।

প্রতিক্রিয়ার শক্তি তখনও সংস্কৃতিরাজ্যে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু নতুন জোয়ারের স্রোতে তা ভেসে ভেসে আসছিল, হঠাৎ এবং নতুন বলেই বোধহয় তখনও সেই কর্দম স্রোতের নিচে জমাট বাঁধার সুযোগ পায়নি। তখন জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, অ্যান্টি-ফ্যাসিজম, বিশ্বশান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা একচ্ছত্র রাজত্বের অধিকারী হয়ে উঠল, দলমত-নির্বিশেষে সমস্ত লেখক এবং শিল্পীই হলেন তার সমগোষ্ঠীভুক্ত। তখন মনে হলো, বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এক সর্বাঙ্গীন জাতীয় ঐক্যের রূপরেখা বুঝি তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় যুগ

কিন্তু ইতিহাসের যাত্রাপথ যে অত সহজ এবং সুগম নয় তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল চতুর্থ দশকে। ফ্যাসিস্ট হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত দেশ আক্রমণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোড়ন এবং বাংলার

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সংস্কৃতি জগতের আত্মচিন্তার ক্ষেত্রে নিয়ে এলো এক বিষম সংঘাত। এই সংঘাতের ভিতর দিয়েই দানা বেঁধে উঠল প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ। লেখক এবং শিল্পীরা তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন গণ-সংস্কৃতি সৃষ্টির ভাবধারায়, পরীক্ষা চলল নতুন ভাবে নতুন পথে নতুন সৃষ্টির। তৃতীয় দশকের বাহ্য ঐক্য গেল বিলুপ্ত হয়ে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার বিরোধী ভাবধারার ব্যবধান স্পষ্টতর রূপ ধারণ করল। ঐতিহ্যগতি প্রগতি স্রোতের তলায় তখন প্রতিক্রিয়ার কর্দম থিতিয়ে পড়তে আরম্ভ করে, জলে আর কাদায় বাধে ঘাতপ্রতিঘাত।

রবীন্দ্রনাথ এই নবযুগের উদ্বোধন দেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, যাবার আগে আশীর্বাদ করে যান প্রগতির শিবিরকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে যান যেন সত্যই যে "মাটির কাছাকাছি" আছে তার অন্তরের বাণী উৎসারিত হয় তরুণ গণ-সংস্কৃতির মধ্যে, সেখানে প্রতারণা যেন কোনোমতে স্থান না পায়।

প্রগতি-সংস্কৃতির স্রষ্টাদের মধ্যেই তখন আত্মচিন্তা এবং আত্মবিরোধ জন্মগ্রহণ করে, জীবন্ত ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই।

এমন একটি জটিল প্রশ্ন সেদিন প্রবল হয়ে ওঠে যার সম্পূর্ণ সমাধান আজও হয়নি। সে প্রশ্নটি হলো এই যে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার সম্বন্ধ কী হবে? যে-কর্মসূচি রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একান্ত পরিচায়ক, তাই কি হবে সংস্কৃতির একান্ত পথরেখা? বাংলা সংস্কৃতি তখন তথাকথিত বিশুদ্ধ আর্টের বিমানপোত থেকে নেমে বাস্তব জগতের ভূমি স্পর্শ করেছে। স্বভাবতই তখন গণসংগ্রামের শিবিরস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারা যেমন নিজ নিজ বক্তব্য হাজির করছে, তেমনি রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সংস্কৃতির কর্মধারার সম্বন্ধ কী হওয়া উচিত তাও তখন মতভেদের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তবু মতবাদজনিত এই সংঘাত ও প্রতি-সংঘাতের ভিতর প্রগতি-শিবিরের মধ্যে মোটামুটি একটি মতৈক্য সাধিত হয়েছিল।

ঐক্যের ভিত্তিপ্রস্তর

প্রগতিশীল সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো সমাজের প্রগতি। সুতরাং শ্রমসাধ্য সৃষ্টিশীল কর্মে নিযুক্ত সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাতে প্রতিফলিত হবে;

এবং তা উদ্বুদ্ধ করবে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের সহযাত্রীদের। এই ঐক্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান নতুন সৃষ্টির কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিল। সত্য বটে শৈশবসুলভ বাচালতা এবং রাজনৈতিক রণধ্বনির যান্ত্রিক অনুকরণ তার মধ্যে অশান্তি ও অসুস্থতা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কোনো যুগের কোনো সৃষ্টিশীল ইতিহাসই এই আদিম স্তর অতিক্রম না করে কখনও পরিণত বয়সে পৌঁছয়নি। প্রতিক্রিয়ার সেবাদাসেরা প্রগতি-আন্দোলনের ঐ সময়কার ত্রুটিগুলিকে সফলভাবে ব্যবহার করেছে, প্রগতির শিবিরেও এক ধরণের গোঁড়ামি তার বিপরীত গোঁড়ামিকে রসদ জুগিয়ে প্রতিক্রিয়া শিবিরকে বাড়তে দিয়েছে।

এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি প্রশ্ন তখন সবচেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করে। প্রশ্নটি এই যে—মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদী সংস্কৃতি বলতে ঠিক কী বোঝায়? সংস্কৃতির এমন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে কিনা যা মার্কসবাদ-নিরপেক্ষ? এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী মতবাদ মাথাচাড়া দেয়—একটি হলো কৃষ্টির জন্য কৃষ্টির নিরপেক্ষতা এবং অন্যটি হলো কৃষ্টিতে রাজনৈতিক রণধ্বনির যান্ত্রিক অনুকরণ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দুই ধারাই সমভাবে ভ্রান্ত। কারণ, একদিকে কৃষ্টি জীবনদর্শন থেকে নিরপেক্ষ হতে পারে না, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি সর্বদাই কোনো-না-কোনো জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি। অন্যদিকে—সংস্কৃতি হলো সামাজিক মানুষের চিন্তার উচ্চতম পর্যায়ের সৃষ্টি; কাজেই তা অনেক সূক্ষ্ম, বিচিত্র এবং পরিমার্জিত। কিন্তু কোথায় এর সঙ্গে যান্ত্রিকতার সীমারেখা এবং কোথায় সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের সঙ্গে তথাকথিত বিশুদ্ধ কৃষ্টির ব্যবধান, তার উপলব্ধি সহজ নয়। তাই এক্ষেত্রে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তৃতীয় যুগ

এই মতভেদের মীমাংসা হয়নি বলেই স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রগতি-সাহিত্য ও প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদ্যমহীনতা লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষমতালাভের পর ভারতের ধনিকশ্রেণী, বিশেষ করে তার চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নিজস্ব কায়েমী স্বার্থের সাধনায় বিভোর। তার পৃষ্ঠপোষক শিল্পিগণ মানবতাবাদের ঐতিহ্য বর্জন করে পশ্চিমী ধনিকসভ্যতার অন্ধ

অনুকরণে নিযুক্ত। তাঁরাই প্রগতির শিবিরকে ভাঙবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন: তাঁদের মূল রণধ্বনি হলো "কৃষ্টির জন্য কৃষ্টি" এবং "বিশুদ্ধ সংস্কৃতি"। বলা বাহুল্য যে এই তথাকথিত 'বিশুদ্ধ শিল্পের' রণধ্বনি দিয়ে তাঁরা তাঁদের বৈতালিকবৃত্তি চাপা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু বাংলার প্রগতিকামী তথা মার্কসবাদীদের মধ্যে কয়েকটি মূল সমস্যারই সমাধান হয়নি, তাই এই নতুন আক্রমণের সম্মুখে তাঁরা একতাবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারলেন না।

তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সঙ্গে একদিকে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের এবং অন্যদিকে সংস্কৃতির নিজস্ব সত্তার সম্পর্ক নির্ধারণ। সেজন্য স্বাধীনভাবে ভুল করার সাহস নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য এদিক থেকে আমাদের মূল্যবান সহায়ক।

মানবতাবাদেরই শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদ সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও বিজ্ঞানবিরোধী মতান্ধতার পরিপন্থী। মার্কসবাদ হলো সৃষ্টিশীল জীবনদর্শন। তথাকথিত 'বিশুদ্ধ সংস্কৃতি' যতই বিশুদ্ধ হোক—তা যদি বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদের প্রতি নিরপেক্ষ অথবা উপেক্ষাপ্রবণ হয়, তাহলে তা হয় কুসংস্কারেরই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিই এই উক্তির সাক্ষ্য। সুন্দরের সাধনায় তিনি মানুষের মহত্ত্ব ও জীবনের জয়যাত্রাকেই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এইখানেই তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের যোগসূত্র। এই সত্যটি মেনে নিলে প্রগতি-সাহিত্যের একটি সাধারণ সীমান্ত-রেখা খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক যতই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই যে প্রগতিশীল সংস্কৃতির চৌহদ্দি কয়েকটি মূল নীতির মধ্যে অবস্থিত।

প্রগতির সম্মিলিত ফ্রন্ট

এই সীমারেখার মধ্যে রয়েছে উন্নততর মানব-জীবনের সাধনা—যার অর্থ গোঁড়ামি থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ঘনীভূত সারবস্তু; অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান—ক্ষুধা-মুক্ত, ব্যাধি-মুক্ত, হিংসা-মুক্ত সমাজের সাধনা।

এই সীমারেখার মধ্যেই অবস্থিত সর্বযুগের সর্বকালের সর্বসাধারণের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা—নরহত্যাবর্জিত বিশ্বশান্তি; অর্থাৎ সমগ্র মানব সমাজের পরম কল্যাণময় সুন্দরতম বিকাশ।

এই সীমারেখারই অন্যতম দিগ্বলয় হলো মানবতার জঘন্যতম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণমানবের মহা-অভ্যুত্থান ; অর্থাৎ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়যাত্রা।

এই সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্রের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত বাস্তবতার প্রতি চিরন্তন আস্থা ; অর্থাৎ, 'সত্যমেব জয়তে' এই মহাবাণীতে কেন্দ্রীভূত, তর্কহীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বকেই সৃষ্টিশীল রূপ দিয়েছিলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির নবযুগ রচনাকারীগণ।

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রামমোহন রায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে বিকশিত করে গেছেন তার মূলমর্ম হলো মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতা। ইদানিং সীমান্ত-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সেই মহান ঐতিহ্যকেই বিপন্ন করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বদেশপ্রেমকে প্রগতিশীল জাতীয়তার সীমার বাইরে টেনে এনে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আভিজাত্য দান করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে অবমাননা ঘটানো হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। সীমান্তযুদ্ধে প্রতিবেশী চীনের ভারতবিরোধী সশস্ত্র অভিযান ন্যায়সঙ্গত কারণে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ছিল পবিত্র স্বদেশপ্রেম। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের আজ্ঞাবহ কতিপয় প্রভাবশালী সংস্কৃতিবিদ সেই পবিত্র স্বদেশপ্রেমকে কলুষিত করছেন গণতন্ত্র বিরোধী যুদ্ধবাজ জঙ্গী সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। স্বাদেশিকতার নামে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দমনের স্বপক্ষে সংস্কৃতির ওকালতি, শান্তির জন্য মানবিক আবেদনের পরিবর্তে যুদ্ধ-প্ররোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের জয়ধ্বনি—এই ধ্বনি হলো সেই অশুভ সঙ্কেত যা রবীন্দ্রনাথ-টলস্টয়-রোমাঁ রোঁলার মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে কিপ্লিং এবং স্পেংলারের ফ্যাসিস্ট মনোবিকারকে বাংলা সংস্কৃতির উপাদান করে তুলেছে। এরই নগ্নরূপ সেদিন দেখা দিয়েছিল 'অঙ্গার' নাটকের বিরুদ্ধে গুণ্ডাবাজিতে। "স্বাধীন সংস্কৃতির" নামে তা সৃষ্টি করতে চায় কায়েমী স্বার্থের দলীয় নীতির বাধ্যতামূলক বৈতালিকবৃত্তি। আচার্য বিনোবা ভাবে, সত্যজিত রায় কেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও ওদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অনেকেই বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন।

বিশুদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির শরীরে কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক কর্মসূচির উর্দি পরায়, এই অভিযোগ তুলে একদা যাঁরা প্রগতি সাহিত্যের মঞ্চ পরিত্যাগ করেন, আফ্রো-এশিয়ান সাহিত্যের আসরেও ঔপনিবেশিকতা বিরোধের কথা তুলতে অস্বীকৃত হন, তাঁরাই এখন ফ্যাসিস্ট কর্মসূচির ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির পদবন্ধন রচনা করছেন। বড় বড় অক্ষরে লিখে যে-সাইনবোর্ড তাঁরা 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'-এর দরজায় টাঙিয়েছেন তার ওপর নজর বুলোলেই ধরা পড়ে মানবতার বিরুদ্ধে রজতকাঞ্চনের আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বঙ্গ সংস্কৃতিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার মূলমন্ত্র ছিল ধনতন্ত্র-বিদ্বেষ এবং সমাজতন্ত্র-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথ কোনো দেশের বিরুদ্ধেই যে-কোনো প্রকার অন্ধ-বিদ্বেষের বা তার অন্ধ অনুকরণের প্রতি ছিলেন ক্ষমাহীন। কিন্তু আজ স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ছায়াতলে সমবেত হয়েছেন এমন অনেক ক্ষমতাপুষ্ট সাহিত্যিক যারা আমেরিকান গোষ্ঠীর অন্ধ স্তাবক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অন্ধ-বিদ্বেষী। রবীন্দ্রমানসের পবিত্রতাকে তাঁরা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিতে চাইছেন। সভ্যতার সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথ যে বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এঁরা তাকেই আবার আভিজাত্যের আসনে বসাবার অপচেষ্টায় নিযুক্ত।

এঁদের এই অবক্ষয়ধর্মী ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সমবেত জেহাদ টলস্টয়, রোমাঁ রোঁলা এবং রবীন্দ্রনাথের পবিত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে এবং তার জন্য চাই প্রগতির সম্মিলিত ফ্রন্ট। এই সংযুক্ত শিবিরের সীমারেখার মধ্যে মিলিত হোক দলগত নির্বিশেষে প্রগতিশীল জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের পতাকাবাহীগণ। এই সীমারেখার মধ্যেই থাকবে সৃষ্টির স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা এই সীমারেখার বাইরে গেলেই সর্বপ্রকার বিকৃতিতে বিলুপ্ত হয়, সভ্যতার শীর্ষস্থানে প্রকাশিত হয় বর্বরতা। এবং বর্বরতা হলো সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত।

পল্লীর সাংস্কৃতিক নবজীবন

প্রগতিশীল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মতভেদ, বিতর্ক এবং ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের যে প্রচুর ক্ষেত্র বর্তমান তা অবশ্যই স্বীকার্য। এমনকি একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ বলতে কী বোঝায়

এই সীমারেখারই অন্যতম দিগ্বলয় হলো মানবতার জঘন্যতম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণমানবের মহা-অভ্যুত্থান; অর্থাৎ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়যাত্রা।

এই সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্রের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত বাস্তবতার প্রতি চিরন্তন আস্থা; অর্থাৎ, 'সত্যমেব জয়তে' এই মহাবাণীতে কেন্দ্রীভূত, তর্কহীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বকেই সৃষ্টিশীল রূপ দিয়েছিলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির নবযুগ রচনাকারীগণ।

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রামমোহন রায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে বিকশিত করে গেছেন তার মূলমর্ম হলো মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতা। ইদানিং সীমান্ত-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সেই মহান ঐতিহ্যকেই বিপন্ন করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বদেশপ্রেমকে প্রগতিশীল জাতীয়তার সীমার বাইরে টেনে এনে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আভিজাত্য দান করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে অবমাননা ঘটানো হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। সীমান্তযুদ্ধে প্রতিবেশী চীনের ভারতবিরোধী সশস্ত্র অভিযান ন্যায়সঙ্গত কারণে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ছিল পবিত্র স্বদেশপ্রেম। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের আজ্ঞাবহ কতিপয় প্রভাবশালী সংস্কৃতিবিদ সেই পবিত্র স্বদেশপ্রেমকে কলুষিত করছেন গণতন্ত্র বিরোধী যুদ্ধবাজ জঙ্গী সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। স্বাদেশিকতার নামে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দমনের স্বপক্ষে সংস্কৃতির ওকালতি, শান্তির জন্য মানবিক আবেদনের পরিবর্তে যুদ্ধ-প্ররোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের জয়ধ্বনি—এই ধ্বনি হলো সেই অশুভ সঙ্কেত যা রবীন্দ্রনাথ-টলস্টয়-রোমাঁ রোঁলার মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে কিপ্লিং এবং স্পেংলারের ফ্যাসিস্ট মনোবিকারকে বাংলা সংস্কৃতির উপাদান করে তুলেছে। এরই নগ্নরূপ সেদিন দেখা দিয়েছিল 'অঙ্গার' নাটকের বিরুদ্ধে গুণ্ডাবাজিতে। "স্বাধীন সংস্কৃতির" নামে তা সৃষ্টি করতে চায় কায়েমী স্বার্থের দলীয় নীতির বাধ্যতামূলক বৈতালিকবৃত্তি। আচার্য বিনোবা ভাবে, সত্যজিত রায় কেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও ওদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অনেকেই বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন।

বিশুদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির শরীরে কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক কর্মসূচির উর্দি পরায়, এই অভিযোগ তুলে একদা যাঁরা প্রগতি সাহিত্যের মঞ্চ পরিত্যাগ করেন, আফ্রো-এশিয়ান সাহিত্যের আসরেও ঔপনিবেশিকতা বিরোধের কথা তুলতে অস্বীকৃত হন, তাঁরাই এখন ফ্যাসিস্ট কর্মসূচির ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির পদবন্ধন রচনা করছেন। বড় বড় অক্ষরে লিখে যে-সাইনবোর্ড তাঁরা 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'-এর দরজায় টাঙিয়েছেন তার ওপর নজর বুলোলেই ধরা পড়ে মানবতার বিরুদ্ধে রজতকাঞ্চনের আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বঙ্গ সংস্কৃতিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার মূলমন্ত্র ছিল ধনতন্ত্র-বিদ্বেষ এবং সমাজতন্ত্র-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথ কোনো দেশের বিরুদ্ধেই যে-কোনো প্রকার অন্ধ-বিদ্বেষের বা তার অন্ধ অনুকরণের প্রতি ছিলেন ক্ষমাহীন। কিন্তু আজ স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ছায়াতলে সমবেত হয়েছেন এমন অনেক ক্ষমতাপুষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা আমেরিকান গোষ্ঠীর অন্ধ স্তাবক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অন্ধ-বিদ্বেষী। রবীন্দ্রমানসের পবিত্রতাকে তাঁরা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিতে চাইছেন। সভ্যতার সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথ যে বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এঁরা তাকেই আবার আভিজাত্যের আসনে বসাবার অপচেষ্টায় নিযুক্ত।

এঁদের এই অবক্ষয়ধর্মী ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সমবেত জেহাদ টলস্টয়, রোমাঁ রোঁলা এবং রবীন্দ্রনাথের পবিত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে এবং তার জন্য চাই প্রগতির সম্মিলিত ফ্রন্ট। এই সংযুক্ত শিবিরের সীমারেখার মধ্যে মিলিত হোক দলগত নির্বিশেষে প্রগতিশীল জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের পতাকাবাহীগণ। এই সীমারেখার মধ্যেই থাকবে সৃষ্টির স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা এই সীমারেখার বাইরে গেলেই সর্বপ্রকার বিকৃতিতে বিলুপ্ত হয়, সভ্যতার শীর্ষস্থানে প্রকাশিত হয় বর্বরতা। এবং বর্বরতা হলো সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত।

পল্লীর সাংস্কৃতিক নবজীবন

প্রগতিশীল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মতভেদ, বিতর্ক এবং ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের যে প্রচুর ক্ষেত্র বর্তমান তা অবশ্যই স্বীকার্য। এমনকি একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ বলতে কী বোঝায়

তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে। বিশেষত যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারার যখন পরিবর্তন ঘটে তখন মতাদর্শগত বিতর্ক নিশ্চয়ই অপরিহার্য। কিন্তু সংস্কৃতির সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত নির্যাতিত জনগণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন যে সাংস্কৃতিক স্রষ্টাদেরই প্রাথমিক দায়িত্ব, অন্তত এ বিষয়ে প্রগতি শিবিরে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই। দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে হলে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও উন্নত রুচি-সম্পন্ন সাহিত্যের প্রসার একান্তভাবেই আবশ্যক। শিক্ষাই হলো জ্ঞানের বাহন এবং শিক্ষা মানে সর্বপ্রথম নিরক্ষরতার অবসান। সুতরাং শিক্ষার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ এবং নিরক্ষর লোকের মধ্যে অক্ষর পরিচয়ের প্রসারও প্রগতি-শিবিরেরই প্রধান দায়িত্ব। যে-সৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে, তা জনমনে কোনো আলোড়ন আনতে পারে না; সুতরাং সে-সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা। ইতিহাসের গতিবেগ তার মধ্যে অনুপস্থিত বললেও নেহাৎ অত্যুক্তি করা হয় না। ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জগতের আহৃত সম্পদ অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে—তাকে পৌঁছে দিতে হবে বস্তির এবং পল্লীর অচলায়তনগুলির মধ্যে। এই সমস্ত অন্ধকার কোটরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় যে যুগে যুগে ইতিহাসের যারা হয় সৃষ্টিকর্তা তাদেরই মনের পিরামিডে প্রাচীনতম যুগের অসংখ্য মৃততত্ত্বের মমি বিরাজিত। যারা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী তাদের সাংস্কৃতিক প্রচারকবাহিনী বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক রসসৃষ্টির নামে এই মমিগুলিকেই রক্ষা করে। এই সমস্ত অচলায়তনের মধ্যে পঙ্কের অভাব নেই, কিন্তু মহাপঙ্কেরাও সক্রিয়। তাই প্রগতি-শিবির থেকেই দাদাঠাকুরদের নামতে হবে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে আলোক প্রবেশের পথ নির্মাণে। সেখানে বহন করে নিয়ে যেতে হবে সত্যকার ইতিহাস এবং সঠিক বিজ্ঞান। তাতেই তাদের চিন্তাশক্তি সৃষ্টিশীল রূপ ধারণ করবে, সাংস্কৃতিক রুচিরও হবে পরিবর্তন।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ইদানীং সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটছে। পল্লীর নিভৃত কন্দরে কৃষকদের ভেতর থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন বুদ্ধিজীবী। তারা শহরেও আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরূপে। পূর্বেকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাদের সামাজিক ব্যবধান সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, যদি-না গণতান্ত্রিক ভাবধারা নিয়ে প্রগতি-শিবিরের স্রষ্টারা অগ্রণী হয়ে দায়িত্ব

পালন করেন। প্রতিক্রিয়ার পতাকা যাঁরা বহন করেন তাঁরা তাদের কাছে পৌঁছে দেন যে-তত্ত্ব, যে-রুচি এবং যে-সংবেদন তা ঐ নতুন বুদ্ধিজীবীদের মনে বপন করে ওদেরই সমশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর বীজ। জনতাও প্রতারিত হয় ওদেরকে বিজ্ঞজন মনে করে। এই সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রগতি-শিবিরের নিষ্ক্রিয়তা যতদিন না বিদূরিত হবে ততদিন তার বন্ধ্যাদশা ঘুচবে না।

পল্লীর নব্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতিশীল মনের অভাব নেই। কিন্তু যে-গুরুমশাইরা প্রগতির প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরা সংগঠিত, কারণ সরকারী যন্ত্রের যারা চালক তাঁদেরই বৈতালিক ওঁরা। অথচ প্রগতি-শিবিরের যে-উদ্যম একদা সরকারী বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করত আজ তা আত্মতুষ্টিতে নিস্তেজ। অপরদিকে আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া ক্রমাগতই শক্তিশালী হচ্ছে। তাই নব্য-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে-প্রগতির বীজ বিদ্যমান তার অঙ্কুরোদ্গম বাধায় বাধায় বদ্ধ হয়ে পড়ে। পল্লীজীবনের প্রাচীন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে শহুরে কায়েমী স্বার্থের নব্য প্রতিক্রিয়া একত্র হয়ে কী যে অনাসৃষ্টি ঘটাচ্ছে তরুণ শিক্ষিত পল্লীসমাজের মনোজগতে, তা আমরা জানি না। কিন্তু ইতিহাসেই নজীর আছে, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শক্তি বিদ্রোহী কৃষক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের ৫৮ বৎসর পর রাজতন্ত্রেরই পুনর্জন্ম দান করেছিল। যে-কৃষক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান অক্ষশক্তি, সময় সময় সেই আবার হয়ে পড়ে প্রতিবিপ্লবের পদাতিক। সুতরাং আত্মসন্তুষ্টি প্রগতি-শিবিরের প্রধান শত্রু। দুর্নীতি, সমাজ-বিরোধী চরিত্র, প্রগতির বিরুদ্ধে গোঁড়ামির পুনরুজ্জীবন এবং অর্থবিত্তের নিকট প্রতিভার আত্মসমর্পণ যে-ভাবে বুদ্ধিজীবী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তা ভয়াবহ। সুতরাং প্রগতি-শিবিরকে অবিলম্বে আত্মসচেতন হতে হবে। তার কাছে আজ জনগণের ন্যূনতম দাবি—জ্ঞানের বিস্তার, যে-জ্ঞান নিজেকে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচাতে শেখায়, যে-জ্ঞান সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে, সমাজের ও প্রকৃতির সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে-জ্ঞানে, যা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতির মহাশত্রু। পল্লীজীবনে আবার দেখা দিক এই যথার্থ জ্ঞানের "তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়"। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবযুগস্রষ্টারা যা করেছিলেন সেদিনকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের জন্য, বর্তমান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হবে আধুনিক কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের জন্য।

'পরিচয়'-এর ভূমিকা

১৯৪৩ সালে 'পরিচয়'-এর নবপর্যায় শুরু হয়েছিল এমন একটি লক্ষ্য নিয়ে যা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে নবযুগধর্ম সঞ্চারিত করছিল। আজ তার জন্ম আর এক নতুন ভূমিকা পালন করবার ডাক এসেছে। তখনও 'পরিচয়' পার্টি-পত্রিকা ছিল না। আজও তা পার্টি-পত্রিকা হবে না। প্রগতির যৌথ স্বার্থে আজ তাকে বরং আরও ব্যাপকতর রূপ নিতে হবে। সেদিনও কমিউনিস্ট কর্মীরা 'পরিচয়'কে সমৃদ্ধিশালী হতে সাহায্য করেছেন প্রগতিশিবিরের দায়িত্ব পালনের জন্য, আজও তাঁদের দায়িত্ব হলো, এই নবপর্যায়ের 'পরিচয়'কে সুপ্রভাবিত করা প্রগতিশীল শিবিরের নবতম ভূমিকার সার্থকতা লাভের জন্য।

একথা ঠিক যে শুধু 'পরিচয়' দ্বারাই সব কাজ হবে না। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা যারা নতুন একটি আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে, কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট সর্বপ্রকার সৎ ও সুস্থ চিন্তার লোকদের নিয়ে। এই সমবেত কর্ম-প্রচেষ্টার মুখপত্র 'পরিচয়'। কাজেই কমিউনিস্টদেরই এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে। অপর সবাইকে সমান অধিকার দিয়ে সঙ্গে নেবার জন্য সহনশীলও হতে হবে তাঁদের।

প্রগতিশীল সংস্কৃতির আন্দোলন হবে গণসমাজমুখী, কিন্তু হয়তো 'পরিচয়' হঠাৎ এই মুহূর্তেই জনতার বোধ্য ভাষায় সংস্কৃতি পরিবেশন করতে পারবে না। তাতে আপাতত ক্ষতি নেই। যাঁরা সৃষ্টি করবেন সেই আন্দোলন, তাদের চিন্তা ও চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করবে 'পরিচয়' এবং প্রগতির শিবিরকে করবে ঐক্যবদ্ধ ও প্রসারিত। স্বভাবতই সত্যসন্ধানের ক্ষেত্র-স্বরূপ 'পরিচয়'-এর নির্দলীয় রূপ প্রগতির শিবিরকে দেবে একটি সামগ্রিক সত্তা। অথচ তার মূল সুরটি হবে প্রগতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

তাই প্রগতির একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে নববর্ষে পরিচয়ের নবপর্যায়কে স্বাগত জানাই।

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ নিয়ে আজ কিছু আলোচনা করব। আইনস্টাইন ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানবিদ আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি, শিল্পী ও দার্শনিক। এই দুই মহামনীষীর মধ্যে কোথায় কতটুকু মিল ও পার্থক্য তা এই আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈজ্ঞানিক খ্যাতির জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা নয়। আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আরও বড়-কিছু ছিলেন, যার জন্যে তাঁকে বিশ্বের মানুষ বলে বিশ্ববাসী স্বীকার করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। বিজ্ঞানজগতে তাঁর অবদানের তুলনা নেই—এ কথা যেমন সত্য, তার বিশ্বমানবতা ও মানবপ্রীতি পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁকে সমুচ্চ স্থান দিয়েছে—এ কথাও তেমনি সত্য। বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও আইনস্টাইন ছিলেন জাতীয়তাবাদী। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের আশ্চর্য মিল। স্বজাতি ও স্বদেশকে স্বীকার করেও স্বজাতি ও স্বদেশকে অতিক্রম করার সুমহান আদর্শই বিশ্বভারতীর মূল কথা। আইনস্টাইনের এই আদর্শবাদী মনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৯২৬ সনের ১১-১৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ বার্লিনে ছিলেন—এই সময়েই অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার হয় ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে, বার্লিনের অদূরে Kaputh নামক পল্লীতে আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে। ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের আর একবার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ফিরে তিনি কবি মেণ্ডেলের বাড়িতে অতিথি ছিলেন। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবার দেখা হয়। এই সময়ে আইনস্টাইন California Institute of Technology-তে Visiting Professor-রূপে

আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে যাবার পথেই নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার হয়।

১৯২৬ সনে প্রথম সাক্ষাতে আইন্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান হয়, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে নিজেই লিখে গেছেন :

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মেনিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে, আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের আলাপ হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল···প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করে তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য।···আইনস্টাইন ও আমার মধ্যে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে নূতন-নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবন-যাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন যাঁরা অনুশীলন করেছেন তাঁরাই জানেন যে পার্থিব সম্পদকে তিনি কখনই তুচ্ছ মনে করেন নি—তাঁর বিশ্বাস এই পার্থিব বস্তুর মাধ্যমেই অপার্থিব ঐশী সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্যেই তিনি যন্ত্রশিল্পের "সুচিন্তিত সদ্ব্যবহারের" কথা বলেছিলেন। ১৯৩০ সনের জুলাই মাসে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কথাবার্তা হয়, তার বাংলা অনুবাদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৯৪১ সনে কবির মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই ঢাকার 'বিজ্ঞান-পরিচয়' পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের বাংলা অনুবাদ অনেক পরে আইনস্টাইনের পরলোকগমনের পর 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সনে জুলাই মাসে যেদিন আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, তার দুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় যা বলেছিলেন, "Religion of Man" নাম দিয়ে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়কার চিন্তাধারাই আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

Kaputh-এর বাড়িতে আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন : বিশ্ব

থেকে বিচ্ছিন্ন ঐশী বস্তুর অস্তিত্বে কি আপনি বিশ্বাসী? রবীন্দ্রনাথ উত্তরে যা বলেছিলেন তার মর্ম তাঁর 'মানুষের ধর্ম' নামক পুস্তকে প্রকাশিত বক্তৃতাবলী ও এই বিষয়ের অন্যান্য লেখায় বিশদভাবেই আমরা পাই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যে-সত্যে বিশ্বাসী, তা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তিনি যে-বিশ্বে বিশ্বাসী, তা মানুষের সীমাবদ্ধ ধ্যানধারণার বিশ্ব নয়। তিনি লিখেছেন : "ব্যষ্টিগত মানব ঐক্যে বাঁধা দিব্য মানবের সঙ্গে, যিনি আমাদের অন্তরে আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ—এই অনন্ত মূলতঃই মানবিক।" এই কথাই তিনি নানাভাবে নানা জায়গায় বলে গিয়েছেন। 'মানুষের ধর্মে' আছে :

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন, যিনি মানব, অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব।·· এই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীব-সীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।···সেই মানবকেই মানুষ নানাভাবে পূজা করেছে—তাঁকে বলেছে—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—'স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক।"

এই একের সঙ্গেই নিখিল-বিশ্ব সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব এই মানুষেরই বিশ্ব। কলা, সাহিত্য ও ধর্ম-সম্বোধের মধ্যে এই ভাবনারই অনুসরণ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। এই সম্পর্কে আইনস্টাইনকে তিনি আরও বলেছিলেন—প্রতিজনের বিচ্ছিন্ন চেতনায় যে-সত্যের ছায়া পড়ে, তা থেকেই সর্বজনীন সত্য সম্ভব। বিশ্বকে যখন চিরন্তন মানুষের সঙ্গে একসুরে বাঁধা বলে অনুভব করি, তখনই তা আমাদের জ্ঞান-চক্ষে সত্য ও অনুভূতিতে সুন্দর। আইনস্টাইন প্রশ্ন করেছিলেন—সত্য ও সুন্দর, এ দুই-ই কি মানুষের নিরপেক্ষ নয়? রবীন্দ্রনাথের উত্তর—না। আইনস্টাইন প্রশ্ন করেন—মানুষ যদি না থাকে, তো বেলভিডিয়ারের অ্যাপলো কি সুন্দর থাকবে না? রবীন্দ্রনাথের উত্তর—না। আইনস্টাইন বলেছিলেন—সুন্দরের বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে নয়। সত্য যে মানুষের অস্তিত্বের অপেক্ষা না রেখেও সত্য, তার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু আমি

তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। উদাহরণস্বরূপ বলি—পীথাগোরাসের সূত্রে জ্যামিতিক যে-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়; রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেছিলেন—মানুষের অপ্রমেয় সত্তায় নিখিলবিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষী সত্তায় গৃহীত হতে পারে না, এমন কিছুই তো দেখা যায় না—কাজেই বিশ্বের যা সত্য তা মানব সত্য। বিশ্বেতর বিশ্বভুবনও মানবিক ভুবন।

মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্বন্ধে আইনস্টাইন যে-মত পোষণ করতেন, সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> "একক নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি! তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে—দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্তচুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়ত সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে আর আপনাতেই আপনার, তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

এডিংটন বলেছিলেন—প্রকাশ বা প্রতীকের জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানীর কারবার। নব্যবিজ্ঞানের এই মায়াবাদ রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু তিনি একে আরও ব্যাপকভাবে দেখেছিলেন। প্রতীকের সীমা ছাড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক মানবতা ও বিশ্বজনীন চিরন্তন সত্যের সম্বোধ বা উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূল কথা।

১৯৩০ সনে সেপ্টেম্বর মাসে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আলোচনা হয়, তা শুরু হয় নব্য বিজ্ঞানের অনির্দেশবাদ নিয়ে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, অণু-পরমাণুর জগতে নৈশ্চিত্যের স্থান নেই—অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতারই সেখানে প্রাধান্য; অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের ক্ষেত্রে বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব পূর্ব-নিরূপিত নয়, কার্য-কারণের নিয়ম এখানে অচল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আলোচনা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছিলেন : আমার বিশ্বাস, আমরা যা করি বা যা কিছুর জন্য আমরা বেঁচে আছি, সমস্তই কার্য-কারণত্বের অধীন, তবে আমরা যে তা সবসময় দেখতে পাই না, তা ভালোই।

সম্ভাব্যতা (Probability) ও আকস্মিকতাকে আইনস্টাইন কোনও দিনই মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৪৪ সনে ৭ই নভেম্বর আইনস্টাইন অধ্যাপক ম্যাক্স বর্নকে (Max Born) যে চিঠি লিখেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বহু বৎসর পরে। এই চিঠিতে আইনস্টাইন লিখছেন :

> "...you believe in a dice-playing God and I in the perfect rule of law in a world of something objectively existing which I try to catch in a wildly speculative way. I hope that somebody will find a more realistic way or a more tangible foundation for such a conception than that which is given to me. The great initial success of quantum theory can not convert me to believe in the fundamental game of dice..."

১৯৪৭ সনে ৩রা ডিসেম্বর আইনস্টাইন ম্যাক্স বর্নকে আরও একখানি প্রায় একই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন।

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতা আইনস্টাইনের মনকে একেবারেই সাড়া দেয় নি। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এ-সম্বন্ধে মতামত দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সত্য, কিন্তু জীবনদর্শনের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকতাকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন, পূর্ব-বিধানকেও তেমনি স্বীকার করেছিলেন। ১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আইনস্টাইনের সঙ্গে যে-আলোচনা হয়, তা থেকে এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই আলোচনায় আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের উল্লেখ করে আইনস্টাইন বলেছিলেন : বড় বড় উপাদানগুলির পারস্পরিক ব্যবহারের মধ্যে দেখা যায় শৃঙ্খলা—কিন্তু ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলির মধ্যে এই শৃঙ্খলাটা আর দেখা যায় না। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : আকস্মিকতা ও পূর্ব-বিধান—এই দুইয়ের চিরন্তন সঙ্গতির মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনলীলা চিরনবীন ও প্রাণবান হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেছিলেন : কর্মে মঙ্গলের সমস্ত নিয়মগুলি মেনে চলতে পারলেই আমরা সত্যকারের স্বাধীনতা পাই। কর্মের নিয়ম তো আছেই, কিন্তু যা সেগুলোকে সত্য এবং ইচ্ছাধীন করে তোলে, তা আমাদের চরিত্র—সেটা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ কবি, সুরকার ও চিত্রশিল্পী—আইনস্টাইন বিজ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ। দুয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য অন্তরের মিল ছিল। তা সত্বেও এ কথা বলতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রসধারায় পরিপ্লুত। বিজ্ঞানীর ক্ষেত্র—প্রকাশ ও প্রতীকের জগৎ ছাড়িয়েও যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান-প্রসূত রসসৃষ্টির জগৎ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে দিয়ে তা দেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন: "বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ আমি রস পাই মাত্র।" ভূমিকার আর এক স্থানে আছে: "প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে।" এই প্রকাশ ও অপ্রকাশলোকের কথাই আজ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল সুব্রতর। সারারাত ভালো ঘুম না হবার জন্যই বোধ হয় সে শরীরটা ভালো বোধ করছিল না। বাইরে বেরিয়ে দেখল গুচ্ছ গুচ্ছ জটলা। কিন্তু কথা অনেক কম। সকলেই যেন ভেতর থেকে ঘা খেয়ে ভয়ানক ভেঙে পড়েছে। যেন কাল রাত্রে এই বিশাল পরিবারের কোনো পরমাত্মীয়-বিয়োগ ঘটেছে। কিচেনে খাবার সময় অন্যদিন নানা গুলতুনি হয়। আজ কিছু না। 'নেশন' খবরের কাগজটা হাতে করে সুব্রত একবার আণ্ডারট্রায়াল ব্লকের দিকে এগিয়ে গেল। কাল সারাদিন নিত্যদার সঙ্গে দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসা দরকার। সব ঘরেই, সকলেই খবরের কাগজের চারপাশে গোল হয়ে ঝুঁকে রয়েছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা, পাকিস্তান, নতুন উদ্বাস্তু স্রোত—নানা কথার ফেনা। মানব এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মুষড়ে পড়েছে। আজ তাদের কাঁকরের প্যাকেট আর মাছের ওজন নিয়ে জেলারের সঙ্গে মোকাবেলা করার কথা ছিল। মানবের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তার আজ কোনো উৎসাহ নেই। এরকম ডিমরালিজেশন সুব্রত কখনো দেখেনি। কয়েদি এবং ফালতুদের মধ্যে নানা গুজব। হাজি নগরে একশ হিন্দুর লাশ পাওয়া গেছে একটা মসজিদের ভেতর থেকে। কলকাতা পাকিস্তান হয়ে যাবে।

নিত্যগোপালবাবুর ঘরে নিত্যগোপালবাবু-ই কেবল একা একা নিজের বিছানায় বসেছিলেন। আণ্ডারট্রায়াল ব্লকের 'ন' নম্বর হলঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

—খবর শুনেছেন। সুব্রত নিত্যদার বিছানার একপাশে বসল।

—এসো সুব্রত। হ্যাঁ শুনেছি। গলাখাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন নিত্যদা।

—কাল সারাদিন ছিলেন কোথায়, খুঁজলাম দুবার।

—কাল আমার ইণ্টারভিউ ছিল।

—ছিল? কে এসেছিলেন, বৌদি?

—হ্যাঁ।

—আর কে এসেছিলেন?

—আর একজন উকিল।

—উকিল কেন? থেমে থেমে যেন অনেক সময় নিয়ে নিত্যদা স্বব্রতর কথার জবাব দিলেন—বৌদি পৃথক হয়ে যেতে চান। বৌদিকে ওঁর বাপের বাড়ির সবাই বলছে—স্বব্রত তাকিয়ে রইল নিত্যদার দিকে। সে 'নেশন' কাগজটা নিয়ে এসেছিল নিত্যদার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করবে বলে। এখন কী বলবে সে।

—বৌদি বললেন সবাই সন্দেহ করে তোমাকে। আমি হাত চেপে ধরেছিলাম বৌদির। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি? তুমিও সন্দেহ কর। বৌদি হাত ছাড়িয়ে নিলেন স্বব্রত। তারপরে বললেন, 'আমি জানি তুমি কিছু করনি—কিন্তু কথাটা হলো না-জেনে করনি, না, জেনে করনি?' আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলাম। এ কথা তিনি বললেন! স্বব্রত—

—বলুন।

—তুমি কিছু বল।

—কী বলব বলুন তো?

—বল, যাহোক কিছু একটা বলো।

—আমি বিশ্বাস করি নিত্যদা, আমি জানি আপনি কিছু করেন নি।

—সে তো আমিও জানি, কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা নতুন হয়ে দেখা দিল। আমি নিজেই যে তার মীমাংসা করতে পারি না। কিছু করবার ছিল করিনি, না কিছু করবার ছিল না তাই করিনি।

আবার বিকেল। আবার সেই ডাল—ভীষণ ডাল্ লাগছিল স্বব্রতর। একটু পরে আলো গরাদে গরাদে ঠন ঠন করে হাতুড়ি বাজানো শব্দ। খানিক বাদে লকআপ হবে। তুঁত গাছতলায় আর কেউ প্রদীপ জ্বালে না। আস্তে আস্তে একটা হাঁ করা একঘেয়েমি যেন সব কিছুকেই গ্রাস করে ফেলছে। স্বব্রতর আর কিছু ভাবতে ভালো লাগল না। বোরডম যেন কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে।

—তুমি কোনোদিন কেদারের সঙ্গে গল্প করেছ স্বব্রত।

—না।

—কেদার লাইফার। ওর বৌকে জমিদারের তশিলদার ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ও তশিলদারকে কুড়ুল দিয়ে খুন করে। বিচারে ওর সাজা হয়ে যায়। প্রত্যেক মাসে ওর বৌ দেখা করতে আসে। ওর ছেলেটা এখন বড়ো হয়েছে বেশ, সেও আসে।

—কেন বলছেন এ সব?—স্বব্রত যেন নিত্যদার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছে না।

—এই জন্যে বলছি যে ওর মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ওকে দেখে মনে হয় না তোমার যে ও পরম নিশ্চিন্ত মনে কর্তব্য পালন করছে?

—তাতে কী হলো?

—শেষ বিচার কে করে স্বব্রত? শেষ বিচার করে মানুষের মন। সেই শেষ বিচারের ভার যার হাতে সেই যদি গোলমাল করে ফেলে তাহলে…

—'…'?

—তাহলে ভয়ঙ্কর জটিলতা। বিড় বিড় করে কথাগুলো যেন নিজেকেই শোনালেন নিত্যদা, তারপরে চুপ করে গেলেন। চুপ করে গেলেও স্বব্রত বুঝতে পারছিল যে মনে মনে তিনি সেই ভয়ংকর জটিলতার আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। স্বব্রতও আর কথা বলল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। এলোমেলা আর বিক্ষিপ্ত, অগোছালো এবং অসংহত —যেন অনেক কাজ ফেলে রেখে দিয়ে সে এখানে বৃথা সময় নষ্ট করছে। কত জানা বাকি, কত চেনা, কত কাজ—ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া—ভারতপথিক হবে বলে পণ করেছিল, এইতো সেদিন, এরই মধ্যে কী ফিকে হয়ে যাবে প্রতিজ্ঞার রঙ। দিনদিনান্ত পেরিয়ে চলতে চলতে এই সংশয় কি ক্রমেই গাঢ় হবে?

দিনের পর দিন খবর আসতে লাগল খারাপ। নতুন নতুন গোলমালের খবর। গঙ্গার এপারে-ওপারে শিল্পাঞ্চলেই যেন জমা হয়েছে যত বারুদ। খবরের কাগজের ভাষা উত্তপ্ত। খবরসন্ধানী অনুমান প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠেছে। সেদিন 'নেশন' কাগজের সম্পাদকীয় পড়তে পড়তে স্বব্রত অন্যমনস্ক হয়ে নানা কথা ভাবছিল। তারও বাড়ির কোনো খবর নেই। প্রিয়ব্রতকে সে নিজেই লিখে দিয়েছিল যেন তার খবরের জন্য বেশী ব্যস্ত না

হয়। চিঠি আসেনি কতদিন। মায়ের খবর কী কে জানে। গরম পড়ছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ। নিম গাছে কোকিল ডাকছে। নৃপেন বাড়িতে চিঠি লিখছে উপুড় হয়ে শুয়ে। নিত্যদার সঙ্গে তারপরে আর কথা হয়নি। অনেক ভেবেছে সুব্রত—আকাশপাতাল। কোনো কুলকিনারা করতে পারেনি। মানব নিত্যদার খবর কী করে যেন শুনেছিল। মন্তব্য করেছিল, এদের পেটিফগিং পেটি বুর্জোয়া কুঁই কুঁই তার ভালো লাগে না। সুব্রত একখানা মহাভারত আনিয়েছে। সেইখানাই ওল্টায় পাল্টায়। কখনো পড়ে, কখনো পাশে ঠেলে রাখে। এই একখানি বই-ই সে কিনেছে। নৃপেন হেসেছিল। এই দমদম জেলেই থার্টিজে দাদারা ক্যাপিটাল আনাতেন, সুব্রত এবার ফিফটির মুখোমুখি মহাভারত আনাল—ডেটটা দেওয়ালে লিখে রাখার মতো। সুব্রত বলেছিল ঘাবড়াস নি, মহাভারতের যুগের ক্লাস স্ট্রাগল স্টাডি করব। আলি সাহেবের সঙ্গে আর একদিন দেখা হলো সুব্রতর।

—খবর শুনেছ সুব্রত, গোটা ব্যারাকপুর বেল্ট জ্বলছে। আলি সাহেবের বিব্রত এবং পরাজিত মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রতর মায়া হয়েছিল।

—আমাদের গত বারো বছরের বেসগুলো জ্বলে যাচ্ছে সুব্রত।

—আলি সাহেব, আমি আবারও বলছি—আপনার সঙ্গে আমার মত মিলল না।

—কেন?

—বেসগুলো জ্বলে যাচ্ছে নয়, জ্বলে গেছে বলেই এমনটা হচ্ছে। বারাকপুর বেল্টে ওয়ার্কিং ক্লাশ মুভমেন্টের সে তাগদ থাকলে এমনটা হতো না। আমি সেদিন আপনাকে বলেছিলাম যে এতগুলো জায়গায় আমাদের বেস নষ্ট হয়ে গেছে, বস্তুতপক্ষে আমরা নষ্ট করেছি, তারপরে প্রতিক্রিয়া সেখানে মাথা চাড়া দেবে, এতো দুই আর দুইয়ে চার।

—আজকে একটা আলোচনায় বসা যাক। সুব্রত তুমিও এসো।

—আপনি বলেন যাব, তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে আর ইচ্ছে করে না।

—ধাক্কা খেতে ভয় খাবে?

—প্রশ্নটা ধাক্কার নয়, মানব সেদিন বলেছিল এ্যালিজিয়েন্স, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ্যালিজিয়েন্স টু হুম্? আগে আমায় নিজের সঙ্গে মোকাবেলা করতে দিন, পরে আমি অপরের সঙ্গে মোকাবেলা করব। আপনি জানেন না যদি আজ আমরা ভুল প্রতিপন্ন হই তাহলে অনেক কিছুই একেবারে

নিরর্থক হয়ে যাবে। আলি সাহেব আপনি রমেনকে জানতেন, রুচিকে জানতেন?

আলি সাহেব নীরবে মাথা নাড়লেন।—আসুন আপনাকে সে গল্পটা বলি। ফেব্রুয়ারীর মৃদু গরমেই আলি সাহেবের কপালে ঘাম জমেছে। সুব্রত রুচির গল্প বলতে লাগল।—তাই বলছিলাম আজ যদি বলা হয় ভুল হয়েছে সব তাহলে অনেকের পায়ের তলায় মাটি সরে যাবে।

আশ্চর্য, সেদিন রাত্রেই ঘুমের ঘোরে রুচিকে স্বপ্ন দেখল সুব্রত।

যেন সে মাথা ঘসেছে সেদিন। পরণে একটা লাল টকটকে শাড়ি। এত লাল যে তাকানো যায় না। খানিকক্ষণ তাকাল না সুব্রত। কিন্তু যখন তাকাল তখন দেখল ভুল ভাবছিল, তাকানো যায়। হাত নেড়ে নেড়ে সেই একই রকম ভঙ্গিতে মিনিটে একশটা কথা বলে চলেছে সে। তার প্রতি কথার মাত্রা 'ও মা' সেই একই আছে। সুব্রতর রুচিকে দেখে কী একটা কথা মনে পড়ে গেছে—যা ওকে বলা দরকার। কিন্তু কথাটা যে ঠিক কী তা ওর মনে আসছে না। রুচি বলছিল—জানেন গিয়েছিলাম ময়দানের মিটিঙে, জোলিও কুরির সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম দমদম জেলে এতগুলো রাজবন্দী আটকা আছে, তাদের কথা বলুন মিটিঙে···কী বললেন জোলিও কুরি? রুচি জবাব দিল। শোনা গেল না। হঠাৎ যেন সেই মশাল জ্বালানো জনসভাটাকেই সুব্রত দেখতে পেল। যো আগ জ্বালানে আয়েগা, উ আগসে খুদ জল যায়েগা···লক্ষ মানুষের গান—

ঘুম ভেঙে গেল। গরাদের বাইরে জেল পাঁচিলের ওধারে কী একটা গাছের শুকনো ডালগুলো দেখা যাচ্ছে। শূন্য, একটাও পাতা নেই। খাঁ খাঁ করছে গাছটা। শেষ রাতের ফ্যাকাসে চাঁদের আলো পড়েছে আণ্ডারট্রায়াল ব্লক আর ডেটিন্যু ব্লকের মাঝখানে সরু প্যাসেজের ওপর। ঐ গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রত ভাবল, না, আমি যাকে শূন্য বলে ভাবছি, তা আসলে শূন্য নয়। কাছে গেলেই দেখতে পাব, লক্ষ লক্ষ পাতার অঙ্কুর জেগে উঠেছে। আজ কাল পরশু, দেখতে দেখতে আবার গাছটা আগেকার মতো হয়ে উঠবে। সে দেখতে পাচ্ছে না বলেই শূন্যকে শূন্য বলে মনে করছে।

তাই বোধহয় সুব্রত নিজের বিচ্ছিন্নতাটাকে দূর করার জন্য কদিন উঠে পড়ে লাগল। সে সকলের সঙ্গে জোর করে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করল।

দূর দূর গ্রাম থেকে যে সব রাজনৈতিক আসামীরা এসেছে, ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করল। রাজবন্দীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে তাদের সাময়িক অভাব-অভিযোগগুলো মেটাবার জন্য উদ্যোগী হলো। অনেকেই লিখতে পড়তে জানে না। তাদের চিঠি-চাপাটি লেখার জন্য একটা স্থায়ী কমিটি গড়ে তুলল। অনেকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পায়নি—তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করল। এই করতে করতে তার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। মাঝখানে এক দলকে বক্সা বন্দীশিবিরে পাঠানো হবে গুজব শোনা গেল। ইতিমধ্যেই বক্সা বন্দীশিবিরে বাঙলাদেশের বড়ো একদল রাজবন্দীদের পাঠানো হয়েছে। সুব্রত শুনল যে বক্সায় পাঠানোর জন্য যাদের নাম বাছা হয়েছে ওর নাম নাকি তাদের মধ্যে আছে। এর মধ্যে একদিন বাড়ির চিঠি পেয়েছে সে। মায়ের শরীর নাকি ভালো না। অন্যবার গরম পড়লে একটু ভালো থাকে। এবার সে উপশমটাও দেখা যায় নি। কখনো কখনো এক দল বন্দী ছাড়া পায়। আবার নতুন এক দল আসে। এরই মধ্যে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো সুব্রতর। ছেলেটি নৈহাটী থাকে, নাম শান্তনু। সুব্রতর সমবয়সী। দেখা গেল ওরা রুচিদের চেনে। শান্তনু বলল রুচি স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, কলেজে ভর্তি হয়েছে। রুচির বাবা নৈহাটীতে বাসা করেছেন। ও বাড়িটা বেশ দিচ্ছেন। রুচির বাবা যে স্কুলে চাকরি করতেন সে স্কুলে হেডমাস্টার হয়েছেন তিনি।

—কী করে?

—এ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমাস্টার ছিলেন মুসলমান, তিনি পাকিস্তান চলে গেলেন, আর হেডমাস্টারমশাই প্যারালিসিস হয়ে শয্যাশায়ী। নেক্সট সিনিয়রম্যান যিনি তিনি বি. টি. নন, তারপরে একসটেনশনে আছেন ন্যাচারালি—

শান্তনুই বাইরের নানা খবর দিল। সুস্থ চেতনা নেই। কিছুর দাম নেই। যুদ্ধের সময় যারা আমেরিকানদের কাছ থেকে আর্মস কিনে জমিয়ে রেখেছে তারা বিভিন্ন জায়গায় মোড়ল হয়েছে। লোকে তাদের সমীহ করে, ভয় করে। ব্রথেলগুলো উপচে পড়ছে। রেললাইনগুলোর পাশে গজিয়ে উঠছে জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনি। প্রায়ই রেললাইনে একটা দুটো আত্মহত্যার কেস ঘটে। শান্তনুর ছবির সঙ্গে মানবের ছবির কোনো

মিল নেই। সেদিন শান্তনু বলল, জানেন সুব্রতবাবু এখন অবস্থাটা এমন যে সবই অবিশ্বাস্য, আবার সবই বিশ্বাস্য। যে লোকটাকে সেদিন মনে হয়েছে যে নির্ভর করা চলে, আজ সেই হয়তো সামান্য সুবিধের জন্য সব রকম স্ক্রুপুল বাদ দিয়েছে। রুচির বাবা হেডমাস্টার হবার জন্য যে সব রাস্তাগুলো পেরুলেন, সবগুলো ঠিক রাজপথ নয়। একথা সবাই বলছে। কে যে কার সম্বন্ধে কী বলছে, কী বলছে না তার কিছুই ঠিক নেই। শান্তনু সুব্রতকে যেন প্রমাণ হিসাবেই বলল—আপনার সম্বন্ধেও নানা জনে নানা কথা বলছে। সুব্রত একটু অবাক হলো।

—কী বলছে?

—বলছে যে রুচির জন্যেই আপনি রমেনকে এ্যাকশনের মুখে ঠেলে দিয়ে সরে পড়েছিলেন। রুচিদের বাড়িতে আপনার শেণ্টার নেবার কারণও নাকি তাই।

—কী বলছেন?

—যা বলছি। সবাই সব কিছুকে সন্দেহ করে। আটান্ন বছরের এক হোৎকা মাড়োয়ারী ষোলো বছরের একটা মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছিল আমাদের পাড়ায়। হৈ চৈ হলো খুব। আমি আমাদের ছেলেদের ব্যাপারটা হাতে নিতে বললাম। ছেলেরা একটু ঘাবড়ে গেল, বলল ওর সঙ্গে রাণাঘাটের রবি ঘোষালের দল আছে, বোমবাজিতে তারা ওস্তাদ। রবি ঘোষাল এমন একটা টেরর ও অঞ্চলে। নিজেই গেলাম। জানেন, কে আমাকে বাধা দিল? মেয়েটা, সেই ষোলো বছরের মেয়েটা, যার এখনো কলেজে যাবার সময় হয় নি, সে বাধা দিল। সে আমাদের বিশ্বাস করল না—প্র্যাকটিকালি তেড়ে মারতে এলো। এবং তার মা চুপ—কেউ বিশ্বাস করে না, তাই এখন সবই বিশ্বাস করে নিতে হবে। কেউ আর এখন সত্য বলে না, তাই মিথ্যাই এখন সত্য। ভাবতে ভাবতে সুব্রত যেন শান্তনুর অস্তিত্ব ভুলে গেল। ভুলে গেল দমদম জেলের কথা, মা, রুচি, রমেন, নিত্যদা—সব—সব। মনে হলো চোখের সামনে দেখছে এক বিপন্ন, বিব্রত, পরিক্লান্ত তরুণীকে, নির্জন মাঠের মধ্যে সব হারিয়ে সে যেন পরিত্যক্ত। মনে হলো যেন ঘোর ঘোর সন্ধ্যা নেমে আসছে—দূরে দূরে কেউ ডাকছে…

ঠিক এই সময় নিত্যদা এলেন। নিত্যদার মুখচোখ অস্বাভাবিক শুকনো। হাতে সেদিনের 'নেশন' কাগজটা। সুব্রত লক্ষ্য করল নিত্যদার হাত কাঁপছে।

সুব্রত 'আসুন নিত্যদা' বলে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বসার জায়গা করে দিল। নিত্যদা বললেন, না থাক আমি দাঁড়িয়েই থাকি।

—তুমি আজকের কাগজ দেখেছ?

—এখনো দেখিনি। খবরের কাগজের একটা খণ্ড এগিয়ে দিলেন নিত্যদা।

—পড়ো তো, এখনি পড়ো। নিত্যদা যেন নিজের উৎকণ্ঠায় ভেঙে যাবেন। নেশনে সেদিন কমিনফর্মের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কমিনফর্মের প্রবন্ধটিতে যা বলা হয়েছে তার নির্গলিতার্থ হলো ভারতবর্ষের পার্টির কর্মপন্থা যে খাতে চলছে তা ভ্রান্ত। ভ্রান্ত কথাটিকে ঠিক এভাবে না বলা হলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে এবং বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে সমুদয় পার্টি লাইনকেই যাচাই করা হয়েছে। সুব্রত রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রবন্ধটি পড়ে চলছিল।

—ভালো করে বুঝে পড়ো সুব্রত, মানব আমাকে বলেছে প্রবন্ধটা ঠিক ধরতে পারি নি।

সুব্রত একটা আনন্দ অনুভব না করে পারছিল না। যে সংশয় তার মধ্যে গত কয়েক মাস ধরে দেখা দিয়েছে তা যে ভুল নয়—প্রবন্ধটিতে সে কথাই আরো তাত্ত্বিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সবটা পড়ে ফেলল সে। ততক্ষণ নিত্যদা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শান্তনু খবরের কাগজের মফঃস্বল সংবাদ দেখতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে সুব্রত উত্তেজনায় অধীর হয়ে নিত্যবাবুর দিকে তাকাল। নিত্যদা বললেন—কী হলো সুব্রত?

—আমি একবার আলি সাহেবের কাছে যাব। শান্তনু—

—দাঁড়াও। সুব্রতর হাতটা চেপে ধরলেন নিত্যদা।—তাহলে ভুলই হয়েছে আমাদের? কিন্তু এখন আমার কী হবে? একবার লেফট, একবার রাইট? বলেই হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন নিত্যদা।—যদি ভুলই তোমরা স্বীকার করলে তো এক বছর আগে করলে না কেন?

সুব্রতর সমস্ত উদ্দীপনা যেন দপ করে নিভে গেল। একমুঠো ছাই হয়ে গেল তার তাত্ত্বিক উল্লাস।

সেদিনও সারা রাত সুব্রত ঘুমোয় নি। বাইরে হাওয়া দিচ্ছিল হু হু করে। এত হাওয়া যেন তুঁত গাছটা শিকড় ছিঁড়ে উড়ে চলে যাবে। এত হাওয়া যে অবাক লাগে ভেবে আকাশের তারাগুলো স্থির আছে কী করে। সারা মন তোলপাড় করছিল সুব্রতর। হাওয়ায় হাওয়ায় সমস্ত মনটা যে ভেসে চলে যেতে

চাইছে। ঐ ওধারে সিঁড়ির ধারে এই ব্লকে ঢোকবার মুখে সমীরের রক্তের দাগ এখনো পাওয়া যাবে। যাবে? নৃপেনের হাতখানায় চিরকালের জন্য দাগ থাকবে। নৃপেনই সমীরকে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। নৃপেন আজ বিকেল থেকে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। নীরব হয়ে গেছে শান্তনু। এখন সব কিছুই অবিশ্বাস্য, তাই সব কিছুই বিশ্বাস্য। শুধু মানবই একমাত্র যে দমে নি। চুপি চুপি সুব্রতকে বলে গেছে যে শান্তনুকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। ওর কোনো লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না। বিকেলের দিকে খবর এসেছে আলিসাহেব এবং আরো চৌদ্দ জনকে বক্সা যেতে হবে। নৃপেনও তার মধ্যে একজন।

না, শান্ত হতে হবে। নিজেকে গুছিয়ে সংহত করে তোলার চেষ্টা করল সুব্রত। 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে দর্শক হয়ে বসে থাকার জো নেই, সবাইকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। হুঁশিয়ার।' তাহলে এত মরীচিকা কেন? মরীচিকা নিঃসন্দেহেই ভ্রান্তি। যত সত্য বলেই সে মনে ধরুক না কেন। কিন্তু মরীচিকার জন্য ক্ষোভ থাকুক, মরীচিকাকে অস্বীকার করি সে তো ভালো কথাই—তাই বলে মরীচিকার জন্যেই পরাজিত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ব? মরীচিকার জন্য তো তৃষ্ণার তীব্রতা মিথ্যে হয়ে যায় না। মরীচিকা অশুদ্ধ, তৃষ্ণা তো অশুদ্ধ নয়। আমার প্রশ্ন কি মরীচিকা নিয়ে? না। আমার, কেষ্টদার, নিত্যদার, নৃপেন, শান্তনু কারো আকাঙ্ক্ষার ভিতরে কোনো গ্লানি নেই। তৃষ্ণা যে গ্লানিহীন, মালিন্যহীন। তাহলে এত ক্লান্তি কেন—কেন—সুব্রতর হঠাৎ মনে পড়ে গেল নৈহাটী-স্টেশনের সেই সদ্যোজাত শিশুটির কথা সে যে জন্মেই ক্লান্ত। সেই বড়ো বড়ো ভয়-ভয় চোখ মেলে চাইছিল যে আসন্নপ্রসবা তার মলিন শীর্ণ মুখখানির কথা। মনে পড়ল বুড়ি শাকওয়ালীর কথা। কত দিন ধরে ঐ বুড়ি নড়ি ধরে ঠুক ঠুক করে ভারতবর্ষের পথে এমনি করে হাঁটছে, কত শতাব্দী ধরে—ক্লান্ত—ক্লান্ত। নৃপেনের জায়গাটা কাল থেকে খালি হয়ে যাবে। সয়ে যাবে। সবই সয়ে যাবে।

পরের দিন আলিসাহেব যাবার আগে সুব্রতকে ডেকেছিলেন।

—তুমি বেরিয়ে গিয়ে মেম্বারশিপটা ফিরিয়ে নেবে।

—না।

—কেন।

—প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে আমি একটু দূরে থাকতে চাই। আসলে আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আলিসাহেব যেন একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসকে চেপে নিজের মধ্যেই কবর দিলেন। তারপরে চুপ করে গেলেন। সময়ের সুতো ধরে ঘড়ি মিলিয়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলের ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং—দিন চলতে লাগল, রোগাপটকা মানুষ গোদ-পায়ে যেমন চলে তেমনভাবে—ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে, টেনে হিঁচড়ে। মন্থরতার জন্য যেন তার কোনো ক্ষোভ নেই, গতির জন্য আগ্রহ নেই।

সারাদিন মেঘলা প্যাচপেচে। সারাদিন ভ্যাপসা গরম। আগস্ট মাসের দশ-এগারো। সুব্রত একা একা বসেছিল। নিত্যদা জামিনে ছাড়া পেয়ে চলে গেছেন। নৃপেন বক্সায়। ঘরের ওদিকে কয়েকজন তাস খেলছে। মেঘ-মেঘ আকাশ। বাড়িতে মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ি। নিত্যদার টি. আই. প্যারেড জেলখানাতেই হয়েছিল। পুলিশ জনা তেরো সাক্ষী এনেছিল। কেউ নিত্যদাকে সনাক্ত করেনি। নৃপেন বকসায় গেল—একটুও টসকালো না। মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল কোনো তদবির যেন না করা হয়। জেলে রাজনৈতিক আবহাওয়া বলতে আর কিছু নেই। বন্ধুদের মধ্যে দেখা যায় গামছা নিয়ে মাজন নিয়ে সামান্য কারণে কটু বাক্যবিনিময়। এক আজব কারণে বাইরে দাঙ্গা কয়েক মাস আগেই থেমে গেছে। চেম্বার অফ কমার্সের এক আহেলি সাহেব মোটরে আসছিলেন, জি. টি. রোড ধরে। ব্যাণ্ডেল লেভেল ক্রসিং-এর কাছে তাঁর আর্দালিকে জনতা ধরে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে সাহেবের প্রাণ যায়। দেখতে দেখতে খবরের কাগজওয়ালা থেকে শুরু করে পুলিশ মন্ত্রী পর্যন্ত সবায়ের টনক নড়ে ওঠে। তারপরে আর কোনো ঘটনা নেই। ঘটনা নেই কোনোদিকে। প্রায় রোজই দু-চার জন করে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায় ডোরাকাটা শার্ট, পাজামা পরা কয়েদি কর্মচারীরা হাঁকছে—হাতে শ্লিপ—শম্ভুনাথ জানা—খালাস, হরিপদ সামন্ত-খা-আ-লা-আস্। মানব ছাড়া পেয়েছে মাসদেড়েক হলো। সুব্রতর মুক্তির জন্য কোনো প্রতীক্ষা নেই। সামনের দিনগুলো সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ নেই। সময়ে অসময়ে শুয়ে বসে মহাভারতখানা ওল্টায়। বিশেষ করে সৌপ্তিক পর্ব। কুরুক্ষেত্রের মাঠের একটি ঘটনা তার

খুব ভালো লাগল। দ্রোণকে মিথ্যা বলা হবে কিনা, এ সম্বন্ধে পরামর্শ সভায় অর্জুনের নীরব প্রতিবাদ ও স্থান ত্যাগ। দিন চলে যায়। কুরুক্ষেত্রের বীরদের শব ঘেঁটে ঘেঁটে। প্রভাসের ব্যর্থতার আগাছায়। এরিমধ্যে সেদিন সকালে সুব্রতর ইণ্টারভিউ এলো।

সুব্রত অবাক হয়ে গিয়েছিল। কে আসবে? মা বিছানায়। প্রিয়ব্রত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নন্দিনী মাকে নিয়ে। সুব্রত দেখা করতে গিয়ে দেখল প্রিয়ব্রত। মায়ের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। প্রিয়ব্রত বলতে এসেছে পেরোলের ব্যবস্থা করা হোক। ওরা লোকাল ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে ধরা-করা করছে—সুব্রতও যেন একটা দরখাস্ত করে। দরখাস্ত করতে হবে লর্ড সিন্‌হা রোডে।

—দেখো না আমারই এখন মরবার সময় নেই। রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের একটা কন্ট্র্যাক্ট বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে।

শোকার্ত প্রিয়ব্রত—সুব্রতর মায়া হলো ভাইয়ের জন্যে।

—নন্দিনী ভালো আছে?

—আছে একরকম। বাড়ির দিকটা ওই সামলাচ্ছে বলতে গেলে। আমাকে বেরুতেই হচ্ছে। কাল ফিরেছি লাস্ট ট্রেনে। কোনোদিকে আলগা রাখার তো জো নেই, সমস্ত প্রভিন্সের লোক একটি বিষয়ে এককাট্টা—বাঙালীকে হটাতে হবে। যা হয়েছে—

—কে দেখছে মাকে?

—গোবিন্দবাবুই দেখছেন। হাঁপানিটা খুব বেড়েছে। রাতের পর রাত জেগে কাটায়। দেখা যায় না। যখন টানটা বাড়ে, নন্দিনী তাই—

পুলিশের যে ভদ্রলোক সাক্ষাতের সময় সদাই হাজির থাকেন তিনি একটা হাই তুললেন। সুব্রতরও সঙ্গে সঙ্গে একটা হাই তুলতে ইচ্ছে করল। তার এই ভাইটির কথা শুনতে শুনতে যেমন চিরকাল তার হাই উঠতে চায় আজও তেমনি মনে হলো। প্রিয়ব্রত বসে বসে আঙুল দিয়ে টেবিলে অদৃশ্য আঁকিবুকি কাটতে লাগল। হাইটাকে নিজের ফুসফুসের মধ্যেই ফিরিয়ে দিল সুব্রত। প্রিয়ব্রত কী ভাববে?

—নিচের ঘরগুলো ভাড়া দোব ভাবছি।

—ঘরগুলো তো তাহলে হোয়াইট ওয়াশ করাতে হয়।

—হোয়াইট ওয়াশ না আরো কিছু, আজকাল ঘর হলেই ভাড়াটে হয়। ভাড়া দোব একবার বলি না, সেলামি নিয়ে সাধাসাধি করবে সব।

—না না ওসব সেলামির লোভ করিস না। প্রিয়ব্রত চুপ করে রইল। সুব্রতর মনে হলো কেন যে সে নাক গলাতে যায়! প্রিয়ব্রত তার কোন্ কথাটা শোনে? মাকে পাশকরা ডাক্তার দেখাতে বললে সে দেখাবে না, গোবিন্দ ডাক্তার হাতুড়ে হলেও তাকেই ডাকবে—কিন্তু নন্দিনীর বেলায় কলকাতা যাবে। তার মানে এ নয় প্রিয়ব্রত মাকে ভালোবাসে না। বাসে। কিন্তু সুব্রতর যে গোবিন্দ ডাক্তারকে পছন্দ নয় এটা কেমন করে প্রিয়ব্রত জানে। আর সুব্রত পছন্দ না করলে সেটা প্রিয়ব্রতর বড়ো পছন্দ। নন্দিনীকে বিয়ে করার সময়েও তাই হয়েছিল। নন্দিনীকে সুব্রতর পছন্দ নয়—এটা মায়ের কাছ থেকে প্রিয়ব্রত কেমন করে জেনেছিল। প্রিয়ব্রত আর কারো মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই নন্দিনীকে বিয়ে করেছিল। অথচ সুব্রতর নন্দিনীকে অপছন্দ করার কোনো কারণ ছিল না। নন্দিনীর চেহারা আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মতো, চাকরি করে একটা অফিসে। কথাবার্তা মিষ্টি। সুব্রত পছন্দ করেনি মায়ের দিকটা ভেবে। এ বৌ মায়ের কী কাজে লাগবে? প্রিয়ব্রত সম্ভবত সেটাই বুঝেছিল। সুব্রত জানে যে প্রিয়ব্রত তার ওপর ক্ষুব্ধ। প্রিয়ব্রত দেখেছে ছোটবেলা থেকে সুব্রতর এড়িয়ে যাওয়া যত সংসারের ঝামেলা তাকেই বহন করতে হয়। বাজার দোকান ডাক্তার, ট্যুইশনি করে সুব্রতর ফি যোগানো, যোগাতে গিয়ে নিজে বি. এ.-তে গাঁড্ডা খাওয়া—রুগ্ন মায়ের দায়, এক কথায় পিতৃহীন সংসারের সকল দায়ই তার কাঁধে। ইউ. জি. পিরিয়ডে সুব্রত তো বাড়িমুখোই হলো না একবার। সুতরাং সুব্রত জানে যে প্রিয়ব্রত সুযোগ পেলেই একটা কথা তাকে ভঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে বাড়ির বড়ো ছেলে সুব্রত হতে পারে, কিন্তু বড়ো ছেলের কাজ সে করেনি। যে অফিসে নন্দিনী কাজ করে সেই অফিসেই একটা বড়ো ঠিকা ধরতে গিয়ে নন্দিনীর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর আলাপ হয়। এই আলাপই জমতে জমতে বিয়ে। মা, বাবা মারা যাবার পর থেকে কোনো ব্যাপারেই বিশেষ কথা বলে না—সেদিনও বলেনি। শুধু বলেছিল—পিঁড়েয় বসে সাতপাক ঘুরলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হতো, অফিস ফেরত বৌ নিয়ে বাড়ি ঢোকা! তবে নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে মা খুব খুশি হয়েছিল। মা ওদের দু-ভায়ের বৌয়ের মুখ দেখবে বলে যে দু-জোড়া বালা রেখে দিয়েছিল তারই একজোড়া নন্দিনীকে দিয়ে

মুখ দেখেছিল। সুব্রতর মনে আছে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে প্রথম প্রথম দু-চারদিন কথা বলতে তার কেমন আড়ষ্টতা বোধ হয়েছিল। নন্দিনীই 'দাদা' বলে সহজ করে নিয়েছিল সবটা।

—তাহলে আমি আজ চলি।

—হ্যাঁ। আমি উদ্বিগ্ন রইলাম। প্রিয়ব্রত কথাটাকে শুনল মাত্র।

—তোমার কথা বলছে খুব।

—কবে নাগাদ পেরোল পাব মনে হয়?

—দেখি হোম ডিপার্টমেণ্টে জানাশোনা আছে একজন।

—তোরও শরীর ভালো দেখছি নাতো।

—কোথ্থেকে দেখবে?

প্রিয়ব্রত চলে যাবার পর সুব্রত গেট পেরিয়ে নিজের ব্লকে ফিরে এলো। প্রিয়ব্রতই যেন তাকে খানিকটা বাস্তবের জগতে ফিরিয়ে এনেছে। সে চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাচ্ছে ওদের সেই উপকণ্ঠের শহরটা—জেটি-চিমনির ছায়াঙ্কিত গঙ্গা—ভারতবর্ষের বারো জাতের মানুষের ভীড়—বাজার দোকান—মিলের ভোঁ—সিংহমুখো জলকল—ওদের ছোট গলি—পুরনো দোতলা বাড়ি—একঘরে এককোণে মা রোগশয্যায়। সুব্রতকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল—আপনাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? সুব্রত বলল। অনেকেই কথা বলতে এসেছিল। সুব্রত ভীড় এড়াতে চাইল। কেদার ওর ভাঙা ভাঙা গলায় সান্ত্বনা দিল—কুছ ডর নেই। বেমার ভালা হবে। কেদার কথা বেশি বলতে পারে না। সব আবেগই ওর গলার কাছে এসে রুদ্ধ হয়ে পড়ে—কথা থাকে না—লাল হয়ে যায় মুখ—চোখে জেগে ওঠে একটা নির্বোধের দৃষ্টি। কেদার চুপ করে তাকিয়ে থাকল। সুব্রত হেসে কেদারকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

ফাঁকা হয়ে গেছে 'ডি' ব্লক। যেন ভাঙতি মেলা। কী আশ্চর্য সারা ভেটিন্থ্যা ওয়ার্ড যখন মানুষে বোঝাই ছিল তখন প্রাণের আবেগে চনমন করত জেলখানা। এখন নির্জনতা নামছে এখানে। ব্যর্থ হয়ে গেছে আন্দোলন—জেলখানাতেও নির্জনতার উদাস ছায়া। মানুষই সব থেকে স্পর্শ করে মানুষকে, আর কিছু নয়। একদিন জেলখানায় এত রাজনৈতিক বন্দী দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুব্রত। আজ জেলখানায় শূন্যতা নামছে দেখে ক্লান্ত বোধ করছে কেন? এ তার নিজেরও শূন্যতা? এই শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে

সেই বুড়ির জন্ম সে আকুল হলো। যে বুড়ি একজোড়া বালা হয়তো এখনো রেখে দিয়েছে সযত্নে, গোপনে। আগস্টের আকাশ কেঁদে কেঁদে বিনিয়ে বিনিয়ে এক কথাই যেন ঘুরে ফিরে বলে চলল। কোথায় তফাৎ—সেই শাকওয়ালী বুড়ির নাতি আর আমার বুড়ি মায়ের আমি—একই বেদনা, একই আকুলতা। আসলে হয়তো এই বেদনাই সত্যিকার সাম্য-বিধায়ক—বেদনারই কোনো শ্রেণীভেদ নেই। ভাবতে ভাবতে সুব্রত শুনতে পাচ্ছিল না, পাগলি ঘণ্টি বাজছে—ঢং-ঢং ঢং-ঢং, ঢং-ঢং। বাঁশী বাজছে ওয়ার্ডারগুলো ছুটোছুটি করছে। কয়েদিরা যে যেখানে ছিল ছুটে যে যার সেলের দিকে যাচ্ছে। কেদার ওকে জানিয়ে দিল—গিন্‌তি হোগা, মাসকাবারী ঘণ্টি। সেলের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল ও। এত বড়ো ঘরটায় এখন মাত্র সাত জন। বাকিরা খালাস—আমি এখনো কয়েদি। ছুটির ঘণ্টার মতো ঘণ্টি বাজছে—ঢং-ঢং ঢং-ঢং ঢং-ঢং। সুব্রত গরাদে চেপে ধরল মুখ। কে বন্দী নয়? সুব্রত এখানে চৌদ্দ নম্বর সেলে—যে লোকটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে গোল গম্বুজে দাঁড়িয়ে সে—কে বন্দী নয়? প্রহরী এবং কয়েদী কি প্রকৃতপক্ষে একই শেকলের দু-দিকে দু-জন নয়? সাইবেরিয়ায়—সিং সিং জেলে, বক্সায় সর্বত্র মানুষ নিজেকেই বন্দী করেছে নানা ছলে। এক-একটা বিচিত্র মুহূর্তে সুব্রতর মনে হয় যেন ওয়ার্ডারগুলোই কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে। ঢং-ঢং, ঢং-ঢং দ্রুত হৃৎপিণ্ড যেন দুলছিল, উত্তেজনায় অস্থির। হঠাৎ থেমে গেল আওয়াজটা, আচমকা ধাক্কা খেয়েছে সুব্রত। এমনি করেই থামে নাকি?—একটু একটু করে জেল আবার স্বাভাবিক হলো—হঠাৎ সুব্রত শুনতে পেল কে যেন হাকছে—সুব্রত চৌধুরী খা-আ-লা-আস্। লাফিয়ে উঠল সুব্রত। খালাস। কেদার এগিয়ে এল—ছুটি হোয়ে গেলো। সত্যিই ছুটির ঘণ্টা বাজল। মা—আর কিছু নয়—এখন মা।

(ক্রমশ)

রূপনারানের কূলে

গোপাল হালদার

[১]

প্রস্তাব ও প্রস্তাবনা

দিন কয় হলো আমার ৬১ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। আর কারও তা জানবার কথা নয়: তবু প্রিয়জনরা দু-একজন দেখলাম দিনটা মনে রেখেছিলেন—স্বদেশেও বিদেশেও। আমার কিন্তু অন্য দিনের মতোই তা কেটেছে। কাজ ছিল, অকাজ ততোধিক। তারই মধ্যে কিছুটা সময় নিজের খুশী মতো কাটাবার অবসর পেয়েছিলাম। আমার একটি বাঞ্ছিত বিলাস আছে—দুপুরের ইলেকট্রিক ট্রেনে হাওড়া-বাণ্ডেল যাতায়াত। অপরিচিত মানুষদের মধ্যে চলি একা; দু-চোখ ভরে বাইরের পৃথিবী দেখি; দু-কান ভরে শুনি যাত্রীদের কথা। নানা বয়সের, নানা জাতির, নানা ভাষার; সমাজের নানা স্তরের ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ। গল্প-গুজব, তর্ক-বিরোধ, আলাপ-আত্মীয়তায় মুখর রেলগাড়ির কক্ষ। কৌতুকের হাসি চাপতে হয় মুখে, কৌতূহলের দৃষ্টি চোখে। যাত্রীরা কেউ ওঠে কেউ নামে—কে রাখে কার খোঁজ।

একষট্টি বৎসরের স্টেশনটা পেরিয়ে গেলাম, নামবার সময় হচ্ছে। কামরা-ভরা একরাশ মুখ নিয়ে—কথা নিয়ে, গল্প নিয়ে, তর্ক নিয়ে, আত্মীয়তা নিয়ে—ইলেকট্রিক ট্রেন তেমনি চলে যাবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগল—সেই একরাশ মুখ!

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম, এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

বন্ধুরা আমাকে বলছিলেন, যা দেখেছ তা কেন লিখছ না? বুঝলাম আমি ফুরিয়ে গেছি। হেসে বললাম, দেখা যে ফুরোয় না।

একষট্টি বৎসরে এমন কথা বলা যায় না, দেখি নি। কিন্তু একশো বৎসরেও বলতে পারব কি—দেখা হয়ে গেল। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, প্রায় আশী বৎসরেও এ কথা বলতে হয় কবিকে। একষট্টি বৎসরে কৌতুকে কৌতূহলে যত দেখি ততই বলতে হয়—দেখলে কাণ্ডটা!

অথচ আমাদের কাল শান্ত জীবনের কাল নয়। সুন্দরের ধ্যান সম্ভব হয় নি আমাদের। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের তপস্যা একটা সীমান্তে এসে পৌঁছেছে—হয় সিদ্ধি নয় পতন। চারিদিকে মারের মোহ, তাড়না, বিভীষিকা। আপাতত মনে হয় বুঝি মারের মায়াতেই মানুষ জড়িয়ে পড়ছে। মানুষে বিশ্বাস না হারানো এ যুগে দুঃসাহসের কথা। কিন্তু বিশ্বাস হারাই-ই বা কি করে—যাদের অত সাহস নেই তারাও—যখন পৃথিবীর ঘরে ঘরে দেখি এই অদ্ভুত 'কাণ্ড'—অপরূপের রূপলীলা? মানুষের জীবন ঘরে-বাইরে যেমন সম্ভাবনায় এখন ভরে উঠছে তেমন কি আর কোনো কালে সম্ভব হয়েছে? আশ্চর্য থেকে যে আশ্চর্যতর হচ্ছে পৃথিবী, সে কি তাহলে মরবে বলে?

এ কালে জন্মেছি বলে দুঃখ করি না। কারণ, আমরা দুঃখ পেয়েছি। এ দেশে এ যুগে জন্মে তা এড়িয়ে যেতে গেলে বঞ্চনাই পেতাম:

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুর সকল দেনা শোধ করে দিতে।

দুঃখকে যারা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছে এমন মহৎ মানুষকে আমরা এ যুগে দেখতে পেয়েছি। বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের সঙ্গেই সেই ধারা শেষ হয়ে যায় নি। সব কালেই তাঁরা ছিলেন। কিন্তু এ যুগে সাধারণ মানুষের রূপেও তাঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। হাসিতে-গল্পে বেদনায় করুণায় একই গাড়ির যাত্রী। সেই সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এ শতাব্দীর একটা বড় আবিষ্কার। তাই আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে আশ্চর্য মনে হয়েছে মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানুষের। তাতেই তো বুঝেছি এ জগৎ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

দেখা সহজ কথা নয়, কিন্তু লেখা আরও কঠিন।

বৎসর আট-নয় হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের বাঙলার ছাত্রদের সেমিনার-এ একবার আমাদের ডাক পড়েছিল। আমরা তিনজনা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু ও আমি। সেমিনারকে 'আলাপনী' বলা চলে। অন্তত সে সভা তাই ছিল—সাহিত্যের আলাপনী সভা। মনোজবাবুই প্রথম বললেন: আমরা গল্প লিখি। গল্প হচ্ছে বানানো কথা, সব উদ্ভাবনা, মিথ্যা। একটুও বিশ্বাস করো না সে সব।—ছাত্ররা উপভোগ করলে। মানিকবাবু কথাটা উল্টে দিলেন: যা হয়, যা দেখি, তাই লিখি। যা নয়, যা মিথ্যা, যা দেখি না, জানি না, সাধ্য কি তা লিখব?—ছোট ছোট বাক্য, কাটা কাটা কথা, স্পষ্ট স্বচ্ছ বলিষ্ঠ। ছাত্রদের চোখ-মুখে তার ছাপ পড়ল। আমার ওপর আলাপ সমাপন করবার ভার: আমি গল্প লিখি না। আমি পাঠক, সম্পাদক, তাই সমালোচক। বলে জানালাম—আমার কাজ ওদের ওপরে—তোমাদের মতো। মনোজবাবুর মিথ্যা কথার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, আর মানিকবাবুর সত্য কথার মধ্যে কতখানি মিথ্যা, তা ধরিয়ে দেওয়াই সে কাজ। মনোজবাবু মিথ্যা বলতে গিয়ে সত্যকে আরও তর্কাতীতরূপে প্রকাশ করে বসেন; আর মানিকবাবু সত্য বলতে বসে মিথ্যার মোহজাল ছড়িয়ে দেন, নিজেও তাতে জড়িয়ে যান।

সাহিত্য লেখকের স্বীকারোক্তি। বানানো নামে আর শানানো কথায় হলেই বা কি? সে স্বীকারোক্তি লেখা সব চেয়ে কঠিন যখন লিখতে হয় স্বনামে—আত্মকথা, আত্মজীবনী, আত্মস্মৃতি। প্রত্যেক মানুষই বিশিষ্ট, এক অপূর্ব আবির্ভাব। তার কথাও অসামান্য বিশিষ্টতায় চমৎকার। কিন্তু অনন্যতাকে অহমিকা থেকে ছেঁকে তোলা নিজের পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ। ও এক ধরনের অনাসক্তি যোগ। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ মিশিয়ে আমরা জীবনটাকে গড়ে-পিটে তুলি। কারও ২০ ক্যারেট গোল্ড, কারও ১৪ ক্যারেট হোক না ১২ ক্যারেটই, তা মেকি নয়। তাই তো জীবনটা এমন মজার জিনিস, আবার এমন মারাত্মক ব্যাপারও। কিন্তু নিজের কথা বলতে বসলেই আমরা এই কথা ভুলে যাই। গিলটীতে মুড়ে প্রমাণ করতে চাই তা পিওর গোল্ড—জীবনের কোনো খাদ যাতে মিশে নি। আত্মার এই অত্যাচারে আত্মজীবনী থেকে জীবন চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়।

অকপটতার দুর্ধর্ষ অহঙ্কারই কি তাই বলে কম সন্দেহজনক? গান্ধীজীর অকপটতা অকৃত্রিম বলেই তাঁর 'সত্যের পরীক্ষা' অসামান্য সত্য। অন্যের মুখে ওই অকপটতা হতো কৃত্রিম। ছলনা নয়, আত্মছলনা। তার চেয়ে অহমিকা যদি অকৃত্রিম হয় তাও গ্রাহ্য। নবীন সেনের 'আমার জীবন' কাউকে ঠকায় না। তাঁর কবিতার থেকেও তাতে তিনি বেশি উদ্ঘাটিত অকৃত্রিম অহঙ্কারে।

কী যে কৃত্রিম আর কী যে কৃত্রিম নয়, তা লেখকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, পাঠকের যায় না। লেখক আত্মছলনা করতে পারেন, পাঠককে ছলনা করতে পারেন না। লেখকেরও তো সেখানেই বিপদ। উত্তমপুরুষ তার কণ্ঠস্বর শুনলেও চিনতে পারে না। অথচ তার মুখ থেকে 'আমি' কথাটা বেরুতেই প্রথমপুরুষ পাঠকের কান খাড়া হয়, মন হয় সতর্ক, সন্দিগ্ধ, : 'পোজ'। 'আমি' এই সর্বনাম শব্দটার রূপগুলো লেখকের ও পাঠকের পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে দুস্তর দেয়াল বেঁধে তোলে। ঐ সর্বনাম নিয়ে লেখক অসহায়। আত্মকথার মূলেই এই বাধা।

মূল্যের বাধাও আছে। আত্মকথা বাদ দিলেও স্মৃতিকথায়ও তা থাকে তাও তো আমার স্মৃতি। যা আমার চোখে জীবনের মূল্যবান ঘটনা পাঠকের কাছে তার হয়তো মূল্য নেই। অথবা অতি সামান্য সেই মূল্য। ঘটনার তবু একটা ধরা-ছোঁয়া তদ্গত মাপ আছে; মানুষের বেলা তাও অচল। মানুষমাত্রেরই কাছে তার প্রিয়জন—কবিরের কথায়—'অহদ মুসাফির'। আমার পিতা আমার চক্ষে সহজভাবেই আদর্শ মানুষ হয়ে দাঁড়ান, অপরের চক্ষে তিনি তা হয়ে উঠবেন কি করে? ব্যক্তিসম্পর্কের মাপকাঠি আর সাধারণ সম্পর্কের মাপকাঠিতে মিল না থাকাই নিয়ম। যিনি প্রিয় তিনি অপরিমেয়। তবু তো পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি তাঁর মাপ। কিম্বা, দেড়শত টাকা মাস-মাইনেই পৃথিবীর কাছে তাঁর দাম। দামটা যে মূল্য নয়, এ কথা অনেক পরিচিতের সম্বন্ধেও সত্য। আমি তার যে মুখটি দেখেছি সত্যই তা তার এক রূপ। হয়তো বা ক্ষণিক, হয়তো বা অবান্তর, হয়তো যথার্থ—কে বলবে? অবশ্য আমার মন্ময়তায় আমি নিজেই সম্মোহিত হই, তা ঠিক। কিন্তু পাঠকেরও ভ্রান্তি থাকতে পারে। তাই বা মেনে নেব কি করে?

স্মৃতিচারণার প্রস্তাবেও তাই দ্বিধার অন্ত ছিল না। এসব তো সাধারণ বাধা, বিশেষ বাধাও আছে—কেন? বড় শিল্পী, বড় লেখক হলে শিল্প-জীবনের প্রকাশ-ধারা পরিস্ফুট হতো আমার আত্মস্মৃতিতে। রাষ্ট্রের বা সমাজের নেতা হলে দেশের কথা ও কালের কথার সাক্ষ্য বহন করত আমার আত্মকথা। পুরাতন অভিজাত গোষ্ঠীর প্রতিভূ হলে সেকালের ধুলোয় ঢাকা জীবনের ঝাপসা ছবি দেখতে কেউ কেউ কৌতূহলে, শ্রদ্ধায় ঝুঁকে পড়তেন আমার মুখের দিকে। একালের উদ্যোগী পুরুষ যদি হতাম বুদ্ধির উদ্যমের সুযোগের পথ দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কেমন করে নানা আয়োজনে বন্দী করতে হয় তা দেখিয়ে দিত আমার চরিত কথা। এসব কোনো বিশিষ্টতা আমার নেই। না পেয়েছি গদি, না নিয়েছি গদা। না গড়েছি কোনো প্রতিষ্ঠান না হয়েছে কোথাও প্রতিষ্ঠিত। বরং ইংরেজিতে বললে আমি 'রোলিং স্টোন্'—শ্যাওলা যা গায়ে গজাতে পারে নি, কোনোখানেই যে পারে নি তিষ্ঠোতে। রাজনীতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ওকালতি, অধ্যাপনা, গবেষণা—কত মত, কত পথ, কতো ধুলো কতো কাদা, কতো কাঁটা কতো ফুল, কতো অন্ধকার কতো আলো—ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে এসেছি; পৌঁছি নি—১৯৩০ সালে না, ১৯৪৭ সালে না, ১৯৫২ সালে না, আজ ১৯৬৩ সালেই বা পারলাম কই? পৌঁছি নি। এখন ফুরিয়ে গেছি। তবু সেই কথাই আবার মনে পড়ে বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

এই রূপনারায়ণের কূলে ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে চলেছি। স্মৃতির শ্যাওলাই কি কিছু সঞ্চিত হয়েছে এই স্রোতে গড়িয়ে-চলা নুড়ির গায়ে? তাতেও সন্দেহ। দেখেছি কিছু, দেখবার সাধ ছিল আরও বেশি, দেখবার থেকে যেত আরও অনেক-অনেক অনেক বেশি—অফুরন্ত। যা দেখেছি তাতে বারবার এই স্রোতের দিকে তাকিয়ে বলতে হয়েছে—কাণ্ডখানা দেখলে! কিন্তু হিসাব রাখি কখন সেই 'কাণ্ডের'? ডায়েরি রাখি নি। আমার মতো লোকের ডায়েরি হতো পুলিশের পীড়নাস্ত্র—বন্ধুরাই হতেন তাদের শিকার। পুলিশের জালাতেই মোহিতলালের অমন সুদীর্ঘ পত্রগুলি জ্বলে গিয়েছে। অন্তত আরেকজন অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত সত্তার তো সাক্ষ্য চিঠিতে ছাড়া আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না—আমার দাদার বন্ধু সুরেশ চক্রবর্তীর। মোহিতলালের চিঠির মতো তাঁর চিঠিও নিশ্চিহ্ন। পুলিশের ছোঁয়াচে অর্ধেক অর্ধেক ওই ভয়েই উনুনের উদরে। স্মৃতিচারণায়ও তাই নির্ভরযোগ্য সঞ্চয়

নেই। ভবিষ্যতের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের দিন-মাসের সমস্যা-বাড়ানোর মতো কোনো উপকরণ রাখি নি। গোয়েন্দা দপ্তরেই কি তাঁরা আর পাবেন 'সেইসব সংবাদ'? স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে যে ফাইল জ্বলে যায় নি, পরাহ্নে তারও অনেক জিনিসের সন্ধান পাওয়া না যেতে পারে। যা আছে তাতে তারিখ যাচাই সম্ভব, মানুষ নয়। আর সত্য?—সাময়িক পত্রের বেলাও এই মূল কথাটা কি খাটে না? ব্রজেন্দ্রদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এ কালের কথা সংবাদপত্রে যা দেখছেন তাতে কি করে মনে করেন 'সংবাদ পত্রে সে কালে'র কথাতে আছে সত্য? তবু ব্রজেন্দ্রদা 'হংসো যথা ক্ষীরাম্বমধ্যাৎ' বিচরণ করতে পারতেন সেই তারিখ-ই-আংগরেজ্‌শাহীতে। তারও পরে এ কালের পত্রিকা-বাজারের জলমিশ্রিত দুগ্ধের মধ্যে দুগ্ধ অপেক্ষা শামুক-গুগলির সরবরাহ কম নয়। এখানে-ওখানে তার পাতা খুঁজে কলম-কণ্ডূয়নের ও কণ্ঠ-কণ্ডূয়নের পৌর্বাপর্য স্থির করা যায়। তথ্যও। কিন্তু সত্য? আর সবার উপরে যা সত্য—মানুষ?

সন-তারিখের নিশানা তবু তুচ্ছ নয়। কালের কাঠামোতে ছাড়া পরিপ্রেক্ষিত অপরের গোচর হয় না। জীবনী রচনায় এজন্য সেরূপ কাঠামো অপরিহার্য। কিন্তু স্মৃতিচারণায় তা আবশ্যিক নয়। 'চেতনা-প্রবাহের' সাহিত্যিকরা সে পথটা এখন আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অবশ্য অসংলগ্নতা অচেতনের ইন্দ্রজাল। স্মৃতির আশ্রয় সচেতন মন, মনের ফলকে পড়ে মানুষের ছাপ, ঘটনার দাগ। সে ছাপ মিলিয়ে যাবারই কথা। কিন্তু জীবনের যাদু বিদ্যায় সে ছাপ কখনো কখনো হয়ে যায় ছবি। আগের দাগ চলে যায় পশ্চাতে, পশ্চাতের দাগ আগে, এ পাশের দাগ ওপাশে, ও পাশের দাগ এপাশে। শুধু তাই নয়, কিছু যায় মুছে, কিছু যায় বেঁকে। স্মৃতিচারণা তাই মানুষের ও ঘটনার পরিক্রমা। অবশ্য ছবিরও গোড়ায় থাকে ছাপ সত্যেরও হতে হয় তথ্যনির্ভর। আর পরিক্রমাও চলা। কালের ক্রমেই তার পরিণতি। আমার স্মৃতিচারণাও ক্রম মেনেই কালের পথ-পরিক্রমা। তবে সন-তারিখের খুঁটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে নয়, কালের ধারায় এক-একটা কথা আর মানুষের ছাপ ধরে ধরে। অন্তরঙ্গ যাঁরা, একান্ত যাঁরা তাদের নিয়েই মুস্কিল। ছবির মতো করে তাদের দেখাতে পারি না, দেখতেও না—নিজেকেও তা পারি না বলে। তাঁরা ছবি নন, আত্মার আত্মীয়, সত্তায় অঙ্গীকৃত। তাঁরা ক্ষমা করবেন নীরবতা ও বাক্যের অক্ষমতা। তত্র বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

শক্তি ও প্রযুক্তি-বিদ্যা

কপিল ভট্টাচার্য

শক্তি ব্যবহারের সঙ্গে মানব-সভ্যতার বিবর্তন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

জীবজগতে মানুষের স্থান উচ্চে। কারণ মানুষই একমাত্র জীব যে মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে আর নিজের হাত, পা, মুখ, দাঁত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তিই শুধু জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে না, —লাঠিসোঁটা, তীরধনুক, ঢিল পাথর, তলোয়ার বন্দুক, লাঙ্গল, নৌকা, হাতি, ঘোড়া নানা বাহন, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে করতে আধুনিকতম সভ্যজগতে নানা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মহাশূন্য অভিযান আরম্ভ করেছে।

মানব-সমাজের সভ্যতা যেমন এগিয়ে এসেছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ কর্মের জন্যে বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। পূর্বে গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় একই বুদ্ধিমান ব্যক্তি একাধারে যোদ্ধা, চিকিৎসক, কৃষিবিদ্‌, শিল্পবিদের কাজ করতেন। ক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের চর্চা করে আজ মানুষ কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নানা বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ ভাগ করে নিয়েছে। জ্ঞানের তথ্য পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা-নিরীক্ষা করে ক্রমে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝতে শিখেছে মানুষ। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিত্য নতুন পথে কাজে লাগিয়েছে শক্তিকে।

মানব-সভ্যতার বিকাশ একদিনে হয় নি, হাজার হাজার বছর লেগেছে সভ্যতার বর্তমান রূপে পৌঁছাতে। যুগে যুগে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন নতুন শক্তির প্রযুক্তি মানব-সভ্যতায় যুগান্তর এনেছে। যে মানুষ একদিন পর্বত গুহায় বাস করত আর পশুশিকার করে জীবনধারণ করত, সে মানুষের সঙ্গে কৃষিনির্ভরশীল মানব-গোষ্ঠীর যে প্রভেদ, তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কাঠ পুড়িয়ে আগুনের উত্তাপ-শক্তির প্রযুক্তিবিদ্যা উভয়েরই আয়ত্তে এসেছিল।

মানুষের নিজের পেশীশক্তির বর্শা বল্লম থেকে দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতাশক্তির সাহায্যে ধনুকের ব্যবহার এবং তারপরে গৃহপালিত পশুশক্তির সাহায্যে

ভূমিকর্ষণের লাঙ্গলের ব্যবহার নতুন জীবনযাত্রার পথে মানুষকে দাঁড় করিয়েছে। ফসলের প্রতীক্ষায় 'গৃহে' বাস করতে শিখল মানুষ, শিকারী যাযাবর বৃত্তির পথ ছেড়ে। নতুন সমাজব্যবস্থায় গৃহনির্মাণ শিল্প গড়ে উঠল দেশে দেশে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেখে। সামান্য পশুচর্মের তাঁবু, পর্ণকুটীর (অথবা এস্কিমোদের দেশের বরফের ঘর) থেকে আরম্ভ করে, ইটপাথরের বাসগৃহ, অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মন্দির-মসজিদ্-গির্জা, দুর্গ, পিরামিড ও তাজমহলের মতো স্মৃতিসৌধ গ্রাম ও নগর-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠেছে। কিন্তু মহেঞ্জোদারো-হরোপ্পার সময় থেকে মোগল আমল পর্যন্ত অগ্নির উত্তাপশক্তি ছাড়া আর কোনো নতুন শক্তি মানুষের হাতে আসেনি। আর এই অগ্নি উৎপাদনের প্রধান উপাদান প্রথমে ছিল জালানি কাঠ, শুক্না ঘাসপাতা, ঘুঁটে, পরে কাঠ-কয়লা ও পাথুরে-কয়লা।

যেদিন 'চক্র' উদ্ভাবিত হয়েছিল, সেদিন মানুষ সভ্যতার মোড় ঘোরাবার এক নতুন অস্ত্র হাতে পেয়েছিল। গোলাকায় পদার্থ যে সহজে গড়ায়, সেটা লক্ষ্য করতে দেরি হয়নি মানুষের। তখনও পৃথিবীর আকর্ষনী শক্তির তত্ত্ব না বুঝলেও, নদীর মধ্যে গোলাকৃতি উপলখণ্ডের গতি লক্ষ্য করেছে মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানেই। ঘর্ষণ-জাত শক্তির (Friction) তত্ত্ব না বুঝেও মানুষের বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি যে গোলাকৃতি বস্তুকে মানব-পেশীশক্তি অথবা পশু-পেশীশক্তিতে চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ। জলপথে ডোঙ্গা, নৌকা প্রভৃতি ভাসাতে শিখেছিল মানুষ অনেক আগেই। স্থলপথে ঘোড়ায়, খচ্চরে, উষ্ট্র পৃষ্ঠে, হস্তী পৃষ্ঠে, বলীবর্দ পৃষ্ঠেও আরোহণ করেছে। কিন্তু নৌকাচালনা আয়ত্বে আনতে দাঁড়, হাল ও পালের ব্যবহার ও পশুবাহনের বলগা প্রভৃতি প্রযুক্তি-বিদ্যার অবদান। কিন্তু 'চাকা' হাতে পেয়ে প্রযুক্তি-বিদ্যা মানব সভ্যতায় যে বিবর্তন এনেছে, তা' সত্যিই বিস্ময়কর। চাকা হাতে পেয়ে মানুষ আধুনিকতম জলযান এবং প্রাচীন রথ ও গোযান থেকে রেল, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেনের যুগে পৌছে গিয়েছে, ভূগর্ভের জালানি তেলের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে। তাপশক্তির সঙ্গে, বিদ্যুৎশক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মানুষ। রেলস্টেশন, বিমানঘাঁটি, বন্দর, ডক, পোতাশ্রয়, রেল ও জাতীয় সড়কের সেতু, পাহাড়ের গায়ে কাটা রাজপথ, টানেল, রজ্জুপথ, বিমানপথ নিয়ে এ যুগের মানুষের বসবাস। বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব

ও নানা শক্তির প্রযুক্তি মানব সভ্যতাকে যন্ত্রযুগে এনে ফেলেছে আজ। জল-প্রবাহশক্তি, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম তেলের তাপশক্তি, জলবিদ্যুৎশক্তি, তাপ-বিদ্যুৎশক্তি, আনবিক শক্তি, সৌরশক্তির প্রযুক্তি মানব-সমাজে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করছিল, গত শতাব্দী থেকে অকস্মাৎ তার মোড় ঘুরে গিয়েছে 'শিল্পবিপ্লবে'। মানুষের সমাজব্যবস্থা তাই এক নতুন পন্থার সন্ধান পেয়েছে। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন আজ পৃথিবীর দূরত্বের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বললেই চলে। কলিকাতা থেকে আমেরিকার ওয়াশিংটনের দূরত্ব বিশ হাজার কিলোমিটারও নয়, কিন্তু বার্তাবাহক বিদ্যুৎশক্তির গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। জেট এরোপ্লেন শব্দের গতিবেগের (সেকেণ্ডে ১০৮৫ ফুট থেকে ১২০০ ফুট) চেয়ে দ্রুততর গতিবেগে পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষকে অপরপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে অভিনব সমাজব্যবস্থার পত্তন করতে উদ্যত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতির অন্তরায়

কিন্তু মানব-সমাজের একগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস করবার পথে এখনও বেশ অন্তরায় রয়েছে। প্রধানত উপরে লিখিত সভ্যতার বিবর্তন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের জীবনে সমানভাবে আসেনি। বিভিন্ন দেশের মানুষ সভ্যতার বিভিন্ন সোপানে বাস করছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম-জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবেও নতুন নতুন শক্তির সাহায্যে উদ্ভুত ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিকবাদী মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে সে কথা সুপরিজ্ঞাত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও তথৈবচ। আবার সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ (সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) একগোষ্ঠীভুক্ত সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের যে অভিনব প্রয়াসে অগ্রণী সে কথাও অপরিজ্ঞাত নয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়া-আফ্রিকার কয়েকটি নব্য স্বাধীন দেশ শিল্পায়নের প্রয়াসে শক্তির সন্ধান করছে বর্তমানে। তাই এইসব শেষোক্ত দেশগুলিতে মানব-সভ্যতার বিভিন্ন সোপানে দণ্ডায়মান মানুষদের একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।

দেশে দেশে সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্নতার কারণ

তাপশক্তি মূল উপাদান জ্বালানি হিসাবে বনের কাঠই প্রথমে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সকল দেশেই মনুষ্য বসতির নিকটে বনভূমির অভাব ছিল না। যদিও চীন দেশে কয়েক শতাব্দী আগেই পাথুরে কয়লার ব্যবহার পত্তন হয়েছিল এবং বারুদও আবিষ্কৃত হয়েছিল, তথাপি কাঠই ছিল পৃথিবীতে তাপশক্তি উৎপাদনের মূল উপাদান।

ব্রিটেনে বনভূমি নিঃশেষ হওয়ায় পীট ও কয়লার ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। একথা সর্বজনবিদিত ব্রিটেনেই প্রথম কয়লাখনির জলপাম্প করবার জন্যে প্রথমে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের উদ্ভাবন হয়। একটন কয়লা পুড়িয়ে বয়লারে বাষ্প উৎপাদন করে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে বিশ টন কয়লা উত্তোলনই যন্ত্রযুগের প্রথম কীর্তি। ব্রিটেনের মানুষ তাপশক্তির অভূতপূর্ব মূল্যায়ন করতে পেরে প্রযুক্তি-বিদ্যার উপকর্ষের দিকে মন দিল। কিন্তু এই শক্তি ও প্রযুক্তি-বিদ্যা মুষ্টিমেয় চতুর শ্রেণীর করায়ত্ত হয়ে পুঁজিবাদের জন্ম দিল। শক্তির উপাদান ও কাঁচামাল অধিকারের প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদেরও জন্ম হল। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি ও আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বাকি দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে চাইল।

ইতিমধ্যে তাপশক্তির আর এক উপাদান পেট্রোলিয়াম তেলের সন্ধান পেয়ে ওই সব দেশের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে এই শক্তি করায়ত্ব করার প্রয়াসের যুদ্ধ তা সর্বজনস্বীকৃত।

বিভিন্নশক্তি ও প্রযুক্তি-বিদ্যার আবির্ভাব

কিন্তু ভূগর্ভে কয়লা অথবা পেট্রোলিয়াম তেলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। আবার ইতিমধ্যে অগ্রণী দেশগুলিতে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যাটারিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং চুম্বকশক্তির মাধ্যমে জেনারেটারে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অত্যন্ত উপযোগী। প্রথমত কয়লা বা তেলের তাপশক্তিই জেনারেটরের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত করেছে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা ওই মূল উপাদান কয়লা বা তেলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। তাই নতুন নতুন শক্তির উৎস সন্ধানে মন দিতে হয়েছে।

বায়ু-প্রবাহ ও জল-প্রবাহ উদ্ভূত শক্তি

বায়ুপ্রবাহশক্তি চালিত হাওয়া-কল (Windmill), এবং জলপ্রবাহ-শক্তি চালিত জলচক্রের (water whcel) সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষের পরিচয় হলো। কিন্তু এগুলির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ। কারণ হাওয়াকল চালাবার জন্যে উপযুক্ত বায়ুপ্রবাহ সর্বত্র সবসময়ে পাওয়া যায় না। হলাও প্রভৃতি দেশে এর খুবই প্রচলন। সোভিয়েট দেশে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক বিশেষ ধরণের হাওয়া-কলের বহুল প্রচলনের ব্যবস্থা হয়েছে। জলচক্র ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশও সীমায়িত। পার্বত্য অঞ্চলের খরস্রোতা নদীতে জলচক্র স্থাপন করা যায়, কিন্তু মানুষের ঘনতর বসতি সমতল অঞ্চলে।

জলবিদ্যুৎ-শক্তি

পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক জলপ্রপাতের শক্তি দিয়ে জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারে যুগান্তর এনেছে। বিদ্যুৎশক্তি তামা বা এলুমিনিয়াম তারের সাহায্যে পর্বত থেকে জনবহুল সমতলে আনা সহজ। কাজেই পার্বত্য-অঞ্চলে বড় বড় কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে বড় বড় নদীর জল থেকে জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যুগ এসে গেল। কয়লা ও তেলের তাপশক্তিই আর শক্তির একমাত্র মূল উৎস হয়ে রইল না। বিংশ শতাব্দীতে তাই দেশে দেশে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের মরশুম পড়ে গিয়েছে। সোভিয়েত দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে অচিন্তনীয় মাত্রা অর্জন করেছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নয়। আমেরিকাতেও অনেক সুবৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষের মতো পশ্চাদ্বর্তী দেশেও আজ প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

কিন্তু নদী-উপত্যকা পরিকল্পনারও সঙ্কট ও সমস্যা আছে। প্রচুর জল প্রবাহিত হলেও, সকল সময়ে সব উচ্চ উপত্যকায় উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় না, যেখানে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক বাঁধ ডিজাইন অথবা নির্মাণের দোষে ভেঙে গিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে। বাঁধের নিচের অংশে নদীখাত নষ্ট হয়ে গিয়ে প্লাবন বাড়াচ্ছে। তাছাড়া, পলি জমে বাঁধের আড়ালে গড়া জলাধারের পরমায়ু শেষ হয়ে যায়। (ছোট বড় বাঁধের বয়স ২৫ বছর থেকে ১০০ বছরের বেশি নয়।) সুতরাং একবার

নদী পরিকল্পনার মারফৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ করলে, সে উৎপাদন নিশ্চিন্তে বহুকাল ভোগ করার উপায় নেই।

শক্তির অন্যান্য উৎস

কাজেই বৈজ্ঞানিকরা সর্বদাই শক্তির অন্যান্য উৎসের সন্ধানে ব্যস্ত। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপ ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে শক্তিকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও কোথাও কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে সেভর্ণ নদীর মোহানার মতো উপযুক্ত পরিবেশ পৃথিবীতে বিরল। উষ্ণ প্রস্রবনের মতো যেখানে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে উষ্ণ বাষ্প পাওয়া যায়, তারও ব্যবহার হয়েছে কোনো কোনো স্থানে। সমুদ্রের তরঙ্গ এবং আকাশের বিদ্যুৎ থেকে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা এ যাবৎ ব্যর্থ হয়েছে।

এ-সব কোনো শক্তির উৎসই প্রগতিশীল মানব-সমাজের বর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে না। এখনও ভারতবর্ষের মতো এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশে গোময়জাত ঘুঁটে পুড়িয়ে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় তাপশক্তি সরবরাহ হচ্ছে, তাই রক্ষা।

আনবিক শক্তি

ইতিমধ্যে আনবিক শক্তির আবিষ্কার অনেক বৈজ্ঞানিককে আশান্বিত করেছে। কিন্তু আনবিক শক্তির জন্যে প্রয়োজনীয় 'কাঁচামাল' সর্বত্র এবং পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। তাছাড়া, আনবিক শক্তি উৎপাদন এখনও অনেকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে এবং বিশেষ কয়েকটি শক্তিশালী দেশের কুক্ষিগত। আনবিক শক্তির আনুসঙ্গিক বিপদ সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিন্ত নন।

যে রকেটের সাহায্যে সোভিয়েত দেশে স্পুটনিক উৎক্ষিপ্ত হয় অথবা I. C. B. M. নিক্ষিপ্ত হয়, সে রকেটে যে জ্বালানি ব্যবহৃত হয়েছে, তা আজও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অজ্ঞাত। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকই পৃথিবীতে প্রথম সর্বাপেক্ষা উচ্চমাত্রার তাপ (Highest temperature) ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিদ্যার সাহায্যে নতুন নতুন শক্তি যে একদিন মানুষের করায়ত্ব হতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সেরূপ শক্তি যদি মাত্র একটি দেশের মানুষের (বিশেষ করে হিট্‌লারের মতো মানুষের) একচেটিয়া হয়ে থাকে, তাহলে অমঙ্গলের আশঙ্কা। তবে, আশার কথা এই যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার বহুদিন ধরে কারো একচেটিয়া অধিকারে থাকে না। হিট্‌লারের জার্মানীই আনবিক বোমার গবেষণা করেছিল, কিন্তু সেই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের দল আমেরিকায় গিয়ে আনবিক বোমা প্রস্তুতে সাহায্য করেছে আর হিট্‌লারের মিত্রদেশ জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সে বোমা বর্ষিত হয়েছে! কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি মানুষের কাজে লাগাবার শক্তিরূপে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে কিনা, কে জানে?

সৌরশক্তি

এ সমস্তই পৃথিবীর পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলির আয়ত্বের বাইরে। সুতরাং এমন একটি শক্তির প্রযুক্তি-বিদ্যার আয়ত্বে আসা দরকার, যা সর্বদেশে সব মানুষে সহজেই ব্যবহার করতে পারে। সে শক্তি যেন আনুসঙ্গিক নানা সমস্যার সৃষ্টি না করে। সেইরকম শক্তিই শুধু পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একগোষ্ঠীভুক্ত নতুন সমাজজীবনের আস্বাদ দিতে পারে। আমাদের পরিচিত শক্তির মধ্যে সৌরশক্তির মধ্যেই সে-সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়।

পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি পৃথিবীর প্রায় সকল শক্তিরই মূল। কয়লা অথবা পেট্রোলিয়াম তেল আসলে উদ্ভিজ ও প্রাণীজ পদার্থ। উদ্ভিদ্ সূর্যের আলোকরশ্মির সহায়তায় তার সবুজ ক্লোরোফিল মারফৎ বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে। সেই উদ্ভিদের উপর প্রাণীর প্রাণ নির্ভরশীল। কাজেই কয়লা ও পেট্রোলিয়াম মূলত সূর্যেরই অবদান। তেমনি বায়ুপ্রবাহ অথবা জলপ্রবাহ পৃথিবীতে সূর্যের তাপ না থাকলে সম্ভব হতো না, একথা প্রাথমিক বিজ্ঞানের সকল পাঠকই জানেন।

পৃথিবীর মানুষ সৌরশক্তির কিছু কিছু সরাসরিও ব্যবহার করে। রৌদ্রে আমরা কাপড় শুখাই, শুঁট্‌কি মাছ তৈয়ারী করি,। সমুদ্রের লোনা জল থেকে লবণ প্রস্তুত করি, রৌদ্র তাপের সাহায্যে। সূর্যের আলোকরশ্মিও (light energy) আমরা সারাদিন ব্যবহার করি, তাই দিনের আলোয় আমাদের কর্মব্যস্ততা। এই আলোকরশ্মির সাহায্যে আমরা ফটো তুলি। কিন্তু জীবনধারণের জন্যে উদ্ভিদের মতো আজও সৌরশক্তির সরাসরি ব্যবহার করতে শিখিনি, উদ্ভিদ্ যা' করতে পারে।

সৌরশক্তিকে প্রযুক্তি-বিদ্যার আয়ত্বে এনে তার বহুমুখী ব্যবহারের প্রয়াস চলেছে। ভারতবর্ষেই এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রন্ধনকার্যের জন্যে সৌরচুল্লীর উদ্ভাবন করেছেন। এর সাহায্যে সূর্যের তাপশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে জল গরম করা ও ভাত ডাল সিদ্ধ করা যায়। সূর্যের তাপের সাহায্যে বয়লারে বাষ্প উৎপাদন করে আর সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজও কিছু কিছু হয়েছে। এই রকম সবচেয়ে বড় জেনারেটার স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত আরমেনিয়ায় আর তার নামকরণ করা হয়েছে আরমেনিয়ার 'হিমালয়' আরারাত পর্বতের নামে।

সৌরশক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করার চেষ্টাও চলছে। সৌরশক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক সেলের ব্যাটারিই মহাকাশে স্পুট্‌নিকের বেতার যন্ত্র চালায়। একদিন হয়তো এই রকম ব্যাটারি মানুষের সমস্ত শক্তির চাহিদা মেটাবে। চাঁদকে আস্তানা করে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তন করে পৃথিবীর মানুষের বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটানোর পরিকল্পনা সোভিয়েত দেশে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সৌরশক্তির সাহায্যে শেওলাজাতীয় উদ্ভিদের (algae) দ্রুত বৃদ্ধিসাধন করে জ্বালানি তৈয়ারী করবার পরিকল্পনাই সবচেয়ে অভিনব। এই শেওলার সবুজ ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সাহায্যে অঙ্গার গ্রহণ করে বাড়ে। সুতরাং যদি প্রচুর পরিমাণে অতি দ্রুত এই শেওলা জন্মানো যায়, তাহলে সেটাই একদিন জ্বালানি কয়লার স্থান নিতে পারে!

মোট-কথা

শক্তির এবং নব নব প্রযুক্তি-বিদ্যায় অনুসন্ধান অব্যাহত থাকলে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু এ-অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হলে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করতে হলে, চাই পৃথিবীতে অটুট শান্তি। সুখের কথা, সোভিয়েত দেশে ক্রুশ্চভ সেকথা বেশ ভালো করে বুঝেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের মর্মকথা আমেরিকার মানুষেও বুঝেছে। ক্যাথলিক জগতের নেতা পোপও বন্ধুতার হস্ত প্রসারিত করেছেন আজ পৃথিবীতে অনির্বাণ শান্তির প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখতে। এই শান্তির মধ্যেই মানুষের শক্তির সাধনা সার্থক হবে। মানুষ এক রোগ-শোকহীন পর্যাপ্ত প্রাচুর্যের সমাজে বাস করে অভিনব একগোষ্ঠীভুক্ত সুখী জীবনের আস্বাদ পাবে।

লণ্ডনের আর্ট গ্যালারিতে

অশোক রুদ্র

কোথায় যেন পড়েছিলাম জীবনের সবচেয়ে মনোরম অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি হলো, অতীতের ভালোবাসা কোন সৌন্দর্যের কাছে বহুকাল পরের মন নিয়ে ফিরে আসা। বহুদিন আগের বা অন্য জন্মের প্রেয়সীর অভিসারে যাওয়ার মতো। অনেক বছরের ব্যবধানে লণ্ডনের ন্যাশানাল গ্যালারিতে পা দিয়েই আমি আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সব আগে গেলাম আমার এই গ্যালারির সবচেয়ে প্রিয় ছবিটির কাছে—ভেলাজকেজ-এর (Velasquez) 'ভেনাস-এর প্রসাধন' (Toilet of venus)। সুন্দরী নারীদেহ তো এ পর্যন্ত কতই দেখলাম, কিন্তু এই শায়িতা বিবসনা ভেনাস্-এর তুল্য সুন্দরী আর চোখে পড়ে নি। মিলোর ভেনাস-এর যে এত খ্যাতি, তাঁকে আমার কোনোদিন তত মনে ধরে নি। (ভদ্রমহিলা কি একটু বেশি স্বাস্থ্যবতী নন?) কিন্তু ভেলাজকেজ্-এর এই ভেনাস্-এর উরু ও জঙ্ঘাদেশের সীমানায় ঈষৎ একটু দোল খেয়ে যে রেখাটা তার গোড়ালি পর্যন্ত ধীরে ধীরে নেমে গেছে তার মধ্যে যেন বিশ্বের সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত হয়েছে। রেখাটা যদি একচুলও এদিক ওদিক হতো, তার পতনের ছন্দটা যদি একটুও অন্যরকম হতো, তাহলেই বোধহয় ছবিটি সাধারণের স্তরে নেমে আসত।

দেখলাম আবারও, অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আবারও ভালো লাগল। মনটা একটা চাপা ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেল। ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যদি ভালো না লাগে? যদি এসে দেখি, যাকে এতো সুন্দর বলে মনে মনে এতদিন ধ্যান করেছি, আসলে তা সত্যি তত সুন্দর নয়? এরকম তো হয়। বিচ্ছেদ ছাড়াই হয়। একসময় একটা ছবি খুব ভালো লাগল। শখ করে তার একটা অনুকৃতি দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলাম। সকাল-সন্ধ্যে দেখি, মন চন্‌মন্ করে। দিনের পর দিন যায়। তারপর কি যেন হয়। একটু অস্বস্তি লাগতে শুরু করে। তারপর বিরক্তিই লাগতে থাকে। এক সময়ে ছবিটিকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হই। একটা সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটে। অবশ্যই

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো নৈর্ব্যক্তিক মান কি সম্ভব সৌন্দর্যের? প্রত্যেক সৌন্দর্যরসিকের ভালোলাগাকে শাশ্বত ও সাময়িক এই দুই ভাগে বোধহয় ভাগ করা যায়। যে সৌন্দর্য অনেক অনেক কাল ধরে অনেক অনেক সৌন্দর্য রসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় শাশ্বত ভালোলাগার অধিকারী হয়েছে তাকেই বোধহয় বলা হয় শাশ্বত সৌন্দর্য। যে শিল্প এ-জাতীয় শাশ্বত সৌন্দর্যের অধিকারী তাকেই বোধহয় বলা হয় মহৎ শিল্প। এ ছাড়া শিল্পে বা সৌন্দর্যে মহত্ত্বের আর কি সংজ্ঞা থাকতে পারে?

রাশীকৃত সৌন্দর্যের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলতে চলতে এ-জাতীয় চিন্তা মাথায় আসছিল। কিন্তু চিন্তা করার অবসর ছিল না। হাতে মাত্র একঘণ্টা সময়। ঘটনাচক্রে মাত্র একঘণ্টার বেশী সময় দেওয়ার উপায় ছিল না। তারপর দিনই লণ্ডন ছেড়ে চলে যাব। সময় ছিল না, কোনোমতে সময় করে নিয়েছি।

এতো হন্তদন্তভাবে গ্যালারি দেখা যায় নাকি? যায়, যদি সে গ্যালারি আগে অনেকবার দেখা থাকে। আগে অনেকবার দেখা গ্যালারিতে ঢোকা যেন পুরনো বন্ধুমহলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া। সকলের সঙ্গেই কিছু 'বন্ধু' সম্পর্ক নেই, কারও সঙ্গে শুধুই আলাপ আছে, কারও সঙ্গে বা মাত্র মুখের চেনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেও কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলে নেওয়া যায়। কাউকে "এই যে, কেমন?" বলে সরে পড়া যায়। কারও সঙ্গে বরাবরই চোখে চোখে তাকিয়ে একটু হাসার সম্পর্ক ছিল, কয়েক বছর পরও আবার ঠিক সেইভাবে একবার হেসে নেওয়া যায়।

কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বন্ধুদের কারও বয়স বেড়ে গেছে। একদিন যার ঝল্‌মলে ব্যক্তিত্বকে মনে মনে ঈর্ষা করতাম, এখন দেখি আসলে সে চটকদার মাত্র। কাউকে গোবেচারী মনে করে কৃপার চোখে দেখতাম, এখন আবিষ্কার করি তার চরিত্রের গভীরতা আর গোপন অহংকার। একদিন যাকে অহংকারী মনে করে পাশ কাটিয়ে গেছি, হঠাৎ দেখি চোখের কোণ দিয়ে সে ডাকছে। একেবারে নতুন মুখও এক-আধটা দেখা যায়।

এ সবই কি নিজের মনের পরিবর্তনের প্রতিফলন? সবটা নয়। কালের স্রোত মনের উপর দিয়ে চোখের উপর দিয়ে যেমন বয়ে গেছে তেমনি ছবিগুলোর উপর দিয়েও বয়ে গেছে। তারাও অজর নয়। ছবির উপর কালের প্রভাব

তিন ভাবে পড়ে। প্রথমত, ছবির রঙ তো বদলায়ই। এ পরিবর্তন অবশ্য অতি মৃদুগামী, অতি অলক্ষ্য, তবু কয়েক বছরের ব্যবধানে বোধ হয় চোখে একটু পড়ে। দ্বিতীয়ত, ছবিগুলোকে মাঝে মাঝে 'পরিষ্কার' করা হয়। কারিগরেরা কাজ করে তাদের আদি রঙ ফিরিয়ে আনার জন্য। মাঝে মাঝে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। কোনো ছবির একটা কালো কোণাকে ভীষণ ভালবাসতাম। ফিরে এসে দেখা গেল সেটা হয়ে গেছে ঘন সবুজ। ঘন সবুজটাই যে আদি রঙ তা জেনে তো কোনো সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তাকে যে কালো বলেই এতদিন ভালোবেসে এসেছিলাম। এ লোকসানের পূরণ কিসে? কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘা দেয় যে পরিবর্তন তা হলো ছবিদের স্থান পরিবর্তন। মাঝে মাঝেই গ্যালারির কর্তারা ছবিদের নতুন করে সাজান। মাঝে মাঝে ঘরকে ঘর বদলে ফেলেন। কোনো ছবিকে যখন দেখি তখন তো শুধু তাকেই দেখি না, চোখ তো একই কালে তার আশপাশের ছবিগুলোকেও দেখে। কোনো একদিক থেকে একভাবে আলো এসে পড়ে তার উপর। স্থান বদল হলে সব ওলটপালট হয়ে যায়। হঠাৎ চলতে চলতে এক জায়গায় লিয়োনার্দোর কোনো দেবদূতীকে দেখে চমকে উঠতে হয়, এখানে তো আগে ছিল না। লিয়োনার্দোকে আমি সযতনে এড়িয়ে চলি। কেন যেন ওঁর ছবি আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করে, মোটেই পছন্দ করি না ঐ প্রতিক্রিয়াটা। অকস্মাৎ দেখি সামনে পথ আটকানো, দেয়ালজোড়া বিশাল কনস্টাব্‌ল্—খাড়া উঁচু একটা পাহাড়ের গা, নীচে গরু চড়ছে। এখানে তো এভাবে পথ রুদ্ধ ছিল না! আর স্যুরা (Seurat)-এর ঐ ছবিটা—স্নানাগারের ছবি, একটা ছেলে ভিজে গায়ে বসে রয়েছে—ওটা ওখানে এলো কেন? ওটা তো এখানে মোটেই খাপ খাচ্ছে না!

একঘণ্টা সত্যি কিছু কম সময় নয়। এক ঘণ্টার বেশি সময় কি কাটান সহজ এই পারিপার্শ্বিকে? দমবন্ধ হয়ে আসে না? রেম্‌ব্র্যাণ্ট্, লিয়োনার্দো, রাফায়েল, এলগ্রেকো, এদের ছবির গা থেকে যেন এদের প্রতিভা অদৃশ্য কোনো শক্তিধর রশ্মির মতো বিচ্ছুরিত হয়, এই রশ্মিতে অবগাহন করতে ভালোই লাগে, কিন্তু তারপর যেন মাথা ঘুরতে থাকে। এই একটি গ্যালারির মধ্যে স্থান ও কালের পরিধিই বা কি বিপুল। এক একটা হলে এক একটা দেশ, এক একটা শতাব্দী। দু-পা বাঁ দিকে গেলেই হয়তো পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্স। দেবদূতীরা গান গাইছে, শিশু ভগবান ম্যাডোনার কোলে হাসছে, ক্রুশবিদ্ধ

যীশু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছেন। একটু এগিয়ে গেলেই সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডে চতুর্দিকে শান্তি বিরাজমান। মাঠে গরু চরছে। গৃহলক্ষ্মীরা চরকা চালাচ্ছেন। কৃষক পরিবার খেতে বসেছে। গ্রাম্য প্রেমিক ম্যাণ্ডোলীন-জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে গ্রাম্য তরুণীকে শোনাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরটা পুরোটাই রেমব্রাণ্ডটের। এ ঘরটায় কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। স্নানোদ্যতা মহিলাটি শেমিজ তুলে ধরে জলে নাবছেন, ঠিক আগের মতোই। এক দেওয়ালের মাঝখানে ঠিক আগের মতনই ঝলমল করছেন সাসকিয়া (Saskia) মধ্যবয়সী মহিলাটি সত্যি বোধহয় সুন্দরী নন, কিন্তু কি যেন আছে তার মধ্যে, চোখ ঝলসে যায়। অন্য এক কোণায় পিয়ানোবাদক অন্ধকারে পিয়ানো বাজাচ্ছে, আলোও জানালা দিয়ে ঠিক তেমনিই এসে পড়েছে। সামনের দেওয়ালের একটু বাঁদিকে শিল্পীর স্ব-প্রতিকৃতি। কালো কালো গভীর চোখ দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। এ দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ান যায় না। পালিয়ে বেরিয়ে রুবেন-এর (Rubens) ঘরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। এক জগৎ থেকে যেন আর এক জগতে ঢুকলাম। জীবনের নানাবিধ স্থূলতাকে আর কেউ উপাসনা করেছেন এমনভাবে যেমন করেছেন এই শিল্পী? রুবেন্-এর ছবিতে শুধু থরে থরে সাজানো মেদ। ভিড় করা নরনারী, প্রতিটি নারী মেদময়ী, প্রতিটি নর স্থূলকায়, কামনায় প্রত্যেকে যেন মূর্চ্ছা যাচ্ছে, পুরুষ মাত্রেরই চোখে-মুখে জান্তব লালসা, স্ত্রী দেখলেই তারা যেন একেবারে ঝাঁপিয়ে তাদের উপর পড়তে সদা আগ্রহী। কিন্তু তাই বলে রুবেন্-এ কোনো বিকার নেই। এই জান্তব লালসার চিত্রে একটা বন্য সারল্য আছে, মনে কোনো অস্বস্তি জাগায় না। ভদ্রলোকের রুচিতে একটু হাসিই পায় মাত্র। কিন্তু এই মেদমাংসের ভিড়েই হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এক অসামান্যা নারীর সঙ্গে। মোনালিসারই মতন দূর থেকে চোখ দিয়ে আকর্ষণ করেন। কে ইনি, চেনা-চেনা লাগছে যেন, কিন্তু এই অসভ্য বুনোদের ভিড়ে কি করছেন এখানে? চতুর্দিকে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, প্রমত্ত উল্লাস—তার মধ্যে বড় একটি টুপি মাথায় দিয়ে সলজ্জ সকরুণ ভাব নিয়ে কে এই কিশোরী? কাছে এগিয়ে গেলাম, না কোনো পরিচয় লেখা নেই, কিন্তু শিল্পী দেখলাম রুবেনই! আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মেদমাংসের উপাসক রুবেন-এর চোখও এড়ায়নি এই শীর্ণকায়ার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য।

এরকম মোনালিসা আরও আছে এ গ্যালারিতে। সত্যি কথা বলতে

লিয়োনার্দোর মোনালিসার যে খ্যাতি তার অনেকটাই ন্যায্য নয়, কারণ অমন রহস্যময়ী নারীদৃষ্টির ও-রকম আকর্ষণীক্ষমতা আরও অনেক দেখেছি। গ্যালারিতে এ-ঘর ও-ঘর করার সময় স্বতঃই অনুভব করা যায়, চোখ দিয়ে ডাকছে, এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে। কিন্তু সময় নেই, ইচ্ছে থাকলেও সাড়া দেওয়া যায় না। কখনও ক্ষণিকের তরে থেমে একটু দেখে নেওয়া যায়, কখনও তাও সম্ভব না। কিন্তু একবার হার মেনে গেলাম। অকস্মাৎ একেবারে পথরোধ করে দাঁড়ালেন, গইয়া'র দোনা ইসাবেল (Dona Isabel)! দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘাড় বেঁকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পূর্ণ যৌবনা, স্পষ্টতই রূপ ও কুলগর্বে গর্বিতা, স্ফীতবক্ষা, 'পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'! মুখে এঁকে অনেকদিনই চিনি। কিন্তু অন্তরঙ্গতা কোনোদিনই হয়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা, অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনের 'সোসাইটি লেডি', এই শ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে তো আমার মনের যোগ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু স্পষ্টতই তিনি চোখ দিয়ে আমাকে ইশারা করলেন, যদিও চোখ ফিরে তাকাবেন না পর্যন্ত, এতই তাঁর অহঙ্কার! তাকিয়ে রইলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, (আর্ট গ্যালারির সুন্দরীদের সম্বন্ধে সুবিধে এই, যতক্ষণ খুশি যত ভাবে খুশি তাঁদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়, তাঁরাও আপত্তি করেন না, সংসারের লোকও অসভ্যতা হচ্ছে বলে মনে করেন না।) আমার চোখের সামনে তাঁর মুখভাব পরিবর্তিত হতে থাকল। প্রথমে যে দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য ছাড়া কিছু চোখে পড়ে নি, এখন তার আড়ালে একটা অসহায় ভাব ফুটে বেরুল। চলে যেতে উদ্যত হলাম—তাঁর চোখের আবেদন আরও নির্বন্ধ হয়ে উঠল। প্রায় কাতরই দেখাল। কে জানে কি অসম্পূর্ণতাকে অতি যত্নে ঔদ্ধত্য দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের স্পেনীয় অ্যারিসট্রোক্রাসির এই তরুণীটি। কিন্তু অকস্মাৎ আমার কাছে কেন এভাবে প্রকাশ করা? মনে গুনগুনিয়ে উঠল সেই ফরাসী লোকসঙ্গীতটির সুর, যার মাত্র এই একটাই চরণ, "রাজা যদি জানত, ইসাবেল! ইসাবেল, যদি রাজা জানত!" ইসাবেল যে কি অন্যায় করেছিল তা কোনোদিন জানা যাবে না, কিন্তু একটা চরম হতাশা গানের সুরে বেঁচে রইল, হায় ইসাবেল! যদি রাজা জানত! দোনা ইসাবেলের টসটসে ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মনে হল ইনিও বোধ হয় পারতেন করতে এমন কিছু যাতে আর কাউকে বলতে হয়, হায় ইসাবেল! যদি রাজা জানত!

অভাব শিল্পরসিক মেনে নেবেন কি ? কেননা প্রতিটি সুন্দর সৃষ্টিতে সমসাময়িক সমাজের নীতি বিধৃত না হয়ে পারে না। আর শিল্পী সমাজের পাঁচজনের জন্যই সৃষ্টি করেন, শুধু নিজের জন্য নয়। আগেই বলেছি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এ-কারণেই শিল্পীর থাকে না। তবে শিল্পীকে যদি বিষয়বস্তু আঙ্গিক ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে বলা হয় তাহলে, সে সৃষ্টি নিশ্চয়ই কমার্শিয়াল আর্টের পর্যায়ে পড়বে এবং শিল্পী সেখানে poster designer-এ রূপান্তরিত হবেন। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা অভিভাবকত্ব মাঝে মাঝে দেখা যায় না যে তা নয় তবে ক্রুশ্চভের বক্তৃতা পড়ে একথা আমার মনে হয় নি শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপরে তাঁরা সরাসরি কোনো ফর্মান জারি করতে চেয়েছেন। দ্বাবিংশতিতম পার্টি-কংগ্রেসে একদা যে-সমস্ত রীতি পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল ক্রুশ্চভ তারই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। মনে রাখা দরকার এই রীতি পদ্ধতিগুলি গৃহীত হওয়ার পূর্বে হাজার হাজার সভা সমাবেশে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ দ্বারা তীক্ষ্ণভাবে সমালোচিত হয়েছিল। সুতরাং অকপটে বলতে পারি নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য নির্ণয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শক সাধারণের চূড়ান্ত মতামতই ক্রুশ্চভ ব্যক্ত করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা বৈজ্ঞানিক প্রতিটি ব্যক্তিকেই সমাজে বাস করতে গেলে খানিকটা আপস করে চলতেই হয়। For compromise of that kind is not a concession—it is a dangerous holding of the balance between two sets of forces" একথা বলেছেন বুর্জোয়া আর্ট ক্রিটিক এরিক নিউটন। শ্রেণীহীন সমাজে এই ধরনের আপসের মধ্যে আত্মবিক্রয়ের সম্ভাবনা আরও কম। শিল্পী প্যালেস্ত্রিনা পোপের জন্য সৃষ্টি করতেন। শেক্সপীয়র আর্ল অফ লি সেস্টারের দলের অভিনয়ের জন্য নাটক লিখতেন। রেমব্রাণ্ডের বিখ্যাত চিত্র Night Watch এক ক্যাপ্টেন বানিংকীকের নির্দেশে তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতিকৃতি রচনার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। মাইকেল এঞ্জেলো যখন Pope Clement VII নির্দেশে মূর্তি গড়েছিলেন, তিনি পুরোপুরি নিজেকে বিকিয়ে দেন নি বা স্বকীয়তা বিসর্জন করেন নি। ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ সীমিত ও সুপরিকল্পিত বলে শিল্পীর সৃজনপ্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয় না। সোভিয়েত রাষ্ট্র মেহনতি জনগণের রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শিল্পসৃষ্টিকে বহুজন-মনোরঞ্জক করা ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করা। কাজেই

নিয়ন্ত্রণের ফলে সেখানে শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা বাধা না পাবারই কথা।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে এ-প্রসঙ্গে লেনিনের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। "Freedom is a grand word, but under the banner of free trade the most predatory were conducted, under the banner of free labour the toilers were robbed." বার্নস্টাইনের freedom of criticism-এর বিরুদ্ধে লেনিনের এ উক্তি এরেনবুর্গ প্রমুখের শিল্পী-সাহিত্যিকের অবাধ স্বাধীনতালিপ্সার বিরুদ্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই স্বাধীনতার অর্থ "The freedom to covert social democracy into a democratic republic party, the freedom to introduce bourgeois ideas and bourgeois elements in socialism."

বিমূর্তকরণ কোনো বিশেষ রীতি বা আঙ্গিকের আমদানি নয়, কোনো রীতি বা আঙ্গিকের আমদানী হলে এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকত না। বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দৈন্য ও অস্পষ্টতা থেকে বিমূর্তকরণের উদ্ভব। অবশ্য যে কোনো ধ্যান-ধারণা বা সাধারণ উপলব্ধির মূলে আছে ভাবা ও চিন্তার সামান্যীকরণ এবং বিমূর্তকরণ-ক্ষমতা। বাস্তব ও মূর্ত ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বিমূর্তকরণ অতি আবশ্যক, এবং এই প্রক্রিয়ার ফলেই সমাজে কায়িক ও মানসিক শ্রমের পার্থক্যের সূত্রপাত। ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াকর্ম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভাবধারার আপেক্ষিক সত্যতা নিরূপিত হয়। কেননা যে-কোনো ভাবধারাই বারবার ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে পরীক্ষিত না হলে ক্রমশ বাস্তব সম্পর্করহিত হয়ে বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই বুদ্ধিজীবীদের অতিরিক্ত বিমূর্তকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। না হলে, অনিবার্যভাবে তাঁরা রহস্যময়তার কবলে পড়বেন, বিশ্লেষণে ভুল করবেন ও ফলে বাস্তববাদ থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটবে।

মার্কসের মতে আইডিয়ার জন্ম, "From the material activity and material intercourse of men" হলেও আইডিয়ার স্বকীয় শক্তিকে তিনি কোনো সময় হেয় করেন নি। হাজার হাজার বছর ধরে ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে লড়াই তার মূলে আছে idea-সম্পর্কিত ভাববাদী পণ্ডিতদের ভুল ধারণা। শিল্পে বিমূর্তকরণকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে ভাববাদকে প্রশ্রয়

অন্য যে মোনালিসার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারলাম না তিনি একজন ম্যাডোনা—মীশু জলি। এঁকে আগে কখনও লক্ষ্য করিনি। হয়তো আগে ছিলেনই না এখানে, হয়তো ছিলেন আরো অনেক ম্যাডোনার মধ্যে, চোখে পড়ে নি। কিন্তু এবার ঘুরে ঘুরে বার বার তাঁর কাছে না গিয়েই পারলাম না। শিল্পীর নাম খ্রিভেল্লি (Chrivelli)। সত্যি কথা বলতে এর কোনো ছবিই যে আগে লক্ষ্য করে দেখেছি কোথাও মনে পড়ল না। কিন্তু প্রার্থনারতা এই মাতৃমূর্তি এত ভালো লাগল যে একটা অনুকৃতি তখন তখনই জোগাড় করে কিনে নিলাম।

প্রথমটা পরিবর্তনগুলোই বড় হয়ে লাগছিল। আমার প্রিয় প্রসাধনরতা ভেনাসকে গ্যালারির কর্তারা এখন একটু কোণঠাসা করে দিয়েছেন—আগে তার স্থান ছিল একটা দেওয়ালের একেবারে মাঝখানে। এই অবনমন আমাকে পীড়িত করেছিল। ঘরটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন এটিকে স্পেনীয় শিল্পীদের ঘর করা হয়েছে। আরও কয়েকটা ভেলাজকেজ (Velasques) রয়েছে, আর আছে এল গ্রেকো (El Greco) আর গইয়া (Goya)। ঠিক আগের মতোটি নেই। প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ল। তখনও জানতাম না এ-ঘরে কি আশা করতে হবে। অন্য মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখতে দেখতে চলেছিলাম, অকস্মাৎ চোখ তুলতে দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গেল। অভিভূত ভাব কাটিয়ে উঠে দেখি সামনেই সৌন্দর্যের দেবী প্রসাধনরতা। সে যেন এক দেবীর আবির্ভাব ঘটল। বলাবাহুল্য, এই প্রথমবার দেখার অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বার কখনও হয় না, তা আশা করেও আসিনি। তবু অদলবদল যেটুকু করা হয়েছে তাতে অনেকক্ষণ পীড়া অনুভব করেছিলাম। কিন্তু পরিবর্তন তো সত্যি বলতে সামান্যই হয়েছে, একটু পরেই অনুভব করতে লাগলাম। এক গ্যালারি ভরা অপরিবর্তনের ভার ধীরে ধীরে কেমন মনকে চেপে ধরছে। স্থগা'র সেই মহিলা, যাঁর লাল চুল (হ্যাঁ, লাল!) আরেকজন বেঁধে দিচ্ছে, তিনি ঠিক একইভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। রুবেন-এর পারিস-এর বিচার-এ পারিস নামক ভাগ্যবান যুবকের সামনে তিনজন গ্রীক দেবী একই নির্লজ্জ নগ্নতায় দণ্ডায়মানা। ন্যাশানাল গ্যালারির ছবি সবই রেনেসাঁ ইটালী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স পর্যন্ত এই পরিধিতে সীমাবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর কোনো কাজ এতে নেই, বিমূর্ত শিল্পের কোনো আভাস এখানে নেই। ইমপ্রেসেনিস্ট ছবিও মাত্র কয়েকটাই আছে।

এখানে যত ছবি তাদের বেশির ভাগের মধ্যেই গতিকে ধরার কোনো চেষ্টা হয়নি, অবশ্য টার্নার আছে অনেকগুলো। স্থিতিকেই ধরা হয়েছে। বিষয়ে যদি গতি থাকেও তো গতিটাকে বাদ দিয়ে সময়ের ধার থেকে একটা মুহূর্তকে তুলে নিয়ে গতির মুখের স্থিতিটুকুকে ধরা হয়েছে। বিমূর্ত শিল্প বা অলঙ্কার-প্রধান বা নৈসর্গিক চিত্র দেখে যে-ভাব মনে জাগে না, এমন একটা ভাব জাগে এখানকার এই গতির মুখের স্থিতির চিত্রগুলি দেখে। মনে হয় দক্ষ হাতে কেউ অতীতকে ঠিক জায়গা বুঝে বুঝে চিরেছে। একজনের হাত পিয়ানোর চাবির ঠিক এক জায়গায় ন্যস্ত, যেমনটি ছিল কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে। একদল সৈন্য কয়েকটি বন্দীর দিকে বন্দুক তাক্ করছে—করছে তো করছেই। আবার দশ বছর পরে ফিরে এলেও দেখব, তখনও তাক্ করছে। ব্যাপারটাতে নিশ্চয় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই এক গ্যালারি থেমে-যাওয়া গতি—কারও বিশেষভাবে তাকানো দৃষ্টি, কারও একটা হাতের ভঙ্গি, কারও মুখের একটা হাসি, চিরকালের জন্য যাদের জমিয়ে দেওয়া হয়েছে—এই ভৌতিক জগতে ঘোরাফেরা করতে করতে খুবই আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এরকমই অনুভূতি হয়। Alain Resnais-এর কাছেও মনে হয় এই ব্যাপারটা আশ্চর্যই ঠেকেছিল। তিনি অবশ্য অন্য দিক থেকে দেখেছেন, তাঁর ছবি Last year in Marien baad-এ। একটা একটা করে মুহূর্ত পিছলে অতীতে মিশে যাচ্ছে, আর কিছু কিছু করে ঘটনা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে চিরকালের মতো, অতীতের গ্যালারিতে এক একটা ছবি বা পাথরের মূর্তির আকার নিচ্ছে। এই ব্যাপারটা ওঁকে অবাক করেছে। একটা মেয়ের কোনো এক মুহূর্তের একটি বিশেষ হাঁটার ভঙ্গি, তার ঘাড়ের পাশে হাত রাখার বিশেষ এক ধরনটা, তার হঠাৎ উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠা হাসিটার আওয়াজ, এক একটা মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে তারা অতীতের গ্যালারিতে এক একটা ছবি বা মূর্তির আকার নিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তটিকে যদি কোনো ভাবে খুঁড়ে বার করা যায়, তবে সেই ঘটনাটিকে কেমন দেখাবে, কেমন শোনাবে? কারও যদি এই দক্ষতা থাকে স্থান ও কাল থেকে এভাবে শিল্প-সম্মত খণ্ড চিত্রগুলিকে কেটে কেটে বার করার তো সে কি নিজেই নিজের স্মৃতির উপাদান দিয়ে ন্যাশনাল গ্যালারির মতোই একটা গ্যালারি তৈরি করে নিতে পারবে না? Resnais-এর ছবিটি অনেকেরই ভাল লাগে নি, অনেকেই একে নিছকই দুর্বোধ্য বলে মনে করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয়নি।

ন্যাশনাল গ্যালারির ঘরগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হলো Resnais-এর নায়ক এমন একজন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি যে নিজের স্মৃতির উপাদানে একটা গ্যালারি গড়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আমাদের সকলের তো সে দক্ষতা নেই। আমাদের জন্য ন্যাশনাল গ্যালারির মতো গ্যালারির ব্যবস্থা থাকাই ভালো। বাইরের হিমেল হাওয়ায় বেরিয়ে এসে স্পষ্টই অনুভব করলাম, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এক ঘণ্টা না কম সময় মনে হয়েছিল? আসলে এক ঘণ্টাও অতিরিক্ত। সহ্য করা যায় না একসঙ্গে এতটা সৌন্দর্য। যতক্ষণ গ্যালারির বাইরের জীবনে থাকি তখন সর্বদাই আক্ষেপ হয়, জীবনটা কেন একটা গ্যালারির মতো নয়। সেখানে কেন এত অভাব ছন্দের, বর্ণের, সঙ্গতির, অনুপাতের। কিন্তু গ্যালারির ভিতর এক ঘণ্টা কাটিয়ে এসে বুঝতে পারি মাঝে মাঝে গ্যালারিতে ঢুকে বেরিয়ে আসা যায় এ ব্যবস্থাটাই ভালো। আমরা যারা নিজেরা শিল্পী নই তারা এতটা ছন্দ, এত অনুপাত, এত সঙ্গতি নিয়ে সব সময় বাস করতে পারব না। একটু ছন্দহীন মাত্রাহীন আলোবাতাসের অভাবে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। তাছাড়া Resnais-এর নায়ক, যে স্মৃতির উপাদানে গ্যালারি গড়ছে, তারও তো আধা পাগলের দশা!

সেই পিপুল ॥ বিষ্ণু দে

দু-বার দেখেছি সেই বিরাট পিপুল।
বহুকাল আগে
দিন যখন সচ্ছল ছিল
রাত্রিও সরল এবং শীতল,
আর বিপুল আশ্বাস ছিল দেশব্যাপী প্রাণে,
উৎসাহী সামর্থ্যে দেখি দেশ
বরেন্দ্র, বঙ্গজ, রাঢ়
গ্রাম থেকে গ্রাম এবং শহর।
তখন একদা বহু ক্রোশ হেঁটে হেঁটে
অগ্নিময় মাঠে হঠাৎ পেয়েছি তাকে,
ছায়াকল্প শান্তির আশ্রয় প্রকাণ্ড পিপুল,
ঘাস তলায় তখনও, এবং উপরে
অগণন হরিয়াল, সবুজ, কোমল, নির্ভয়, মুখর।

এখন আবার দেখি প্রায় রাত্রে বারবার
জঙ্ঘতৃণ পত্রহীন দগ্ধ সে পিপুল
সহস্র শাখায় প্রশাখায়,
প্রকাণ্ড দুর্ভিক্ষ যেন মূর্তিমান, যেন ভুলে ভুলে
দুঃশাসন দুশ্চরিত্র মরুভূমি কোনো রাজ্যে
লক্ষ কঙ্কালের শীর্ণ বাহু আর লক্ষ লক্ষ
দশটি আঙুলে অভিশাপে একটি নির্দেশ।
আর দেখি রাত্রে, আর আজকাল সারাদিন,
ঘরে ও বাইরে, চোখ ঢাকি কিংবা চোখ মেলি,
দৃষ্টিহীন লক্ষ জোড়া চোখের কোকরে শত শত
অভিযোগ, অতল, অপার, নির্ণিমেষ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঝলসে উঠেছিল প্রাণের তরোয়াল !
তথন সবে ভোর কুয়াশা-থম-থম !
ধূসর পথঘাট পাহাড় নদীতে
নিরাশ জীবনের গতি নিরুদ্যম।

করুণ কৃষিপথ ! মাঠের ধান লুঠ !
পল্লীবাংলার চণ্ডীমণ্ডপ—
পঙ্গু মনোরথে অন্ধবাসনার
বিষাদে মগ্ন আরতি জপ তপ।

তথনো গাঙ্গেয় আকাশে চিমনী
ধরেনি সূর্যকে উর্ধ্ববাহুতে,
আর্ত স্বদেশের চেতনাসম্পদ
তথনো গোগ্রাসে গিলতো রাহুতে।

ঝলসে উঠেছিলে খড়্গ ক্ষুরধার
ঐশী সাধনার দ্বিরূপে ক্ষুব্ধ।
মুক্তিপথ কই ? সাকার নিরাকার
দ্বন্দ্বে সংঘাতে অপ্রবুদ্ধ।

ঘুরলে সারাদেশ মুক্তিসন্ধানে :
শিব যে শবাকার হায় কী আপসোস !
পল্লী জনপদে শোষিত মানুষের
চিবোয় হাড়মাস ধর্ম-রাক্ষস।

অজেয় বীরবেশে পৃথিবী ঘুরে এলে
সাগরে ফেলে দিলে তন্ত্রমন্ত্র,
অঙ্গে গৈরিক কণ্ঠে নির্ভীক
মুক্তিপথ সে তো সমাজতন্ত্র।

পঞ্চাশোর্ধ্বে ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বয়স পঞ্চাশ পার ঘুম কমে গেছে
মনে ভয় এই বুঝি প্রৌঢ়ত্ব ধরছে।
মাঝ রাতে জেগে উঠে মানস খাতায়
নতুন হিসেব কষা : কত যে বর্তায়
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর ব্যাঙ্কের সুদ
গ্র্যাচুইটি কত হলো—যোগ করে ক্ষুদ-
কুঁড়ো দোতলা বাড়িটা
নির্বিঘ্নে কি হবে শেষ ? কোথায় ঘড়িটা
ঢং-ঢং করে বেজে উঠলো কবার
কাক ডাকে লরি চলে রাতটা কাবার।

মেদবাহী গৃহিণীর বিকট মেজাজ
না জানি কী বড়বাবু বলবেন আজ !
নেশা করে ছেলেটা কি ফিরেছে বাড়িতে
মশগুল সারা রাত শাড়িতে তাড়িতে ?

যাই বল আপিসের ওই টাইপিস্ট
খাসা মাল—মন-ভরা চোখ-ভরা ফিস্ট।

সর্বাগ্রে তো গঙ্গাস্নান পুণ্যমার্গচারী
তারপর, হে প্রভু, কি পর নারী করনারি ?

মুখে যদি রক্ত ওঠে ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে-কথা এখন বলা পাপ।
এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই :
এ-সময়ে রক্তবমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
বেঁকে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ ॥

একা বা অনেকে ॥ চিত্ত ঘোষ

যে যার আপন ঘরে ফিরে যেতে চায়—
ফিরে যেতে চায় গৃহপল্লবের কাছে,
পরবাসি, ঘুরে ঘুরে ভাসানো নৌকোয়
ভোরের গলুই বাঁধো তীরবর্তী গাছে।

কয়েকটি পায়ের চিহ্ন নোনাগন্ধ তীরে :
আঙুল-দেখানো দূর মুখ দেখে জলে,
শব্দের সবল বৈঠা টেনে নেয় দূরে
শুশুকের দীর্ঘশ্বাস লাগে না মাস্তুলে।

ঘরের উঠোনে ছায়া, বৃক্ষ সারি বাঁধা
প্রতিবেশিনীর চোখে কোমল পরিধি !
মাটিতে ছড়ানো ছেঁড়া, জলধোয়া পাতা
নষ্ট ফুল, শ্যাওলা, দাগ, আকাঙ্খা প্রভৃতি।

শিশুর দুরন্তপনা খেলা করে মাঠে—
পার্কের পেন্সনবুড়ো ঠাণ্ডা-লাগা ভয়,
কাতর ঘুমের রাত্রে খিল-দেয়া কপাটে
স্বপ্নগুলো হাত রাখে ; ধাবিত সময়।

কাকে ডাকবো হৃদয়ের উঠোনে দাঁড়িয়ে ?
আমার গলার স্বর ভেঙে যেতে চায়
আমার গলার স্বর যদি ভেঙে যায়
ফাল্গুন বাউল তুমি একতারা বাজাও।

সহজ হওয়ার শব্দ সবচেয়ে কঠিন ;
খুঁজি যত হৃদয়ের আন্তরিক ধ্বনি—
জলতলে নানা বর্ণ লঘুপুচ্ছ মীন
ধীবরের জাল লক্ষ্যে এগোয় দিনদিনই।

যে আছো ঘরে কি বাইরে, আন্তরিক থেকো।
সচ্ছল শব্দের কণ্ঠ রোধ করে ভয়,
একা বা অনেকে মিলে শবাধার ঢেকো
অতল পাথরে মগ্ন হয়ো না, সময়।

অক্ষরমালা ॥ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

হে প্রিয় অক্ষরমালা, তরঙ্গিত মৌন নীলিমায়
ডুব দাও অতর্কিতে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে,
ধৌত হোক রক্ত, পুঁজ, এতদিনে পুঞ্জিত ধুলায়
শরীরে যা আছে লেগে ব্যবহারে, জীর্ণ ব্যবহারে।

ক্রীড়নক সেজোনাক আর লিপিবণিকের হাতে
কলুষিত লেখনীতে হয়ে ক্রীত বেশ্যার বেসাতি,
বেলোয়ারী মজলিশের মোসায়েব, প্রগল্‌ভ হা-ভাতে
ভাঁড়েরা বাহবা দিয়ে যতই করুক মাতামাতি।

সঙের আড়তে আর থেকোনাক আত্মমগ্ন পাপে ;
তাজ কিম্বা ছিন্ন রাজমুণ্ড-মার্কা মোহরে ডলারে
স্ফীতোদর ব্যবসায়ীর করতালি-মুখর প্রলাপে
উচ্চাশা যেখানে নত উৎকোচের পায়ে বারে বারে।

এর চেয়ে নিমজ্জিত হওয়া ভালো শুদ্ধ নীলিমায়—
সৃষ্টির আগের সিক্ত অন্ধকার চেতনার স্বাদ,
ঘুমে আর জাগরণে মিশে গিয়ে ভ্রূণের সত্তায়
অঙ্কুরিত হবে ক্রমে নবজাত শিশুর আহ্লাদ।

হে বাক্‌, সে নীলিমা কি আমারই এ গভীর হৃদয় !
ধূর্ত দিনমানে যেথা রক্তের আড়ালে চক্ষু মুদে
গোপনে স্পন্দিত হও ; রাত্রিকালে ত্রিভুবনময়
উৎসারিত হও বেগে নক্ষত্রের অজস্র বুদ্‌বুদে।

হে প্রিয় অক্ষরমালা, তাই আমি পারিনা ঘুমাতে !
যখন ঘুমায় বেশ্যা, বিপর্যস্ত লম্পট আরামে,
তখনি অক্ষত যোনি কুমারীর শুচি ও নিষ্ঠাতে
উন্মুখ আমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত সে প্রসাদ নামে।

তখন সাজাই আমি তোমাদের বিচিত্র সংশ্লেষে
আর্তুর র‍্যাঁবো-র মতো, বেঠোফেনী সিম্ফনী-ঝঙ্কারে
বাজাই ; সে সঙ্গীতের নগ্ন তরবারির আশ্লেষে
কাঁপাই এ নগরের উচ্চশির দম্ভের মিনারে।

নিকটের ঘ্রাণ ॥ তুষার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাস চাহিনা আর। প্রতি অঙ্গে নিকটের ঘ্রাণ
অবলুপ্তি আকাঙ্খিত অই দীপ্ত মুখের বলয়ে।
বহুবর্ণ অন্ধকার রূপান্তরে আলোর প্রমাণ
সাজায় নিয়ত সূর্য আস্বাদিত কুসুম সকাশে।
কেহ দূরে থাকিও না। বয়সের মৌলিক অভয়ে
দ্যুতিময় মুখগুলি প্রজ্জ্বলিত করো প্রতি ভাসে।

বহুবিধ অবিশ্বাস। অবক্ষয় কিঞ্চিৎ চোয়ালে
পতন প্রশস্ত করে প্রতিদিন। তথাপি প্রস্তুতি
সোপান সজ্জিত রাখে। আরোহণ দূরত্বের ভালে
বাজায় সমুদ্র শৈল বিশ্বাসের প্রাত্যহিক প্রাতে।
প্রশাখায় লোধ্র রেণু। অবয়বে মালবিকা দ্যুতি
পত্রপুষ্পে সমুজ্জল। জলে তৃষ্ণা সশব্দ প্রপাতে।

প্রবাস চাহিনা আর। প্রতি অঙ্গে নিকটের ঘ্রাণ।
বহুবর্ণ অন্ধকার প্রতিবিম্বে আলোর প্রমাণ ॥

একটি কবিতা ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুই কি রেহাই পাবে না? বেইমান বছরগুলো জবাব
না করে একে একে সরে পড়তে থাকে। এমনকি তোমার মন,
তোমার ভালোবাসা? শীতের হাওয়া প্রশ্নগুলোকে
ঠেলে সরিয়ে রেখে চম্পট দেয়।

দেখতে দেখতে তোমার মুখের রুচি মলিন হলো।
তোমার হাসি আমাকে বলে আর দেরি নেই।

অথচ, আমাদের ছেলেটার দুরন্তপনায় এখনও
সময় টলমল করছে।

তিন বৃদ্ধের এক রাত্রি ॥ মালিনী বসু

তিন তথাগত বৃদ্ধ কারুণিক, সরল, সুস্থির
সায়ং মাঠ দিয়ে যেতে ঈষৎ আলাপ ; কিংবা শোনে
ধান কাটানির শেষ পরব : বিলাপগাথা ; গণে
শিশিরে বিমর্ষ নিমপাতা থেকে লিখন গভীর।
কুঞ্চিত ও ধ্যানী কোনো বংশধর ধাইমার কোলে
ক্বচিৎ ; 'ভ্রূণের মুখ, আহা দেখো, কেমন অগাধ।'
ম্লান করুণায় ভাবে, আইবুড়ো মেয়েদের সাধ
লণ্ঠন দুলিয়ে হাতে গ্রাম্য কুয়াশায় গেছে চলে,
মূর্চ্ছা যায় সুতাশঙ্খ অতিপুষ্ট কমলার ঘ্রাণে।
'কই সে বিষণ্ণ বাসা?' খোঁজে ঝিঁঝি যে দিব্য সময়ে
তখন রাখবে রুটি তিন ক্রান্ত দেবতা সদয়
শীতার্ত গৃহীর জন্য, দীন কাঠবিড়ালিও জানে।

শেষ যারা কুঁকড়োর খামারে বুড়ীর ঘর জেলে
আরেক শস্যের মাটি পূজা করে যায়, তারা দেখে
আর নগ্ন যে যুগল বিশাল, সুহৃদ্ চাঁদ মেখে
গোরস্থানে অতিকায় ঘাসে শুতে আসে—পিছে ফেলে
তিন স্তব্ধ বৃদ্ধ যায়, যেন দেবভাষায় সকলে
শেষরাতে স্তব সব দীর্ণ উপাখ্যান দুর হলে॥

শিল্পীর স্বধর্ম

অসীম রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিষ্টিসিজম' প্রসঙ্গে বই লিখে জনৈক গ্রন্থকার তাঁকে উপহার দিলে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাজ্ঞ পুস্তক প্রশংসা করে বলেছিলেন, "লিখেছে ভালই, তবে মিষ্টিক হলে আমি কবি হতাম না।" রবীন্দ্রনাথের এই মৃদু অথচ গভীর শিল্পী সত্তার প্রতিবাদ লেখকদের বারবার কোনো অপার্থিব অলৌকিক ভূষণে ভূষিত করার বিরুদ্ধে। যেন তাঁদের লেখা মনুষ্যজন্মের ওপারে কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকের রূপকে ঠেলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের মহত্ত্বের অভয়পত্র দিতে আমরা নারাজ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উইলিয়াম শেক্সপীয়রকেও কিছুকাল আগে 'মিষ্টিক' বানাবার অপচেষ্টা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে।

'আমি মিষ্টিক হলে কবি হতাম না,' একথা সাহিত্য এবং শিল্পের অন্যতম মূল সূত্র। যিনি ভক্ত বা যোগী তাঁর প্রকাশে প্রয়োজন নেই, তাঁর বোধেই শান্তি, তাঁর ধ্যানেই আনন্দ। স্রষ্টার ঐশ্বর্যের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত তাঁর জীবনের লক্ষ্য, ভক্তির মাধুর্যে অন্তর ধৌত করা প্রাত্যহিক রুটিন। ঈশ্বরই তাঁর একমাত্র টান, আর সবকিছুর সেইটুকুই প্রয়োজন যা ঈশ্বরের নামগান করে। ঈশ্বরের নামগান ছাড়া এ জগৎ সম্পূর্ণ অর্থহীন তাঁর কাছে, প্রায় একটা বিকারের মতো যা ঈশ্বরের করুণায় সঙ্গতি পায়। ভক্ত বলেন, "আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম ; বলেছিলাম, মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ; এই নাও শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমায় অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

আর ভক্তের এই পূর্ণভাব এমনই যে এই ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ চরাচরের ঐশ্বর্য-বর্ণনাও বাহ্য। ভক্তের মতে এগুলো বাড়াবাড়ি। তাই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ঈশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে নক্ষত্রখচিত আকাশ ও নৈসর্গিক শোভার

উল্লেখও রামকৃষ্ণের মতে অবান্তর। ভক্ত তাঁর মতে কেবল তদ্গতচিত্তে জগদম্বার ধ্যানে নিয়োজিত করে তার শয়ন স্বপন জাগ্রত অবস্থা। জ্ঞান তার কাছে বাড়াবাড়ি কারণ জ্ঞানের মারফত ঈশ্বরকে 'দপ্' করে দেখা যায় না যে অখণ্ড আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবেই ভক্তের মুক্তি। বিদ্যাসাগরকে শুধু পণ্ডিত বলেই মনে হয় নি রামকৃষ্ণের কারণ "শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচাপড়া। না এদিক না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"

জ্ঞানের প্রয়োজন যোগী অস্বীকার করে না। কিন্তু একটা পর্যায়ে পৌছবার পর জ্ঞানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। "জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মাকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাদে পৌছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী—সেই ইট চুণ সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। নেতি নেতি করে যাকে ব্রহ্মা বলে বোধ হয়েছে তিনি জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নিগুর্ণ তিনি সগুণ।' (কথামৃত)

কিন্তু সেই বিশিষ্টরূপ জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেন তাঁর কী কাজ ?—"সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলার শক্তি থাকে না।" এই কথাই আরও স্পষ্ট করার জন্যে যোগী ব্যাখ্যা করেন : "নুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক ?"

রামকৃষ্ণের বিজ্ঞানী অবশ্য একটা কনসেশন করে। শঙ্করাচার্য যেমন লোকশিক্ষা দিয়েছিলেন তেমনি "সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।" কিন্তু লোকহিতার্থে এই কনসেশানটুকু থাকলেও যোগীর সমস্ত মেজাজের ঝোঁক কখনই কর্মের ওপর নয়, এমনকি, নিরাসক্ত কর্মের ওপরেও নয়। নিরাসক্ত কর্মের গুণবর্ণনা যোগী নিশ্চয় করেন কিন্তু ঈশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণনা বিনা নিরাসক্ত কর্মকে সম্পূর্ণ মদৎ দিতে তাঁর মন সরে না। কারণ ঈশ্বরমাহাত্ম্য-বর্ণনা ছাড়া নিরাসক্ত কর্ম তো শেষপর্যন্ত

মানুষকে পচা ভাগাড়ে ঠেলে দেয়, ঠেলে দেয় বিষয় আসক্তির দিকে, কামিনী-কাঞ্চনের দিকে। তাই নিরাসক্ত কর্মের চেয়েও ত্যাগের দিকেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যোগীর লক্ষ্য। রামকৃষ্ণ তাই বিদ্যাসাগরকে বলেন: "তুমি যে সব কর্ম করছো, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতেই ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।" কিন্তু এই পর্যন্ত বলে যোগী আশ্বস্ত হন না, ভয় পাছে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, বিপথে যায়, পাছে নিষ্কাম কর্মের সড়ক তাকে ভাগাড়ের ফটকে নিয়ে যায়, তাই একই সঙ্গে উপদেশ: "কিন্তু যত তাঁর ওপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।"

নিষ্কাম কর্মের বদলে ত্যাগ, সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমাহিত হওয়া, একেবারে 'চুপ হয়ে যাওয়া' এই জগতে বিদ্যাসাগরের মতো নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে সেই স্বল্পক্ষণের আলাপের মধ্যেও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "গীতার অর্থ কি ?" রামকৃষ্ণ যেন এক প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে অদৃশ্য অসিযুদ্ধে নেমেছেন তার সমস্ত সন্দেহভঞ্জনের জন্যে। "গীতা গীতা দশবার বলতে গেলে ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর, সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।"

তাই সংসারী লোকের জন্যে কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো কর্মী পুরুষদের জন্যে কিছু কনসেশান করলেও যোগীর আসল লক্ষ্য ত্যাগ এবং শেষপর্যন্ত সমাধি। যে সমাধিতে মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়, শারীরিকভাবে সে এমন পর্যায়ে পৌছায় যে সে জীবিত ও মৃতের ঠিক এক মাঝামাঝি অবস্থায়। বাইরে থেকে সে মুমূর্ষু কিন্তু যোগীর কাছে সেইটাই জীবনের লক্ষ্য কারণ তিনি তখন ঈশ্বররূপ চৈতন্যসাগরে ভাসছেন। এ অবস্থা যেমন নিরাসক্ত কর্মের পক্ষে অনুকূল নয় তেমনি শিল্পের পক্ষেও কিছুমাত্র সুবিধাজনক নয়। শিল্পীর কাছে যোগীর এই নির্বিকল্প সমাধি মানে আত্মিক মৃত্যু।

সংসারী লোকের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কনসেশান করলেও যোগীর লক্ষ্য এই নির্বিকল্প সমাধি যার পর সে আর "ফেরে না।" কিছু কিছু লোক ফেরে লোকশিক্ষার জন্যে যেমন রামকৃষ্ণ নাম করেন শুকদেব, নারদ, শঙ্করাচার্য এবং ঘরে ঘরে গিয়ে ঈশ্বরের কথা শোনাবার মারফত তিনিও প্রকারান্তরে নিজেকে সেই দলে ফেলেন। কিন্তু সবসময়েই গৃহী মানুষ বা সংসারী বেশির ভাগ মানুষের থাক নির্বিকল্প সমাধিস্থ যোগী বা এই বিজ্ঞানী যাঁরা সমাধির পরেও লোকশিক্ষার জন্যে ধরার ধুলি গায়ে মাখেন তাঁদের থাক থেকে আলাদা। এঁরা দু-জাতের লোক বা বলা যেতে পারে দু-শ্রেণীর লোক। এই নিত্যসিদ্ধ আর ভবের পাঁকে পঙ্কিল মানুষের পার্থক্য যোগীর কাছে এমন প্রবল প্রকট যে প্রবলতার তুলনা মেলে কেবল রাজনৈতিক নেতাদের মানসে। রাজনীতিতে পটু নেতাদের বাস যেন এই নিত্যসিদ্ধ যোগীদের মতো এক স্বতন্ত্র থাকে এবং যারা রাজনীতি বোঝে না, মোটামুটি খেয়ে পরে সংসার পালন করে জীবনের সার্থকতা খোঁজে বা যারা সাধারণ ভোটদাতা, তারা থাকে আর এক নিম্ন থাকে।

সংসারী মানুষ সম্পর্কে যোগী বলেন যেমন রামকৃষ্ণ বলেছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের: "তোমরা নিজে নিজে তো দেখছো, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছো ? আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরেজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে, তাদের বুটজুতার গোঁজা দুবেলা খায়! এর কারণ কেবল কামিনী। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তুলবার যো নেই! তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।" (কথামৃত, প্রথম খণ্ড)

অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা মানুষের দুঃখ অপরিহার্য। এই বন্ধন কাটানো ছাড়া কিংবা স্ত্রীলোককে বা স্ব-স্ত্রীকে ব্রহ্মময়ীর অংশ বা মা বলে পূজো করা ছাড়া (যা সংসারী জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য প্রস্তাব) তার আর মুক্তি নেই। যোগীর কাছে কখনই মনে হয় না যে জীবজগতের অন্তর্নিহিত যুক্তির ফলে এবং সৃষ্টির তাগিদেই কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা এ ভুবন।

ঈশ্বর সম্পর্কে কর্মীরা কি বলেন ? কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা ভুবন কি তাঁদেরও পীড়া দেয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, তাঁদের আদর্শের পথে কাঁটা হয় ? কর্মীর বক্তব্য এক্ষেত্রে স্বভাবতই উল্টো কারণ তাঁর কর্মের জগৎ মানেই কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা এ ভুবন। পার্থিব জগতের আসক্তি মানুষ যদি ত্যাগ করে তাহলে তার

আর বাঁচার উদ্দেশ্য নেই। তার শিক্ষাবিস্তার, জীবনের মান-উন্নয়ন, তার সংস্কারমুক্তি, তার সম-অধিকার এই সমস্ত ব্যাপারের ব্যাপারী হলো রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মী। নিরাসক্ত মানুষকে বরং কর্মী সন্দেহের চোখে দেখে তাকে ভাবে সমাজবিরোধী। কর্মীর মূল্যবোধের কাছে যোগীপুরুষ চোর ছ্যাচোড়ের চেয়েও বিপজ্জনক কারণ যোগীর ইহলোকের পরিধি বিস্তারের চেষ্টায় তার কিছু করণীয় নেই।

রামকৃষ্ণ যেমন যোগীদের প্রতিভূ, তাদের তরফের একজন বাঘা উকিল, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্মীদের মুকুটমণি। ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টার স্তর ঠিক এয়ারপোর্টে সন্থনাবা সাংবাদিকপরিবৃত দেশনেতার কর্মপ্রচেষ্টার স্তরে অবশ্যই নয়। কারণ তত্ত্ব এবং কর্মের মাঝখানে যে প্রবল ফারাক আজ বিশ্বের রাজনৈতিক জগতে সর্বত্র, সে ফারাক বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং এখন সাধারণ মানুষ যে বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে রাজনৈতিক নেতাদের পানে ছোটে (তা সে নেতা ভারতীয়, রুশ, আমেরিকান কি চৈনিক হোন না কেন) তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের যোগীদের মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ ভক্তবৃন্দের বিহ্বলতা তুলনীয়। সে যুগে যোগী বলতেই লোকের মনে ভেসে উঠত ঈশ্বর বা ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্য আর এখন দেশনেতার উপস্থিতি তাদের মনে জাগায় কচি পাঁঠার মাংস, কাটা পোনা বা সুন্দর ঝকঝকে তকতকে ফ্লাট অর্থাৎ ভালোভাবে খেয়ে পরে থাকার স্বপ্ন। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র এই স্থূল দেশ-নেতাদের এক পংক্তিতে নন, ভোটের বা পার্টির মোহিনী ফাঁদ পাতবার কোনো চিন্তাই তাঁর মাথায় ছিল না কিন্তু মূল্যবোধের দিক থেকে তিনি এই মঙ্গল-সাধকদেরই নেতা।

শ্রীম বর্ণিত বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের যোগাযোগ বা প্রকৃতপক্ষে সংঘাত তাই এক মূল্যবান পাঠ। মাস্টার একদিন তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, "তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি ? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

বিদ্যাসাগরের প্রথম বক্তব্য "আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি যেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে", এ-প্রস্তাবে নিশ্চয় রাজনৈতিক নেতা কূটনৈতিক হাস্য সংবরণে চেষ্টা করেন। কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে "নিজের এরূপ

হওয়া উচিত" কথাটা অভিধানে নেই কিংবা থাকলেও তার অর্থ আকাশচারী আদর্শবাদ। নিজে কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে রাজনৈতিকদের খেয়াল নেই কিংবা খেয়াল থাকা সম্ভব নয়। নইলে রাজনীতিক্ষেত্রে আদর্শ প্রয়োগে অবশ্যম্ভাবী শাঠ্য বরদাস্ত করা যায় না। গণতন্ত্রের আওতায় ভোটযুদ্ধ যেমন পৌরাণিকযুগের ক্ষাত্রধর্মসম্মত নয় এবং যে কোনো হাতিয়ারই সেখানে প্রযোজ্য তেমনি সাম্যবাদী জগতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে সবরকম পন্থা অবলম্বন করার নজির যত্রতত্র। কিন্তু ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি রাজনীতির আওতার বাইরে থাকলেও বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় প্রস্তাব 'প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়' এ্যাডাম্ স্মিথ্ থেকে কার্ল মার্কস্ সমস্ত রাজনৈতিক গুরুর প্রতিপাদ্য। এই লক্ষ্যের জন্য ভোটযুদ্ধ বা গুলি খেয়ে মরে যাওয়া, কারাগারে লাঞ্ছনা কিংবা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের জন্যে প্রস্তুতি। একটা মোটা অর্থে জগতের মঙ্গল কর্মীর জীবনে মূল লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য অথবা এরই জন্যে নিজেকে নিয়োগ যোগীর চোখে আবার সন্দেহজনক। যেমন জগতের মঙ্গলসাধনে ঈশ্বরচন্দ্রের নিরন্তর অস্থিরতা রামকৃষ্ণের কাছে অহেতুক, প্রায় নাবালকসদৃশ। "তুমি করবার কে ? যিনি করবার তিনি করবেন"।—একথা যোগী বার বার কর্মীর সামনে রেখে আসছে। কখনও কখনও সোজাসুজি বিতণ্ডায় না নেমে জগতের হিতসাধন এবং ঈশ্বর সাধনা অখণ্ড বলে' যোগী তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকে পাশ কাটিয়ে যান বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর এষণা যোগীর কাছে আসক্তির নামান্তর, কামিনীকাঞ্চনের নাগপাশ আরও দৃঢ় করার সাধনা।

যোগী ও কর্মীর পাশাপাশি আর একটি বক্তব্য আছে যে-বক্তব্য শিল্পী মাইকের সামনে না দাঁড়িয়েও কিংবা প্রচুর শিষ্যপরিব্যাপ্ত ধর্মসভা আহ্বান না করেও নিজেদের শিল্পকর্মের মারফত যুগের পর যুগ রেখে আসছেন। তাঁদের কর্মের মাঝখানে এলে দেখা যায় যোগী ও কর্মীর এই বিবাদমান শিবির আসলে একটাই অখণ্ড জগৎ যে জগতে রামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে কোনো একজনকে বাছবার মোটা প্রস্তাব ওঠে না। আসক্তি কিংবা নিরাসক্তি, শ্রদ্ধাভক্তি বা কামিনীকাঞ্চন, অন্তরের সমৃদ্ধি বা ছিমছাম ফ্ল্যাট, কচি পাঁঠার ঝোল—এর মাঝখানে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই।

শিল্পী মূলত চাঁদের হাটে বিশ্বাস করে যে চাঁদের হাট রামকৃষ্ণের উষ্মা জাগায়। শিল্পীর কাছে সমস্ত অপমান গ্লানি দারিদ্র্য কাপট্য সত্ত্বেও বেশির

ভাগ মানুষ যে আত্মহনন করে না, তারা এই ধরার ধূলি আঁকড়ে বাঁচতে চেষ্টা করে এই আসক্তি প্রকাণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ। এই আসক্তিই তাঁর মতে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ; মানুষের জ্ঞানের, কর্মের বিচিত্র চেষ্টার পেছনে একমাত্র দীপ এই বাঁচার ইচ্ছে। এই বাঁচার ইচ্ছাকে সে সম্মান করে। তার জন্যে মানুষ যখন "মনিবের চাকরি স্বীকার করে, তাদের বুটজুতার গোঁজা দুবেলা খায়", তখন শিল্পী মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে তার চরণবন্দনা করে। সে যে আত্মহত্যা করে নি কিংবা সংসার ত্যাগ করে নি, যে কোনো প্রতিকূল অবস্থাতেও জীবনের ওপর তার কব্জা আলগা হতে দেয় নি এই বাঁচার প্রবল ইচ্ছা শিল্পীর কাছে প্রবল বিস্ময়ের বস্তু।

আবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন চাঁদের হাটে বিশ্বাসী এবং এ-প্রসঙ্গে যোগীদের বিরোধী তেমনি সে রাজনৈতিকদের মঙ্গলসাধনার যে স্থূল রূপ তারও বিরোধী। আমেরিকা কিংবা রাশিয়া যে-কোনো দেশের রাজনৈতিক নেতা ধনতন্ত্র বা সাম্যবাদের মুখপাত্র হোন না কেন তিনি সর্বক্ষণ মানুষের আনন্দবোধের সঙ্গে তার 'জীবনের মান উন্নয়ন' ওতঃপ্রোতভাবে দেখতে অভ্যস্ত। এই দেখা এমন উৎকট ও বিসদৃশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল প্রতিপাদ্য জগতের হিতসাধন থেকে তা অনেক দূরে সরে এসেছে। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মানুষের সুখের সমস্যা আসলে কাটাপোনা, কচি পাঁঠার ঝোল, ছিমছাম ফ্ল্যাট। প্রাইভেট গাড়ি, রেফ্রিজারেটার, রেডিও, টেলিভিশন থাকা না থাকার সমস্যা, একটা সহরের উন্নতির মাপকাঠি সেখানে কত বেশি স্কাইস্ক্র্যাপার আছে কি নেই।

এই চাঁদের হাট ও প্রকৃত আনন্দবোধ, আসক্তি এবং নিরাসক্তি, এই ঘর্ম-চর্ম-উদরের সমস্যাজড়িত জীবন এবং যোগীর দেশকাল পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ও দৃশ্যমান জগতের বাইরেও সৃষ্টি সংহারের লীলা একই সঙ্গে গ্রহণ করার জন্যে যোগী ও কর্মী দুজনের কাছেই শিল্পী বিপজ্জনক ব্যক্তি অথবা এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঠিক তাঁদের লাইনে পড়েন না এবং তাঁদের ঠিক লাইনে দাঁড় করানোর জন্যে বা সংশোধন করার জন্যে কর্মী ও যোগীদের চলে নিরন্তর চেষ্টা। যোগী কিংবা ধর্মীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ লোকজন তাই সবসময় শিল্প প্রচারের সার্থকতা খোঁজেন ঈশ্বরমাহাত্ম্য তার মাধ্যমে কতদূর প্রচারিত সেই কষ্টিপাথরে আর রাজনৈতিক নেতা খোঁজেন সবসময় শিল্পের মাধ্যমে হয় সামাজিক ব্যাধির ইঙ্গিত অথবা এই ব্যাধিমুক্তির জন্যে বিপ্লবের নির্দেশ। শিল্পে

ঈশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণনাও আছে আবার বিপ্লবের ইঙ্গিতও আছে কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই অনিবার্য নয়। মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় চিত্রকলায় যেমন খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়বস্তু তেমনি বিষয়বস্তু লোকায়ত তদানিন্তন জীবন। আমাদের দেশে মন্দিরের গায়ে গায়ে টেরাকোটায় উৎকীর্ণ এক প্যানেলে যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ তেমনি তার নীচের প্যানেলে শিকারের মূর্ত উল্লাস, বাউল গানে দেহতত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহাতীতের সন্ধান।

শিল্পীর বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্যে 'আর্টি' হবার প্রয়োজন নেই। বাজখাই দাড়ি রাখাও খুব একটা আবশ্যকীয় সর্ত নয়। লাল ডগ্‌ডগে পাঞ্জাবীর সঙ্গে হাফপ্যাণ্ট পরেও তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা কিংবা শিল্পের নামে হকচকানোর সংক্রামক ছেঁদোমি তার পথ নয়। তার পথে সে একলা হাঁটছে না, বহুকাল ধরে জগৎ জুড়ে বহু শিল্পী হেঁটে এসেছে এবং শিল্পের এই প্রবল ঐতিহ্যের গর্বে সে এমন গর্বিত যে রাজনৈতিক নেতাদের পুরস্কার বা অভিশাপ তাদের স্পর্শ করে না। তারা জগৎ সংসারকে যোগীর মতো পচা ভাগাড় ভাবে না তেমনি রাজনৈতিক কর্মীদের মতো মানুষকে কেবল উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার ভাবতেও অরাজী। সে তার দু-বাহু দিয়ে একসঙ্গে যোগী ও কর্মীর জগৎ ধরে থাকে, একই সঙ্গে তাকায় বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের দিকে।

"আমি মিষ্টিক হলে কবি হতাম না" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ-বক্তব্য এবং তাঁর কাব্যচর্চার ঐতিহ্য আর একটু টেনে বলা যেতে পারে, 'আমি রাজনৈতিক কর্মী হলেও কবি হতাম না।' কারণ মিষ্টিক হলে পার্থিব যেহেতু কেবল অপার্থিবের প্রতিবিম্ব, দৃশ্যমান জগৎসংসারের লীলার কোনো নিজস্ব গতিও নেই, তাৎপর্যও নেই, তেমনি মানুষ রাজনৈতিক কর্মীর কাছে প্রধানত ভোটদাতা, তার সার্থকতা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে সে কতখানি পুষ্ট। তার মানে নিশ্চয় এ নয় শিল্পীর কাছে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যার কোনো দাম নেই, বরং মানুষকে যেহেতু তার চারপাশ থেকে তার ধরবার চেষ্টা সেজন্যে এই সমস্যার প্রত্যেকটিই তাকে আলোড়িত করে যেমন গব্‌সেকের প্যারি শহর বালজাকের পরম আকর্ষণ। এই শাঠ্য ও কাপট্যের শহরে যেখানে প্রেম, সন্তানস্নেহ ইত্যাদি মানুষের প্রাথমিক অনুভূতির ওপর টাকার করাল ছায়া সেই শহরও যোগীর পচা ভাগাড় নয়, আবার নয় আধুনিক সাংবাদিকদের 'এক্সপোশার ক্যামপেন্'-এর বিষয়। বস্তুত মানুষের অসহায়তা শিল্পীকে কখনও বিচারকের আসনে বসায় না যে আসন যোগী ও কর্মী (রাজনৈতিক

নেতা বা সাংবাদিক) দখল করবার জন্যে সবসময় উন্মুখ। মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা যেমন তাকে দুঃখ দেয় তেমনি সে মজা পায়। আর এই মজায় বুঁদ হয়ে সে তার জগৎ প্রকাশ করে। এই মজাটা না থাকলে শিল্প জমে না।

শিল্পীর এই দ্বৈত সত্তার আশ্চর্য রূপক অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ভাস্কর্যে, শিবের ত্রিমূর্তিতে। রিলিফে খোদিত পাশের দুই প্রোফাইলের মাধ্যমে রূপায়িত মানুষের দৈনন্দিন সংঘাত, প্রেম এবং অপ্রেমের, শক্তি এবং সৌন্দর্যের, —বলা যেতে পারে তা কর্মীর জগৎ, মানুষের ষাট সত্তর বছরের খণ্ডিত জীবন, সাম্প্রতিক কাল। কিন্তু ফুলের মতো পরিপূর্ণ ভাস্কর্যের রূপে স্থাপিত মাঝের মাথাটি অনন্তকালের মুখ, যোগীর তন্ময় ধ্যানের রূপ বা শিল্পীর চোখে আবহমানকালের বিমূর্ত ইতিহাস যার সঙ্গে বিযুক্ত থাকলে মানুষের ষাট-সত্তর বছরের জীবন বা সাম্প্রতিককাল অর্থহীন, বর্ণহীন এক যান্ত্রিক সুখবোধে পরিতৃপ্ত অস্তিত্ব।

যোগী ও কর্মীর এই দুই শিবির একই সঙ্গে শিল্পী গ্রহণ করেন বলে সভ্যতার ভবিষ্যতের দিক থেকে তাঁদের কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মূল্যবোধেই বলা যেতে পারে মানবসভ্যতার মুক্তি। বাস্তবিক তারা রামকৃষ্ণের জনক রাজা যিনি "ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি"।

বাবলতলীর মাঠ পেরিয়ে

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

গত বর্ষণের জমেওঠা জল শীতের শেষ দিনগুলোয় শুকিয়ে যেতেই স্তরে স্তরে নরম পলিঢাকা অনাবাদী নাবাল মাঠটা হলুদ ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে ছিল। তারপর দিনে দিনে ঢালু আকাশ গড়িয়ে বাড়ন্ত রোদ নামতে থাকলে নাবাল মাঠটাকে কোনো রোগভুগেওঠা চাষার গতর দেখাল। ফাটাফাটা উস্কোখুস্কো চামড়া, কিন্তু তেল মেখে চুকচুকে, রোদ পোয়াচ্ছে শুয়ে শুয়ে। এবং এখন চৈত্রে আস্তে আস্তে সবখানে সবুজ চিকন নরম নরম দুর্বাঘাসেরা ছেয়ে গেছে। পা ফেলতে সুখ। মোলায়েম সুখগুলোয় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সুখী হতে হতে নীলকান্ত, ভূষন আর কপিলেশ্বর কুনাই মাঠটা পেরিয়ে যাচ্ছে বেলাবেলি।

বিকেলের হাওয়ায় কিছু কিছু আদুরে গন্ধ। ঘাসের, পলিমাটির ও অন্য কিছুর। ওরা তিনটিতে ফিরে ফিরে দু-একবার চারপাশটা দেখতে দেখতে আপন আপন মনের তাকে কোন পুরনো চাষাড়ে ইচ্ছেকে ঝেড়েঝুড়ে তুলে রাখল সন্ধ্যার আগেভাগে।

'প্রচুর বোরোধান দিতে পারে জননীটো।' বুড়ো কপিলেশ্বর কবার বললও একথা। ভূষন তাকাল নীলকান্তের চোখে। নীলকান্ত মুখ টিপে হাসল। নীলকান্ত ভূষনের ইচ্ছেটা টের পেয়ে গেছে। ভূষনটা বরাবরই বড্ড সংসারী। 'শালা অনেক দেখলামরে! অনেক মাঠ ধানের থোড় হয়া বড়ো বড়ো ডাঁটালো শীষ। পেঁচিয়ে কেটে মুঠোয় রাখতে না রাখতে ফস্ করে গলিয়ে গেছে।' ভূষন গজগজ করছে। 'কোথা যে যায় এত সব বড়ো বড়ো মাঠ লম্বা লম্বা শীষগুলা! ভুমার মশাই, বানবন্যার কথাটি বাদ দ্যাও বরঞ্চ।'

নীলকান্ত বলল, 'তাইলে?'

'আমি কোন আশা রাখিনে। না!'

অবশ্য দুজনে কপিলেশ্বরের কান বাঁচিয়ে বলছে কথাগুলো। নীলকান্তর কাঁধ ছুঁয়ে গেছে ভূষনের চিবুক। দুটিতে পাশাপাশি হাঁটছে।

নীলকান্তর ছেলেমানুষ মুখখানা গাঢ় হলো। 'জানিস্ ভূষনদা, আশায় খাটে চাষা, ইটো ডাকপুরুষের বচন ?'

কপিলেশ্বর এটুকু শুনতে পেয়েছে। 'ডাকের বান শিকেয় তোল বাছারা। পা চালিয়ে চলো। পোকামাকড়ের বিত্তেন্ত রয়েছে ই মাঠটোতে।' বুড়ো বেলা দেখল ট্যারচাচোখে পেছন ফিরে। এবং 'পোকামাকড়' এই গোমড়া দড়পানা শব্দটা পায়ের নিচে ঘাসে ঘাসে খসখস করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। কচি দুর্বোর সুখের অসুখটুকু টের পেয়ে পা ফেলার আওয়াজগুলো আরো বড়ো বড়ো করে কাঁপিয়ে তিনটিতে ধুকুর ধুকুর ছুটেছে। কপিলেশ্বর ওদের দুটিকে পেরে ওঠে না। বারবার পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্রীভাবে ঝাঁকুনি খাচ্ছে ওর খ্যাবড়া গতরটা। 'কোথাও সুখটি একা নেই।'

ধাবমান নীলকান্ত ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কী বুললে কাকা ?' প্রশ্নটা নেহাৎ ওকে খুশি করার গরজে।

'দ্যাখ্ না রে বাছা, কেমন সোন্দর জায়গাটো অথচ ··' কপিলেশ্বর গঁক গঁক করে হাসবার তালে, 'সব্বক্ষন তরাস।' ওর হাসিটা আক্ষেপের চোটে ভাঙাচোরা। 'চিরটা কাল শুধু এই দেখলাম রে বাছারা, চিরজেবন ধরে।'

ভূষন আচমকা দাঁড়িয়ে গেছে। 'ধেৎ!'

নীলকান্তও দাঁড়াল। 'কী রে ভূষনদা ?'

'বুড়োটা এমন ভয় দেখায় মধ্যে মধ্যে ; উর সঙ্গে কোথাও যেতে নাই।'

'উঁহু। মিথ্যে না। ছোটবাবু বুলছিল।'

'কী বুলছিল তুর ছোটবাবু ?' ভূষন কপিলেশ্বরকে পৌছতে দেখে আবার পা বাড়াল।

'সেদিন শীকারে এসেছিল তো। চারটে।' আঙুল তুলে দেখাল নীলকান্ত। 'সবগুলো কালো। কিন্তক'···নীলকান্ত ঢোক গিলল। 'দেখে লিবি ভূষনদা, কলের চাষ পড়লেই শালারা বিলবাগে পালাবে।'

ভূষন গোমড়া মুখে বলল, 'তাতে তুর-আমার লাভ ?'

কপিলেশ্বর শুনতে পেল। মাঠের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ সাপের কথাটা মনে পড়ে ও ভীষণ ভয় পেয়েছিল। শুধু ভয় না। রাগ ও বিরক্তিতে চটে আগুন। মাঠের ও মুড়োয় পা রাখবার সময় মাঠটাকে পোয়াতী করা যায় কিনা—এ-নিয়ে সকল চাষার মতোই জল্পনা করছিল চুপিচুপি।

তাই চেঁচিয়ে উঠল ভূষনের কথা শুনে। 'মাঠ ফললেই চাষা তুষ্ট। চাষার নয়ন দুটি সাথক।'

রাগ মানাবার ইচ্ছেয় নীলকান্ত ওকে সঙ্গ দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো কাকা, ই মাঠটো পতিত ক্যানে, ই বিত্তেন্তটা সত্যি মানো ?'

'মানি রে মানিক। শুনেছি লাঙলের ফালের শেয়রে একটি করে উঠে এসে নেত্য করে তাথৈ তাথৈ।'

কথকঠাকুরের মতো অভিজ্ঞ আর সুন্দর মায়াকরা মুখ কপিলেশ্বরের। নীলকান্তকে ভালো লাগল। কিন্তু ভূষনটা ঠোঁটকাটা। 'নাঃ, ইটো মিথ্যে।'

'মিথ্যে ?' বুড়ো আরো রেগেছে।

'হ্যাঁ। অন্যকিছু দোষ রয়েছে মাঠটোর।'

'কী দোষ ?'

'সঠিক বুলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে লিলে কথাটো।' ভূষন তার বয়সের চেয়ে আরো বড়োসড়ো টানটান হতে চাচ্ছে। 'বাবলতলীর মাঠের বিত্তেন্তটা আমি জানি।'

'কী সে জিনিস ?'

'দলিলপরচার বিত্তেন্ত। নীলুর ছোটবাবুর সিন্দুকে খুঁজে দ্যাখো গে।'

তেজী ঘোড়ার মতো মুখ উঁচু করে এগোচ্ছে ভূষন। কপিলেশ্বর মুখটা নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। নীলকান্ত অন্য কিছু ভাবছে। সাপের কিংবা মাঠের। অথবা বাবলতলী গাঁয়ের এলেও আসতে পারে সেই কমবয়েসী মেয়েটির কথা। এবং মাঠের শেষপ্রান্তে পৌছানর আগেই রোদ শুকিয়ে কালি জমতে থাকলে তিনজনে ক্রমে ক্রমে চলার রোখটা বাড়াচ্ছে।

এরপর মাঠটা একটু উঁচু হয়েছে পূবের দিকে। চিরুটির রেললাইন অব্দি। লাইনের নিচে ডানপাশে হিজলবিল—এ মাঠটার লাগোয়া। বিলের কোলঘেঁষে বাবলতলী গ্রামটা। রানীচকের সকল লোকের মতো এরা তিনজনে গ্রামটার সুখ সম্পর্কে ঈষৎ ঈর্ষা পোষণ করে। রেলগাড়ির সুখ, বিলের জলের মাছের সুখ, ঋতুতে ঋতুতে বিয়োতে পারা মাটির সুখ এবং আরো একটি গোপনতম : বাবলতলীর রাঙা রাঙা পুতুলগড়ন মেয়েদের সুখ। হিজল অঞ্চলের মাটির এমত গুণ—রূপ আর গড়ন ছিরিছাঁদ, দেখলে টুকটুক করে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। রানীচকের জোয়ান চাষারা

বিলপ্রান্তের চষাজমিতে দাঁড়িয়ে দু-এক টুকরো গান ছুঁড়ে না মারে এমন নয়। নীলকান্ত জানে না যাদের এতদিন ধরে দেখে দেখে কাতর হয়েছে চুপিচুপি, তাদের কোনটি অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। চলতে চলতে ধুকুপুকু বুকে থেকে থেকে তাই মোচড় দিচ্ছে : 'কোনোরকমে কোলপাঁজা করে তুলে আনতে পারতাম রে দাদা!' এবং এই ঘুরপাকের তাড়নায় লীলার মুখখানিও ভুলে বসে আছে কখন। উঁচুতে পা বাড়িয়ে যখন একবার পলকে মনে পড়ে গেল, অমনি দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। 'বিড়ি খাওয়া যাক।'

বুড়োও দাঁড়িয়েছে। হাঁফাচ্ছে।

বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভূষন বলল, 'সব কথাবার্তা কিন্তুক রেতের বেলা চুকিয়ে লিতে হবে।'

বুড়োর রাগটা হয়তো পড়েনি। কেবল মাথা নাড়ল।

'কাল ভোর ভোর ফিরবো কিন্তুক, আগাম বুলে দিলাম। মুনিশ বলা আছে।' ভূষন বলল।

নীলকান্ত মনে মনে খুঁত খুঁত করছে। অন্তত সকালের স্পষ্ট আলোয় মেয়েটিকে দেখে যাওয়ার ইচ্ছে। রাতে দেখার ভুলচুক থেকে যেতে পারে। অবশ্যি দেখার ব্যাপারটা আগাম কপিলেশ্বর ও ভূষনই একদফা সেরে গেছে। নীলকান্ত ভারটা ওদেরই দিয়েছিল ঝোঁকের মাথায়। অর্থাৎ লীলার প্রসঙ্গ নিয়ে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল ততদিনে। কতকটা অভিমান। কী হবে দেখে, কানা কি খোঁড়া? মেয়ে হলেই সুখী হবে নীলকান্ত। লীলা ওর জোয়ারমুখো জীবনের প্রথম তোড়টা শুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে। লীলা নাকি কলকাতায় ওর দিদির বাড়ি। দিদিটি কী মেয়ে রানীচকের লোকেরা যতখানি জানে, নীলকান্তও। সুখ খুঁজতে গেছে লীলা।

আশ্চর্য, ছোটবাবু বলে, 'শহরে কোথাও সুখ নেই রে নীলু, বরং গাঁয়ে থাকা অনেক ভালো।' 'কেনে ছোটবাবু?' 'সুখের খনিতে সুড়ঙ্গ কাটতে গাঁয়ে এলুম।' ছোটবাবু দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে হেসে হেসে একথা বলছিল। এবং নীলকান্তর আলতো মনে হয়েছিল, 'তাহলে মাগীটো হন্যে হয়ে ঘুরে আসবে।' তিনটি মাস অপেক্ষা করে দেখল। অথচ লীলা এলো না। ছোটবাবু বলল, 'ছোঁড়াটা শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন রে?' নীলকান্ত তখন কিছু বলতে না পেরে সময়মতো ঘরে ফিরে শুয়ে শুয়ে তার শুকিয়ে যাওয়ার কথাটা অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। কিন্তু কপিলেশ্বর লোকটি বড্ড ভালো। যেন সেও ছোটবাবুর মতো টের পেয়ে গেছে সব। 'বেঁচে গেছিস বাবা, খুব বাঁচা!'

নীলকান্ত হাসতে পারল এতক্ষণে। 'ক্যানে গো?'

'দুই প্রেকার রমণী আছে সংসারে।' বুড়ো বলেছিল। 'ঘরের আর বাইরের। উটো বাইরের। বুঝলি?'

না বুঝেও নীলকান্ত মাথা নাড়ল। 'তাহলে খুব বেঁচেছি।'

'হুঁ হুঁ।'

'আমি একটো মরদ না কাকা, বুলোদিনি?'

'হুঁ হুঁ।'

'আমি বৌ পুষতে পারিনে?'

'হুঁ হুঁ।'

'না মেলে, ভূষনোর মতো থাকব।' কান্না চেপে নীলকান্ত আবার বলল, 'ছোটবাবুর মতো।' কপিলেশ্বর সবটুকু বুঝেছে এমত ভঙ্গীতে ক্রমান্বয়ে হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিল। এই প্রথম জোয়ান বয়সে একা একা শুয়ে ঘুম হয় না, কারুর হয় কি, এবং একটি বছর ধরে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়ে ওঠা লীলার শরীরের ভঙ্গির, কথার তিল তিল জড়োকরা স্মৃতি বুঝি হাড়ের ভেতর শব্দ করে নড়ে বেড়াচ্ছে এবং সবশেষে লীলার নাম হারিয়ে যে-কোনো একটি যুবো মেয়ের নানান স্পর্শের অভাববোধ পলকে পলকে জেগে নীলকান্তর মাংসগুলো সেঁকা-পোড়া হয়। একটি মেয়ে নৈলে যুবোজোয়ান ছেলের পক্ষে বাঁচা মুশকিল।

আঁধার ঘন হয়েছে। পরস্পর মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না। ভূষন ফিসফিস করে বুড়োকে কী বলছে। নাকি ভাব করার তালে! মন্দ মন্দ হাওয়ায় কথাগুলো কিছু কিছু উড়ে পালাচ্ছে। নীলকান্ত খরগোসের মতো খাড়া কাণে এগোল। কপিলেশ্বর বলছে, 'ইটো নিশ্চয় উটোর মতো না। দেখে লিবি ভূষনো।' এবং 'আহা ছোঁড়াটা বড়ো দুঃখুতে রয়েছে।'

'বাবলতলীর মেয়েগুলো বড়ো দড়।' ভূষন বলল। 'হেতুটো হচ্ছে তুমার গে হিজলে মাটি। শুকুলে যেমন ধারালো, ভিজলে তেমুনি জাঁকালো।' লয়ে লয়ে মেলাতে পেরে ভূষন উৎফুল্ল।

নীলকান্ত কিছুক্ষণের মতো আনমনা হয়ে গেল। যতবারই অদেখা

মেয়েটির মুখখানি ভাবতে চাচ্ছে, লীলার আদল একেবারে। বিরক্ত হয়ে আবার কান পাতল। 'বিয়ের মেয়ে, ছোঁড়াটোও দোজবরের মতো দেখতে না।' কপিলেশ্বরর গলা।

ভূষন একটু জোরেই বলে উঠল, 'কিন্তক ছোটবাবুর দিষ্টিটি লাগলেই স্থবাসলতা শুকুবে।'

নীলকান্ত চকিতে দাঁড়িয়ে গেল। 'স্থবাসলতা' ও 'ছোটবাবুর দিষ্টি' নীলকান্তর রাশ টেনে ধরেছে। পারলে যেন প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে, কে স্থবাসলতা বটে, কে হে ভূষনদা?' কিন্তু ফিকফিক করে হেসে ফেলল।

'হাসলি যে?' ভূষন পেছনমুখো হলো একবার।

'হাসলাম।'

'স্থবাসলতার বন্ধন ছাঁদে ছাঁদে…' ভূষন অভ্যস্ত মাতলামিতে সুর করে গান গেয়ে উঠল।

কপিলেশ্বর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে। বুড়োর রাগটা পড়েছে তাহলে।

'কিন্তক ছোটবাবুর দিষ্টি কী বুললি রে ভূষনদা?'

'বাঞ্চোত, তুর ছোটবাবুটো কাল। বুঝলি রে ছোঁড়া, একটিও ঘরে টিকতে দেবে না।'

নীলকান্ত দারুণ অবাক। কথা বলতে ভুলে যাচ্ছে। কপিলেশ্বর কেবল হুঁ হুঁ করল।

একটু পরে মুখ খুলল নীলকান্ত। 'তু বড্ড মিছেমিছি সন্দ করিস ভূষনদা।'

'হবে। কিন্তক আমার চোখ দুটি বাঁকা; সবার মতো সোজা না।'

'তাই সব উল্টো দেখিস।' নীলকান্ত একটু রেগেছে। ছোটবাবুর মুখটা দেখতে পাচ্ছে অন্ধকারে। বন্দুক তুলে একচোখ বুজে একচোখ কুঁচকে—তারাটা চকচক করছে, কোন পাখি দেখছে থির হয়ে। পাখিটা অন্ধকারে কোথাও রয়েছে। একটুও নড়ে না। তারপর নীলকান্ত কোথাও বন্দুকের শব্দ না শুনে পোড়া বারুদের গন্ধ না শুঁকে ভাবল পাখিটার নাম লীলা। নীলকান্তর দাঁতে দাঁত। লীলাকে দেখে ছোটবাবু বলেছিল 'বুনো হাঁস।' 'জানিস নীলু, তোর বৌটা মরশুমী পাখি জলচরা।' 'কেনে ছোটবাবু?' 'বছরে বছরে উড়ে আসে বছরে বছরে উড়ে পালায়।' কেন ওকথা বলেছিল ছোটবাবু, অথচ সত্যি সত্যি ফলে গেল। ভূষনের অপবাদটা

মিলিয়ে এখন একটু করে রাগ হচ্ছে নীলকান্তর। রাগ না ক্ষোভ। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছে মুখ ফুটে চেঁচিয়ে ওঠে, 'চাইনে, কিছু চাইনে।' ছোটবাবুটা যদি এমন হয়, তবে তো কোনোমতেই বেঁচে থাকার মানে হয় না। নীলকান্ত ছোটবাবুর প্রতি দারুণ অভিমানে, চিতায় তোলা স্বজনের মড়া মুখটা শেষবার দেখে নেওয়ার মতো করে এই খসখসে রোঁয়াওঠা অন্ধকারে ছোটবাবুকে একবার দেখে নিচ্ছে। এবং এখন ছোটবাবুকে অতিশয় আনাড়ী শিকারী দেখাচ্ছে। মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টিতে বিস্তারটা মাপছে। ছোটবাবু, তোমার সামনে পেছনে ওপরে পাখি, পাখিদের ডানা-কাঁপানো শনশন শব্দ ঠোঁটের ডাক শুনল নীলকান্ত, বন্দুকটা তুলে ধরো ছোটবাবু……উঁহু ভূষনোটার চোখ সস্তা দামের আয়নার উঁচু নিচু কাচ, নীলকান্ত মনে মনে কথা বানিয়ে ভূষনকে ভৎর্সনা করল: 'বাঞ্চোত তো, ছোটবাবুটো আসলে তুর-আমার মতো একটা চাষা বেক্তি।' নীলকান্ত এটুকুতেও তৃপ্ত না হয়ে আরো শব্দ তৈরি করল: 'ছোটবাবু পাখি ছাখে না, মাঠ। লোকটো উত্তম।'

ভূষনদা! অস্থির হয়ে মুখ ফুটে ডাকল নীলকান্ত।

'উঁ?'

'হাওয়া কেমন বদলেছে, না? শুঁকে ছাখো।'

ভূষন চুপচাপ চলেছে। নীলকান্ত সত্যি সত্যি অচেনা গন্ধ পাচ্ছে। পথের ধারে বনঝোপ গাছ-গাছালি। ক্রমে ঘন হচ্ছে। এঁকেবেঁকে পথ গাঁয়ে ঢুকেছে। পথটা অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মতো বিছানো।

কপিলেশ্বর বলল, 'পথটা গাঁ পেরিয়ে রেললাইনে মিশেছে। সোজা গেলেই কটোক ঘর।'

'অদ্দুর যাব নাকি?' নীলকান্ত প্রশ্ন করল।

'তুর হবুশাউড়ীর ঘর গাঁয়ে ঢোকার মুখে।'

ভূষন মুখ খুলল। 'রেলের লাইন দেখবি?'

'নাঃ।' নীলকান্ত অবশ্য দুঃখিত হচ্ছে লাইনটা দেখতে পাবে না জেনে।

'সকালে থেকে যাস খানিক। আমি তো ভোর ভোর ভোঁ।'

কপিলেশ্বর বলল, 'হাংলা বুলবে রে জামাইটো, ভোর ভোর কাকপক্ষিটি ডাকতে দেরি। গেরোটা এঁটে দিই থাম্‌, তা পরে যতখুশী লাইনের পাশে ঘুর ঘুর করিস।

নীলকান্ত পুলকিত। সুবাসলতার গন্ধ হাওয়ায় অন্ধকারে। কোনো একদিন তারা ছুটিতে রেলগাড়ি চেপে বিনোটির জংশনে যাবে শ্যামচাঁদের মেলা দেখতে। লুকিয়ে শ্যামচাঁদকে প্রণাম করল। এবং রেলগাড়ির ঝাঁকুনি ও গতিবেগের শব্দপুঞ্জের মধ্যিখানে নিজেকে ও সুবাসলতাকে একটুখানি বসিয়ে রেখে পরমুহূর্তে শিউরে উঠল। ছুরু ছুরু বুকে রেলের বাঁশীর মতো শীষ দিচ্ছে লম্বা একটানা একটা বেদনাবোধ। 'ভূষনদা, রেলগাড়িগুলো কলকাতা যায়?

'হ্যাঁ।'

ধাবমান রেলগাড়িটায় তীব্র তীক্ষ্ণ কাঁপা কাঁপা শীষের ডাক শুনতে শুনতে, মনের ভেতর দূর থেকে দূরে, লীলা চলে যাচ্ছে টের পেতে পেতে, অত্যন্ত আচমকা নীলকান্তর হাত ভুটো মুঠো পাকাল। সুবাসলতা, সুবাস, সুবাসী, আদর করে কাতর গভীর ডাকগুলো রক্তে মাখিয়ে নিয়ে মনে মনে বলল, 'ই যাওয়া না, আরো যাওয়া আছে রে মেয়ে, যেতে চাস্ যাবি।'

সেই যাওয়াটা নীলকান্ত একটুকরো ছবির মতো মনের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। লীলা দেখেছিল। সুবাসলতাকেও দেখাবে। কবে শীতকালের মাঠের পথে একটি মেয়ে ও পুরুষকে পাকাধানের গোছা সরিয়ে সরিয়ে দূরের দিকে যেতে দেখেছিল। পাকাধানের মতো গায়ের রঙ একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ। উদোম গায়ে মাঠে চললে একেবারে মিশিয়ে যায় ধানের রঙে। হারিয়ে যায় চোখের বাইরে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। অনেক পরে একদিন লীলাকে বলেছিল, 'জানিস আমার কিন্তু তুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে!' লীলা অবাক। 'কোথা গো?' 'কোথা না যেয়ে শালা শুধু চলেই যাই চলেই যাই মাঠে মাঠে।'

এবং এই পুরনো উত্তমটা জোরদার হতেই নীলকান্ত গভীরভাবে তৃপ্ত। নীলকান্তর চোখ ফেটে আনন্দের জল। সুমুখে বাঁ-হাতি আলো চালাঘর উঁচু ঢিবিতে। গুটিকয় মানুষ। নীলকান্ত চোখ মুছল গামছার খুঁটে।

ভূষন বলল, 'এসে গেলাম তাহলে।'

কপিলেশ্বর বলল, 'হুঁ।'

শান্তি প্রত্যূষে যখন ট্যাসকোনা পাখির চিত্রিত ডিমের মতো আকাশ, নিটোল আর থমথমে, তিনটিতে আবার বাবলতলীর পোড়ো মাঠটা পেরোচ্ছিল।

আগে আগে ভূষন—ঘরেফেরা বলদেরা যে-ভাবে টগবগিয়ে পা ফেলে, তার পেছনে কপিলেশ্বর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সঙ্গ ধরতে নাকাল, তারপর নীলকান্ত—সারাটি রাত ঘুম হয়নি বলে বারবার চোখ মুছছে। রাতের আসরে ও-পক্ষ বেশ কয়েক হাঁড়ি তালের রস যুগিয়েছিল, নেশায় সব চিৎপাত, শুয়ে শুয়ে বেদম চেঁচিয়েছে, এবং নীলকান্তও—অথচ সেই একমাত্র জেগেছিল। সুবাসলতার ছবিটা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হতে হতে রাত ফুরুলো, নেশা ফুরুলো, নীলকান্ত ওদের জাগিয়ে বাবলতলীর অন্য কেউ জাগবার আগে ছুটোছুটি চলে এসেছে। তিনটিতে ভেতরে ভেতরে এতখানি রেগে রয়েছে, কথা বলতে ইচ্ছে নেই। পাঁচ ভরি সোনা ও ছকুড়ি পাঁচ টাকা—ওরা কী পরিমাণে মন্দ তার পরিচয় পেয়ে একটা হার-মানার ক্ষোভ গরগর করছে নিরন্তর।

'রেলধারের শালোরা সব বাবু হয়ে গেছে রে বাছা।' কপিলেশ্বর মাঠের মাঝামাঝিতে মুখ খুলল।

ভূষন বলল, 'চাষার পেরানে অতো শক্ত কথা বুলবে না।'

নীলকান্ত বলল, 'কিন্তক মাঠচরাণী। মাঠ না চরলে ওদর ভরে না সিটো ভুলে বসে আছে।'

'তা ঠিক।' কপিলেশ্বর বলল, 'সুবাসলতার বিত্তেন্ত কি জানি নে? আমার মশাই মাসতুতো দাদার শালীর মেয়ে সম্পক্ক। আমি জানিনে কথান গয়না পরেছিল উর জননী ভগ্নীগণ?'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' নীলকান্ত দাঁতে দাঁত চাপল। 'দেখা যাবে কী দামে বিকোয়।'

ভূষন বলল, 'সুবাসলতার সৌগন্ধ অনেক দামে কিনতে হয় রে ছোঁড়া। তুর ছোটবাবুকে বুলিস্ কথাটো।'

নীলকান্ত বিড়বিড় করল, 'ছোটবাবু অতো টাকা দেবে না।'

'দেবে না, তবে বাবলতলীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকগে যা।' ভূষন হাসল।

নীলকান্ত হঠাৎ পটকাফাটা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোটবাবু ই মাঠটো

চষতে আসবে। আম্মো পাশেপাশে থাকব। দেখবি ভুষনদা, মাটি কামড়াব শক্ত দাঁতে। দেখে লিবি কতো বড়ো বড়ো চাবড়া তুলবো ঘাসসুদ্ধ।' এরা দুটি অবাক হয়ে ওকে দেখছে। নীলকান্ত থামল না। ঢোক গিলে আবার বলতে থাকল, 'মাঠচরানী ছুঁড়িটো নামবে না ই মাঠে? দেখিয়ে দেখিয়ে তখন…' কলের লাঙলের হাতলটা ধরে আছে এভাবে হাতদুটো মুঠো করে গোলাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঠের বিস্তারটা অবিকল ছোটবাবুর মতো মাপতে মাপতে নীলকান্ত আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তখন ঘর্ র্ র্ র্ ঘর্ ঘর্ ভট্ ভট্ ভট্ ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ…'

শুধু কপিলেশ্বরের গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল, 'সাপগুলা তাইলে পালাবে বাছা।'

সকালের রোদে বাবলতলীর মাঠটা শিশুর মতো হাসছে। তিনজনে সেই হাসিতে গতর ডুবিয়ে ডুবিয়ে রানীচক ফিরে আসছিল।

টয়েন্‌বি : নূতন পর্যায়

সুশোভন সরকার

ইতিহাসের ক্ষেত্রে আর্নল্ড্ টয়েন্‌বিকে শুধু ভাববাদী বললেই সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না, মানবিকবাদী দৃষ্টি তাঁর লেখার একটা অন্তরঙ্গ অঙ্গ। কষ্টকল্পনা, ব্যাখ্যার দৌর্বল্য, ধর্মীয় ঝোঁক সত্ত্বেও তাই তাঁর রচনা ভিন্ন মতাবলম্বীদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে। আন্তরিকতা ও সাহস থাকলে মানবিকবাদ যে বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হতে পারে তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল টয়েন্‌বির সাম্প্রতিক বক্তৃতামালায়। আমেরিকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১-১৯৬২ সালে প্রদত্ত তিনটি করে বক্তৃতা বর্তমান আলোচনার উপলক্ষ। অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তিনটি স্বতন্ত্র স্বল্পকায় পুস্তিকায় এগুলি প্রকাশ করে পাঠকদের ধন্যবাদ অর্জন করলেন।

অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'পুনর্বিচার' গ্রন্থটিতেই বস্তুবাদের ছোঁয়াচ টয়েন্‌বিকে স্পর্শ করেছিল। অনেক সমালোচকের মতে ব্যাপক দৃষ্টি ও ইতিহাসের মধ্যে ছকের সন্ধানে তিনি সমসাময়িক ইতিহাস-লেখকদের থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন, বলা যায় এ-ব্যাপারে তিনি বরং মার্কসের কাছাকাছি। নতুন বক্তৃতামালায় টয়েন্‌বি বস্তুবাদীদের মতনই সভ্যতার মূলে দেখেছেন নিছক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন। স্বীকার করেছেন যে পাঁচ হাজার বৎসর আগে সভ্যতার উদয় থেকে আজ

---

* America and the World Revolution by Arnold J. Toynbee—Public lectures delivered at the University of Pennsylvania, spring 1961 (Oxford University Press, 1962).

The Present-day Experiment in Western Civilization by Arnold J. Toynbee—The Beatty Memorial Lectures at McGill University, Montreal, 1961 (Oxford University Press, 1962).

The Economy of the Western Hemisphere by Arnold J. Toynbee—The Weatherhead Foundation Lectures at the University of Puerto Rico, February 1962 (Oxford University Press, 1962),

পর্যন্ত এই অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ত করে রেখেছে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোক। সভ্যতার চাকচিক্যের ভার বয়ে এসেছে কোটি কোটি বিত্তহীন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ হলো চাষী। ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার রূপনির্ণয়ে টয়েন্‌বি খ্যাতি লাভ করেছেন, কিন্তু এতদিনে তিনি মেনে নিতে বোধহয় বাধ্য হচ্ছেন যে শত পার্থক্য সত্ত্বেও অতীতের সকল সভ্যতাই ছিল শ্রেণীসভ্যতা। 'শ্রেণী' কথাটা ব্যবহার না করলেও, 'শোষণ' শব্দটি এড়িয়ে গেলেও 'অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন' ও তার 'অন্যায্য বণ্টন' মেনে নিলে বস্তুবাদের মূলসূত্র অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে না কি ?

শুধু তাই নয়, অতীতের সঙ্গে আজকের দিনের মৌলিক পার্থক্যটুকুও টয়েন্‌বি ধরতে পারছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইতিহাসে এই প্রথম বিজ্ঞান আমাদের হাতে এনে দিয়েছে সেই ক্ষমতা যাতে করে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব। নতুন সভ্যতার সিংহদ্বার খুলে যাচ্ছে, বিত্তবান ও নির্বিত্তের ব্যবধান ঘুচে যাবার উপক্রম হচ্ছে। বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম-বৃদ্ধি-বার্ধক্য-মৃত্যুর যে-সাদৃশ্য টয়েন্‌বি দেখিয়েছিলেন তার তুলনায় অতীত ও ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠনের পার্থক্যটুকুই এখন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে না কি ? বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সমর্থন এর মধ্যে দেখতে পাওয়া কি অন্যায় হবে ?

টয়েন্‌বির মতে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক ন্যায়বিচার আজ সম্ভবপর, তার অর্থ হবে সমাজে উৎপন্ন সম্পদের ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন। 'সমাজবাদ' কথাটি ব্যবহার না করলেও সেই সংজ্ঞার আসল বস্তুটি এর মধ্যে এসে পড়ছে। সম্ভবপরকে সম্ভব করে তোলার ইচ্ছাটুকুর অবশ্য এখনও অভাব দেখা যায়, অর্থাৎ বিত্তশালী গোষ্ঠী সম্ভাবনাটা এড়িয়ে চলছে। ওদিকে অগণিত জনসংখ্যা—চাষী-মজুর-নরনারী-জেগে উঠছে সামাজিক ন্যায়-বিচারের পতাকার চারিদিকে, জগৎজোড়া বিক্ষোভ বিপ্লবের ধ্বনি হলো এই সামাজিক ন্যায়বিচার। টয়েন্‌বির ভাষায় এই হলো "আমাদের যুগের যুগান্তকারী ঘটনা।" "ভবিষ্যতের ঘটনাস্রোতের রূপ" রয়েছে এর মধ্যে। "সামাজিক ন্যায়-বিচারের দাবি এমনই দাবি যাকে অমান্য করা চলবে না।"

বিত্তশালীর অভ্রভেদী দুর্গ আমেরিকায় বসে টয়েন্‌বি প্রকাশ্য বক্তৃতামালায় জনজাগরণ ও বিপ্লবের যে-চেতনায় আচ্ছন্ন হয়েছেন বস্তুবাদী বিশ্লেষণের দিক থেকে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানানো উচিত, আদর্শসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে দুস্তর অমিল সত্ত্বেও। টয়েন্‌বি বলেছেন যে লাটিন আমেরিকার

অশান্ত সমস্যার মূল কথা হলো আর্থিক-শক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে জগৎব্যাপী দ্বন্দ্বের প্রকাশ। সামাজিক ন্যায়বিচার আজ আর কল্পনাশ্রয়ী সদিচ্ছা নয়, বিজ্ঞান আজ তাকে "যুক্তিসঙ্গত আশা"-তে পরিণত করেছে। লাটিন আমেরিকার বিক্ষোভকে উদ্বেল করে তুলছে এই সামাজিক ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আন্দোলনের প্রেরণা হলো "তথাকথিত সভ্য সমাজগুলির সুপ্রাচীন পেশাদারি ব্যাধির" বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লাটিন আমেরিকার জাতীয় মধ্যশ্রেণীগত বিপ্লবগুলিকে রূপান্তরিত করে ফেলছে নিচের মহল থেকে উৎসারিত সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবির বিস্ফোরণ। মেক্সিকো এবং বলিভিয়া, গুয়াটেমালা এবং কিউবা, বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যের অবশ্য অভাব নেই। আর্থিক অগ্রগতির সন্ধান এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচেষ্টা পরস্পরকে আঘাত করেছে ; মেক্সিকোতে প্রথমটি ব্যাহত করছে দ্বিতীয়কে, বলিভিয়াতে দ্বিতীয়টি আহত করেছে প্রথমকে, গুয়াটেমালায় বিদেশী হস্তক্ষেপ আবার ঘটনার গতিকে রোধ করেছে, কিউবায় হস্তক্ষেপ উদ্যত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের স্রোতে আজকের অব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য বলেই টয়েন্‌বির বিশ্বাস। লাটিন আমেরিকার সামনে মৌলিক প্রশ্ন হলো বৃহৎ জমিদারির উচ্ছেদ, আর্থিক সম্পদের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতির আমূল রূপান্তর, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রসার। একে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব, কারণ লাটিন আমেরিকার বিক্ষোভ স্থানীয় নয়, গোটা "অবনত পৃথিবী"র ঝড়ঝঞ্ঝা রয়েছে তার পিছনে।

অনিবার্য এই জগৎ-বিপ্লবের সামনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি এবং কি হওয়া উচিত ? টয়েন্‌বি এই প্রশ্নটিকে বক্তৃতায় বার বার তুলে ধরেছেন। ১৭৭৫ সালে আমেরিকায় যে-বিপ্লব শুরু হয়েছিল, কবি এমার্সনের ভাষায় "তার প্রতিধ্বনি শুনেছিল সারা পৃথিবী।" বিপ্লবের যুগ টয়েন্‌বির মতে আরম্ভ হয় সেই থেকে। এখানে অবশ্য কিছুটা অতিরঞ্জন লক্ষণীয়, কারণ আমেরিকার বিপ্লব ছিল মূলত জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধমাত্র। যে-ফরাসী বিপ্লব আধুনিক জগতের রূপান্তর সূচনা করে, সেই বিপ্লবকে ঠিক আমেরিকান বিপ্লবের দুহিতা বলা চলে না। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য যে আমেরিকার বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র বহুদিন পর্যন্ত পরবর্তী বিপ্লবগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণার প্রধান পুরোধা জেফারসন বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে সর্বত্র অভিনন্দিত করেছিলেন, পরিবর্তনের প্রচণ্ড হাওয়াকে তিনি মঙ্গলদায়ক ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে করতেন।

কিন্তু আজ যুক্তরাষ্ট্র প্রচলিত বিধিব্যবস্থার রক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজ সে "কায়েমী স্বার্থের উদ্যত প্রহরী।" গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিপ্লবের পথরোধ করবার ভার নিয়েছিলেন মেটারনিশ। টয়েন্‌বি বলছেন—"সেদিন কে জানতো যে আমেরিকা আজ মেটারনিশের সেই শোচনীয় ভূমিকা নিজের হাতে তুলে নেবে?"

বিশ্ববিপ্লবের স্রোত থেকে আমেরিকা আজ মুখ ফিরিয়েছে, তার প্রতিকূলতা করছে। অথচ সেই বিপ্লব আজ দেশ-দেশান্তরে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে মুখরিত। বিপ্লবের নেতৃত্ব আজ চলে যাচ্ছে রাশিয়ার হাতে। টয়েন্‌বি বলছেন "তোমাদের প্রবর্তিত বিপ্লবের নেতৃত্ব তোমরা ভূলুণ্ঠিত হতে না দিলে অপরে সে-নেতৃত্ব তুলে নিত কি করে?" আজকের দিনে আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি প্রকাশ পাচ্ছে কিসের মধ্যে? জনবিরোধী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের আলিঙ্গনে, গুয়াটেমালায় বিদ্রোহ-দমনে, কিউবায় প্রতি-বিপ্লবের সংগঠনের মধ্যে নয় কি? তিনি লিখছেন, আজ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করতে সদাই উদগ্রীব, অথচ যে-হিটলার মানবজাতির শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে প্রতিরোধ করবার সময় তো এই আগ্রহ চোখে পড়ে নি; তখন আমেরিকাকে ফ্যাশিস্টদের বিপক্ষে দাঁড় করাতে প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট্‌কে কতই না সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল।

বিপ্লবের সমর্থন থেকে বিপ্লব-বিরোধিতায় আমেরিকার উত্তরণের ইতিহাস কি? ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবই নিশ্চয় এই মোড় ফেরার তারিখ। সাম্যবাদকে আমেরিকার লোক মনে করেছে তাদের "পকেটে হাত দেবার" ষড়যন্ত্র। ১৯২১ থেকে আবার আমেরিকার নির্দিষ্ট নীতি হলো বিদেশ থেকে সেদেশে জনসমাগমের উপর বাধা-নিষেধ, অর্থাৎ সেখানে বিদেশীদের বসবাসের এতদিনকার খোলা দরজা বন্ধ করে দেওয়া। উভয় ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এই শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র পরিণত হয়েছে ধনিকদের স্বর্গে, বুলি হয়েছে "সমৃদ্ধ সমাজ"। তাই আমেরিকা আজ জগতের সংখ্যাধিক গরিবদের বিপক্ষে, সৌভাগ্যশালী বড়লোকেরা যেমন অপর লোকদের তাচ্ছিল্য করে থাকে। ঐতিহাসিক আমেরিকান বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল এই! কিছু লোকের "অপর্যাপ্ত ভোগ্যদ্রব্যের সম্ভার" নিশ্চয়ই সে-বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল না, ঘোষিত লক্ষ্য ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। টয়েন্‌বি স্বীকার করছেন যে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু হয় পরিণামে অন্য কিছু তাকে

ছাপিয়ে উঠতে পারে, আমেরিকার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। এর বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এখনও তাঁর অজানা, কিন্তু সত্য স্বীকারটুকু নিশ্চয়ই আশার কথা। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো যে আমেরিকা বর্তমান যুগের সম্ভাব্য নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়েছে ধনিকগোষ্ঠির সম্পদ আহরণের লোভে। কিন্তু সম্পদের লোভ অন্যকে দাবিয়ে বঞ্চিত করে রাখার উদ্যমে দিক্‌ভ্রষ্ট হতে বাধ্য, অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে তাতে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবস্থাপন্ন লোকের জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হবার পথে বাধা অশেষ।

আমেরিকা আজ তাই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তার নেতৃত্ব হয়ে উঠছে অসার। সজোরে এ-কথা ঘোষণা করতে পারা টয়েন্‌বির মতো প্রতিষ্ঠাবান লোকের পক্ষে একটা নতুন পর্যায় বই কি। তিনি দেখিয়েছেন গোষ্ঠীগত লোভের তাড়নায় চিরাচরিত আদর্শ থেকে সরে আসা কত সহজ। সাম্রাজ্যবাদ-পরিহার যে-যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি ছিল সেই যুক্তরাষ্ট্রকে আজ স্বার্থরক্ষার অছিলা সাম্রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত করেছে। এখানে অবশ্য সরাসরি পররাজ্য দখলের দৃষ্টান্ত মিলবে না, বিস্তার রূপ নিচ্ছে বিদেশে সামরিক ঘাঁটি গঠনে ও অপর রাজ্যের 'রক্ষক' হিসাবে প্রতিষ্ঠায়। প্রাচীন রোমের সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রাথমিক ধাঁচটা ছিল ঠিক এই।

টয়েন্‌বি অবশ্য এখনও আশা ছাড়েন নি, তাঁর অগাধ আস্থা আছে প্রেসিডেন্ট্‌ কেনেডির উপর। ১৩ই মার্চ ১৯৬১, সালে লাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে যে-নতুন 'প্রগতির পথে মৈত্রী'র নীতি ঘোষিত হয়েছিল তাতে কি নতুন যুগের সূত্রপাত হচ্ছে না? দেশে দেশে জনগণের সঙ্গে সংযোগের জন্য যে 'শান্তি বাহিনী' কল্পিত হয়েছে সেটা কি নতুন মোড় ফেরার লক্ষণ নয়? ডালেস থেকে জেফারসনে প্রত্যাবর্তন কি আজ সম্ভব হয়ে উঠছে না? টয়েন্‌বি আশাবাদী, আশা অমূলক কিনা একমাত্র ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। তবে তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সামনে তিনি আজ বিশ্ববিপ্লব সম্বন্ধে নীতি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রকাশ্যে। ধনিক স্বার্থের প্রাচীর প্রচারকের বাণীতে ভেঙে পড়বে কিনা, ঠিক সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। লক্ষ্যণীয় এই যে তাঁর নিজের মনেও প্রশ্ন জেগেছে—লাটিন আমেরিকায় প্রতিশ্রুত বিপুল সাহায্য কি আদর্শগত সদিচ্ছার পরিচায়ক, না সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনঠাসার উদ্দেশ্য-প্রসূত? এর মধ্যে কি নীতি পরিবর্তনের আভাস আছে, না এ হলো কার্ল মার্কসের "ভূত ঝাড়ার"

পরিকল্পনা ? আমেরিকা কি সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্তরিক সমর্থক, না স্বকীয় প্রভাব বিস্তারের সন্ধানে ব্যস্ত ? তাঁর একথা বলতে দ্বিধা হয় নি যে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে দাঁড়াতে না পারলে "অগ্রগতির পথ থেকে ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে দিতে বাধ্য হবে।"

টয়েন্‌বি বলছেন যে সাম্যবাদের অনেক গলদ আছে, আছে অত্যাচার ও বিকৃতি। উগ্র জাতীয়তাবাদের মোহ রাশিয়া ও চীনকেও গ্রাস করতে পারে, তাদের ঠেলে দিতে পারে হিট্‌লারের পথে। তবুও সাম্যবাদ "নিশ্চয় নীতি হিসাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে।" ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে তাই তার যোগ নাড়ির যোগ, নিগূঢ়। লাটিন আমেরিকায় আজ প্রয়োজন হলো "ধনসম্পদ বণ্টনে বিরাট পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন।" "সামাজিক প্রগতি বাদ দিয়ে আর্থিক বিস্তারের অর্থ হলো প্রবল সংখ্যাধিক জনগণকে দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রাখা।" বাস্তবক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হলে আবশ্যক হবে কায়েমী স্বার্থের অবসান, সমৃদ্ধিবানদের উপর করের বোঝা, ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধন। আমেরিকা যদি এ-সব ব্যবস্থা না আনতে পারে তবে লোকের এ-ধারণা নিরসন অসম্ভব যে "সাম্যবাদের আওতায় তাদের অবস্থা আজকের থেকে খারাপ হবে কেমন করে।"

বক্তৃতামালায় অবশ্য অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তবে মূল বক্তব্য থেকে তারা খুব কিছু স্বতন্ত্র নয়। সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা উদ্বেগ হলো পশ্চিমী জগৎ ও বাকি পৃথিবীর সম্পর্ক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইওরোপীয়দের কাছে সভ্যতা ও পশ্চিমী জগৎ সমার্থক ছিল, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কাও ছিল অজানা। আজ হাওয়া বদলেছে। প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক তাই সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যেও পথ খুঁজেছেন। অতীতের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য নয়, কিন্তু পুনরাবৃত্তি হবে না এটাও অনিবার্য নয়। হেলেনিক সভ্যতার সঙ্গে বাকি জগতের সঙ্ঘাতের ফলে হয়েছিল প্রথম দিকে হেলেনিক সমাজের সামরিক ও রাষ্ট্রিক জয়, চিন্তা ও শিল্পের জয়যাত্রা। শেষ পর্যন্ত এসেছিল বাকি জগতের জয় ধর্মের সূত্রে—পরবর্তী যুগের বিশ্বধর্মগুলি কোনোটাই হেলেনিক নয়। ইতিহাস কি আবার এই পথ নেবে ? আধুনিক কালে পশ্চিমী সমাজ বিশ্বজয় করেছিল বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের জোরে। তার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অভিযান আজ আবার জয়ী হতে চলেছে! সে-অভিযানের প্রকৃতি কি রূপে মূর্তি পাবে তাই বিচার্য।

টয়েন্‌বির নিজের ঝোঁক অবশ্য ধর্মের পুনরুত্থানের দিকে। নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজের আজ প্রয়োজন। সভ্যতা ধ্বংসের মারাত্মক অস্ত্র আজ মানুষের হাতে—অন্তত সেই জন্যই নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। জগৎ-জোড়া বন্ধন আজ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে ধ্বংস এড়াবার জন্য। টয়েনবির মতে সে-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য-রাষ্ট্রের শক্তিবিস্তারের পথে আসতে পারবে না। নতুন রোম বা চীন সাম্রাজ্যকে আজ লোক মানবে না। মুক্তি আসতে পারে ধর্মের প্রেরণার মধ্যে, সেই ধর্মের ভিতর থাকা সম্ভব গান্ধিজির দৃষ্টি, প্রকৃত হিন্দুত্বের উদারতা, বৌদ্ধমতের মানবিকতা। টয়েন্‌বির মনের গড়নই এমন যে ভাববাদী স্বপ্ন তাঁর মনে ফিরে ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক।

তবুও ধর্ম পর্যন্ত আর ঠিক অতীতের ঐতিহাসিক ধর্ম থাকছে না তাঁর দৃষ্টিপথে। নতুন ধর্ম মানবিকতার ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানুষের ধর্ম', প্রতিষ্ঠানগত ঐতিহ্যাবদ্ধ, সংকীর্ণ মতাশ্রয়ী, প্রচলিত ধর্ম নয়। টয়েন্‌বির নিজের বিশ্লেষণেই সামাজিক ন্যায়বিচার আজ অগণিত মানুষের প্রেরণা, সমাজ পুনর্গঠনের সংগ্রাম হলো আজকের দিনের সংকল্প ও সাধনা। পরিবর্তনের এই সংগ্রামে ধর্মবিশ্বাসী যোগ দিতে পারলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়, যখন বিশ্বাসীও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সংগ্রামে শক্তি জোগাবে অগণিত জনগণ, লক্ষ্য হবে পার্থিব সম্পদের বিজ্ঞান-সম্মত প্রসার, যন্ত্রশিল্পের যথাযোগ্য ব্যবহার, মূলসূত্র হবে দারিদ্র্যের উচ্ছেদ, সামাজিক বিচারের জয়, নতুন আর্থিক পদ্ধতিতে সমাজের পুনর্বিন্যাস। সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়াস হলো বর্তমান বিপ্লবের মূল বস্তু, তার মধ্যে নতুন ধর্মের আভাস কেউ পেয়ে থাকলে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। অবিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই পথ খুঁজবে অস্ত্র-বর্জনের মাধ্যমে, শান্তিসূচক সহাবস্থানের সহযোগে, জনগণের শক্তিবৃদ্ধিতে সমাজের আর্থিক পুনর্গঠনে, সমাজবাদের আদর্শ প্রচারে।

বিমূর্ত শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীনতা

শ্রীশঙ্কর আচার্য

'পরিচয়'এ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা' শীর্ষক নিবন্ধের প্রধান বক্তব্য, সোভিয়েতে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতা নেই। এই স্বাধীনতাহীনতা শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে এ-নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে।

বলে রাখা উচিত আমি শিল্পীও নই, সাহিত্যিকও নই, তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁদের প্রেরণা অনুভূতি বোঝবার ও জানবার চেষ্টা করে আসছি বহু বছর ধরে। যে মন দিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করেন, সেই মনের ক্রিয়া-কলাপ নিয়েই আমার ঔৎসুক্য।

ইদানীংকালে বাংলা দেশের কিছু কিছু প্রথিতযশা শিল্পী-সাহিত্যিকের দলও ঐ প্রশ্নই অভিযোগ আকারে সভা-সমিতি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মার্কসীয় বা কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রসার বন্ধ করা। এঁদের মধ্যে অনেকে এযাবৎ সাহিত্যে রাজনীতি আমদানীর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু আজ বোধহয় আপৎকালীন জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির লড়াইয়ে নেমেছেন। এদের সততা প্রশংসনীয়। এঁদের বিবৃতি ও লেখা থেকে এটা স্বীকৃত হতে চলেছে যে নির্দলীয় সাহিত্য বলে কিছু নেই। শিল্পী-সাহিত্যিক মাত্রেরই খুব নির্দিষ্ট না হলেও একটা জীবনাদর্শ থাকে এবং তাঁর সৃষ্টিতে সে আদর্শের ছাপ পড়তে বাধ্য। কখনো তা অস্পষ্ট ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ আবার কখনো বা শিল্পী এ-সম্পর্কে অনবহিত। হয়তো কোনো সময় (যুদ্ধবিগ্রহ, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আলোড়ন ইত্যাদি) শিল্পী সে-বিষয়ে সচেতন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে আদর্শরক্ষায়, বিপরীত পক্ষের সঙ্গে আপসহীন সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ। বিশেষ করে, আজকের দিনে এমন কোনো জীবনাদর্শের কথা আমরা ভাবতে পারি কি যা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের আওতায় পড়ে না। শিল্পী হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলের ধ্বজাধারী না হতে পারেন, সভ্য না হতে

পারেন, তবুও তাঁর শিল্পকৃতিতে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন কোনো একটি মতবাদের প্রাধান্য দেখা যাবে-ই। আর সে মতবাদ সূক্ষ্ম এবং শেষ বিশ্লেষণে তদানীন্তন সমাজের কোনো দলীয় মতবাদ বলে প্রতিপন্ন হবেই নিঃসন্দেহ। শিল্পী-সাহিত্যিক কল্পনাপ্রবণতা সত্ত্বেও স্থানকাল নিরপেক্ষ নন। তাঁর মানসিকতার গঠনে, তাঁর সৃষ্টিতে বহির্বাস্তবের প্রভাবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সাহিত্যিক-শিল্পীদের দলবদ্ধ হওয়া বা নিজেদের ভাবাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিরুদ্ধ ভাবাদর্শের সঙ্গে লড়াইয়ের সংকল্প, নতুন ও উচ্চতর মানের শিল্পসৃষ্টির সহায়ক বলে আমার ধারণা। এই আদর্শের লড়াইয়ে অবশ্য, যদি সততা এবং লড়াইয়ের আইন-কানুন বজায় থাকে, তবে তাতে সাহিত্য-শিল্পের তথা সমাজের উপকারেরই সম্ভাবনা।

সম্প্রতি সোভিয়েত-রাশিয়ায় ঐ আদর্শগত সংগ্রামের কিছু খবর আমরা পেয়েছি। বিমূর্ত শিল্পের একটি প্রদর্শনীতে ক্রুশ্চভের মন্তব্য থেকে এই সংগ্রামের সূত্রপাত। সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্র এই বাদানুবাদ বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। কারণ হিসেবে ক্রুশ্চভের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি: We adhere to class positions in art and resolutely oppose peaceful co-existence between the socialist and bourgeois ideologies. Art belongs to the sphere of ideology". সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সোভিয়েত রাষ্ট্র বা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি মেনে নিতে পারেন না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ: "are apparently mixing up two different questions; creative co-operation between people working in literature and the arts who adhere to Marxist-Leninist principles, and attitude to various alien ideological trends in art." [ইলিয়াচভ এলফ] এই পার্টি, সম্পাদক ইলিয়াচভের মতে: "Art always has an ideological-political trend, and that in one way or another it expresses and upholds, the interest of definite classes and social strata."

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুপ্রাণিত ও প্রসারিত করুক; সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের এ-দাবি আজকের নয়। শিল্প-সাহিত্য জনশিক্ষা ও লোকমানস চরিত্র-গঠনে অন্যতম

প্রধান মাধ্যম। Speaking figuratively, you men of letters and art are the smiths who reforge human psychology (ক্রুশ্চভ)। সুতরাং পার্টি বা রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁদের পথনির্দেশের সহায়তা করা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ মনে করেন সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পথে অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন আসবে, অনেক প্রশ্নের সমাধান করতে হবে, অনেক দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হবে। "The growing role of the Communist Party as the directing and guiding force of society is a characterestic feature of the development of socialist democracy in the period of transition to communism. This is necessary in the interestes of society as a whole, in the interests of building communism." সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের স্তর সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিশ-সালা-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ, তাদের কাছে বিরাট এক যুদ্ধজয়ের সামিল, আপৎকালীন জরুরী অবস্থারই মতো। কাজেই খুবই স্বাভাবিকভাবে আদর্শগত সংঘাত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত তীব্র হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত গণতন্ত্রের গঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পার্টি ও রাষ্ট্র এই সংঘর্ষে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, কথাটা আংশিক সত্য। অবাধ স্বাধীনতালাভ যে-কোনো সমাজব্যবস্থায় সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। তাই ক্রুশ্চভ বলেছেন : Under communism too the will of one person will have to submit to the will of the whole collective." আসলে স্বাধীনতা বস্তুটি কি? "By the aquisition of knowledge we gain freedom which consists in control over ourselves and over external nature founded on knowledge of necessity. We are free when on the basis of knowledge we decide what to do and exert conscious control over the factors influencing the fulfilment of our aim." (Maurice Cornforth) আগুনের দাহিকা শক্তির জ্ঞান না থাকার জন্য শিশুর আগুনে হাত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে। পুরনো দিনের গ্রামীন জীবনের কোনো কোনো দিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আজকের নাগরিক জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, বিশেষ করে প্রভু

শ্রেণীর। শিশুর স্বাধীনতা অজ্ঞতা-প্রসূত, গ্রামীন জীবনের ঐ স্বাধীনতা আর সামাজিক সম্পর্করহিত আদিম মানুষের স্বাধীনতা অনেকটা একই ধরনের। আমরা কেউই নিশ্চয়ই ফিরে পেতে চাই না এ-স্বাধীনতা। প্রয়োজনের উপলব্ধি আর বস্তু ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান যত বাড়ে এই ধরনের অবাধ স্বাধীনতাও তত কমে। স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতি ও সমাজের গতিপ্রকৃতির নিয়মকানুন জেনে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা। বনের পশুকে বাঁধলে সে ছটফট করে চীৎকার করে, প্রতিবাদ জানায়। এই বন্ধনে তার আপত্তি কেন? স্বাধীনতা সে চায় কেন? বনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করার ফলেই শুধু সে বন্য প্রকৃতির নিয়মকানুন জানতে পারে—যার দ্বারা তার আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি সম্ভব। বন্ধন তার আত্মরক্ষামূলক জ্ঞানার্জনের পথে বাধা। তাই আপত্তি। মানুষের বেলায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মূলত একই ধরনের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক হলেও গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে সমন্বিত। সমাজের কাজে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা খানিকটা স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে এবং এর ফলে সে লাভবানই হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা যথেচ্ছচারিতার বিপরীত। স্বাধীনতা মানে স্বাধীনভাবে যা-খুশী করা নয় আত্মসংযমের দ্বারা অনেক কিছু না করা।

শিল্পী ও সাহিত্যিকমাত্রই অনুভূতি প্রবণতার আধিক্যের জন্য অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য সকলের স্বাধীনতা খানিকটা খর্ব হয় হোক, অথচ শিল্পীর স্বাধীনতা থাকবে যা-খুশি আঁকবার বা যা-খুশী লেখবার; এ-ধারণা একান্তই অবিবেচনা-প্রসূত। এই ধরনের যথেচ্ছচারিতা শিল্পী বা সাহিত্যিককে সৃষ্টির ব্যাপারে মোটেই সাহায্য করে না। কেননা, শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজের জন্য সৃষ্টি করেন না, করেন সমাজের অন্যান্যদের জন্য। সর্বদেশের সর্বকালের যুগান্তকারী স্রষ্টরা ব্যক্তিবিশেষ বা সাধারণ পাঠকদের মনোরঞ্জন বা কালের চাহিদানুযায়ীই সৃষ্টি করেছেন। শিল্পীর তথাকথিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্থহীন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা বলছি। আমার কাছে, এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে দু-এক লাইন কবিতা বা এক-আধখানা ছবি এঁকে পাঠিয়ে থাকেন। তিনি এক সময়ে 'লেখক' বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তার বর্তমান কবিতা ও ছবি স্বাধীন ভাবে শুধু নিজের জন্যই লিখছেন। অন্যের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি স্কিজোফেনিয়ায় (এক ধরণের জটিল মানসিক রোগ) ভুগছেন, সমাজ

থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছেন ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করছেন। কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকই বোধহয় এ-ধরনের নিরবলম্ব স্বাধীনতা কামনা করবেন না। কথা উঠবে 'মুক্ত ত্নিয়ার' রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেই শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা অস্বীকৃত। তু-ধরনের রাষ্ট্রে এমন আরও অনেক তফাৎ-ই আছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যের শ্রম থেকে মুনাফা করার স্বাধীনতা সকলের আছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেই। ব্যক্তিকে তার ক্ষমতা এবং গুণ অনুযায়ী কর্মসংস্থান করে দেওয়ার দায়িত্ব বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্বীকার করে না অথচ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এটা অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বুর্জোয়া গণতন্ত্র বহু-পার্টিভিত্তিক, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে একটি মাত্র পার্টি; কেননা মার্কসবাদীদের মতে শ্রেণীহীন রাষ্ট্রে বহু পার্টি অপ্রয়োজনীয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে; এটা না জেনে সোভিয়েত রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। গণতন্ত্রের নবতর এবং উচ্চতর ধারার বিকাশ ঘটছে সোভিয়েতে। শুধু substance নয় form-এর দিক থেকেও সোভিয়েত গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অনেক তফাৎ। "Soviet system provides the maximum of democracy for the workers and the peasants at the same time it marks a break with bourgeoise democracy and rise of a new type of democracy of world historic importance." (Lenin) অন্যত্র তিনি বলেছেন: "The dictatorship of the proletariat inevitably brings with it not only changes in the forms and institutions of democracy, generally speaking, but precisely those changes that lead to an unprecedented extension of the actual utilisation of democracy by those oppressed by capitalism, the toiling classes.

বস্তুত শিল্প এবং সাহিত্যের ধারা নির্ণয় সোভিয়েত দেশে জনসাধারণেরই হাতে। পার্টি প্রোগ্রামে গৃহীত হওয়ার পূর্বে: "The line of development of literature and art has been defined by the Party programme, which was discussed by the entire nation and recieved the universal support and approval of workers,

cellective farmers and intellectuals." আর একটা কথা, তু-একজন ছাড়া অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিকেরই তাদের শিল্পকর্মের উপর রুজিরোজগার নির্ভর করে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তাদের সৃষ্টিকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে হলে খবরের কাগজের মালিক বা প্রকাশকের দ্বারে হাজির হতে হয়। এ খবরের কাগজের মালিক বা প্রকাশকেরা কেউ নির্দলীয় নন কিংবা absolute humanism-এও অনুপ্রাণিত নন। এবং তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী কোনো শিল্পকৃতিকে তাঁরা যে উৎসাহ দেবেন না এটাই স্বাভাবিক।

সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রেণী-বিলুপ্তি ঘটলেও, শ্রেণীগত আদর্শের এখনো পুরোপুরি বিলোপ ঘটেনি। কারণ প্রায় দশ হাজার বছরের শ্রেণী সমাজের বহু ব্যক্তিগত বিশেষত্ব মাত্র পঞ্চাশ বছরে নির্মূল হতে পারে না। সমাজের সর্বস্তরের প্রায় কিছু কিছু লোকের মধ্যেই অতীতের ভাবধারার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। কাজেই ভাবাদর্শের মূলে পরস্পর-বিরোধিতা থাকাই স্বাভাবিক। শ্রেণীসমাজের মতো এই বিরোধিতা পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়। এছাড়া রয়েছে কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, গ্রাম ও শহরের আর্থিক বৈষম্য, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এই সব বিশেষ করে কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের পৃথক অস্তিত্ব (বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে ধন্যবাদ। এ পার্থক্য নিরসনের মুখে) ও পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর অপরিহার্যতা সোভিয়েত দেশে যে 'non-antagonistic contradiction'-এর সৃষ্টি করেছে তার প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যে। এবং এই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরস্পর-বিরোধিতা সোভিয়েত সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রাণশক্তি। তবে একথাও বলা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক দেশে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব একেবারে নেই ভাবলে নিশ্চয়ই আমরা ভুল করব। পুরনো সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, ব্যুরোক্রেসীর প্রতাপ রাতারাতি বিলুপ্ত হবার নয়। তাছাড়া সমাজ-তন্ত্রের মধ্যেও পরিকল্পনা পরিপূরণের জন্য অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে সাহিত্য শিল্পে শুধু নয় সর্ব ব্যাপারেই অতি বেশি কড়াকড়ি মাঝে মাঝে দেখা দিতে বাধ্য। শিল্পী-সাহিত্যিক ছাড়াও সাধারণ ব্যক্তিমানসের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমাজতন্ত্রে স্বাধীনতার অভাব নিয়ে অভিযোগ আজ নতুন নয়। "One

can always built pyramid with the help of slaves" লিও ব্লুমের একথা হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। আলডুস হাক্সলি লিখেছেন 'Brave New World' (George orwell—1984)। সমাজদেহের (সোভিয়েত) কঠোর নিষ্পেষণে মানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ক্রমশ automaton হয়ে যাচ্ছে। অনেক স্বর্গ নষ্ট হয়েছে, অনেক ঈশ্বরের পতন হয়েছে, মানুষের মুক্তি যতদূরে ছিল ততদূরেই রয়ে গেছে। এইসব উক্তি যারা করেন তারা সবাই যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলি না। এঁদের অনেকের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার কি ভাবে স্বীকৃত তা জানা নেই ; আর ব্যক্তি ও সমাজের সঠিক সম্পর্ক নির্ণয়েও এরা অপারগ। existentialism, psychoanalysis, এদের অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্ববিলাসী করে তুলেছে! যারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবের কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে : "The very nature of the dictatorship of working class makes it a profoundly democratic power, because its means rule of the majority over the minority, while the dictatorship of big bourgeois is the rule of the minority over the majority. [Fundamentals of Marxism-Leninism] মনে রাখা দরকার dictatorship of proletatriat ও প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রাসিকে লেনিন সমার্থক-জ্ঞাপক বলে মনে করতেন।

অবশ্য একথা বলব না যে সোভিয়েত রাষ্ট্র বা সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সামাজিক উন্নয়নে ও সমস্যা সমাধানে যা কিছু করেছেন সবই নির্ভুল এবং সঠিক। বলা বাহুল্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সবরকম সমস্যার সমাধানে এরা মার্কসবাদের প্রয়োগ করেন। মার্কসবাদীরা causality ও determinism-এ বিশ্বাসী হয়েও accident-এর প্রভাব অস্বীকার করেন না। Accident-এর আইনকানুন অনাবিষ্কৃত। তারা একথা মনে করেন না যে ঘটনার বিশ্লেষণে (দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে) কোনো সময়েই ভুল ভ্রান্তি ঘটবে না। Absolute সত্য ও objectively correct পন্থা এ দুই কাল্পনিক। কারণ subjective errorকে কাটিয়ে ওঠা খুব সহজসাধ্য নয়। তবে subjective factor দূরীকরণের জন্যে সব ব্যাপারেই প্রচুর আলোচনা এবং বাদানুবাদ মার্কসবাদীদের ধর্ম। এতৎসত্ত্বেও সময় বিশেষে subjective ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে এবং ঘটেছেও। মাঝে মাঝে সভা-সমাবেশ আলাপ-

আলোচনাও বন্ধ থেকেছে জানি। এ সমস্ত স্বীকার করে নিয়েও আমি হলফ করে বলতে পারি সোভিয়েত জনমানস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প। জনগণের চৈতন্যের মান উন্নয়নের জন্য সোভিয়েত সরকার ১৯৩৩ সাল থেকে বিজ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হয়েছেন। সেদিনও ঐ দেশে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। সামন্তদের নিষ্পেষণে অশিক্ষিত কৃষককুল ঈশ্বরকে সর্বদুঃখের মুক্তিদাতা হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। এমনকি অত্যাচারী কুলাক সম্প্রদায়ের কাছে এই মূঢ় জনগণ একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ভিক্ষা করে এসেছে। অক্ষমতা ও দুর্বলতা পরনির্ভরতার জন্মদাতা। চাষীদের মধ্যে একাংশ প্রতিবিপ্লবে যোগ দিলেও বেশিরভাগই পার্টি-নেতাকে কল্পনায় সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর জানিয়েছিল ও সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য তার ওপর নির্ভর করেছিল। ইকন্ পূজা অতি সহজেই ব্যক্তিপূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল। যে-হারে ওদের দেশে আর্থিক উন্নয়ন ঘটছিল সে-হারে আত্মিক উন্নয়ন ঘটা সম্ভব হয়নি এবং সেটা ঘটেও না। জনচৈতন্যের সম্যক বিকাশ সমাজতন্ত্রের মতো উচ্চতর সমাজব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। তাছাড়া ঐ অনুন্নত দেশের উপবাসী জনতা সামন্ততান্ত্রিক শেকল ভেঙ্গে স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে প্রথম থেকেই জীবনধারণের মানোন্নয়নের ব্যাপারে অনেক কিছু আশা করেছিল। শ্রম নয়, ভক্তির বিনিময়ে তারা হয়তো অভীষ্ঠ ফল লাভ করতে চেয়েছিল। নেতার প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতার আতিশয্য নেতার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এই subjective ও mental factor-এর জন্য যে ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্রম অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলে তারা কি হিটলার বাহিনীকে পরাজিত করতে পারত? এবং তারপরে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে কয়েক বৎসরের যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে পারত! এই বিজ্ঞানের যুগে সাংগঠনিক ব্যাপার শুধু পেশীশক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি তারা খুব পেছিয়ে আছে। পশ্চাদগামী দেশের পক্ষে কি প্রথম স্পুৎনিক ক্ষেপণ সম্ভব? ভুল অনেক হয়েছে সর্ববাদীস্বীকৃত কিন্তু বেশির ভাগ সমস্যারই যে নির্ভুল সমাধানও তাঁরা করেছেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক, ক্রুশ্চভ ও পার্টি-সেক্রেটারী কয়েকজনের

শিল্প ও সাহিত্যকৃতিকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন, কেননা তাদের মনে হয়েছে এই সব সৃষ্টিকর্ম ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। এ-ব্যাপারে শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়'-এর পাতায় তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্যের সমালোচনা বারান্তরে করব। বর্তমানে তিনি যে বিমূর্ত শিল্পের সাফাই গেয়েছেন সে বিমূর্ত শিল্পের ঐতিহাসিক উদ্ভব সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকাল সংস্কৃতিসঙ্কটের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ শতকের গোড়া থেকে সাম্রাজ্যবাদের আপাতসুস্থ দেহে অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমী জাতিগুলোর উপনিবেশগুলিতে মুক্তিআন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার একদিকে প্রযুক্তিবিদ্যাকে উন্নততর করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনছে, অন্যদিকে এইসব আবিষ্ক্রিয়ার তাত্ত্বিক ও ভাবগত সংঘাত উনিশ শতকের সমস্ত যান্ত্রিক বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল—এমনি সময়ে এলো ইওরোপের ভ্রাতৃঘাতী প্রথম যুদ্ধ এবং তারপর ঘটল অনেকগুলো দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই প্রথম পশ্চিমী মানুষের নিজেদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটল। প্রথম মহাযুদ্ধের নৃশংসতা স্পর্শাতুর শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিচলিত করল, দার্শনিকদের ভাবিয়ে তুলল। যীশুর ক্রুশ বহন করবার যোগ্য ব্যক্তি কোথায়? এতদিনের বুর্জোয়া উদারতন্ত্রী মানবতাবাদের জয়গান সিগফ্রিডো ম্যাজিনো লাইনের মুমূর্ষুর আর্তনাদে তলিয়ে গেল। Man is inadequate to cope with demands of his history—বিমূঢ় মানুষ ভাবল। কিন্তু অন্যদিকে টমাস মোরের ইউটোপিয়া তখন বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে সোভিয়েত দেশে। মার্কসীয় দর্শন সমাজতন্ত্রী দেশের শিল্পী-সাহিত্যিককে নতুন প্রেরণা যোগাচ্ছে। সেখানে আশা বিশ্বাস আর উদ্যম, আর অন্যদিকে (পশ্চিমী দুনিয়ায়) হতাশা, অবিশ্বাস, ক্লান্তি আর অভিশাপ। শিল্পে-সাহিত্যে তারই অনুরণন। মার্কসীয় তত্ত্ব খণ্ডনপ্রয়াসী দেউলিয়া ভাববাদ নিত্য নতুন রূপ গ্রহণ করছে। Positivism, existentialism, indeterminism ইত্যাদি বাস্তববিমুখ ধারা পশ্চিম ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। Psychoanalysis-এর আমদানী হয়েছে; মানুষের ধ্বংসাত্মক ও যৌনমূলক প্রবৃত্তিকে জাগাবার জন্য। শিল্পী-সাহিত্যিকরা ভঙ্গি-সর্বস্ব কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন কেননা কোনো কিছু Positive বা বাস্তবানুগ বক্তব্য উপস্থাপিত

করতে গেলে সমাজের শোষণ ও বিষম প্রতিযোগিতার কথা স্বতই এসে যায়।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, উদার মানবতার অপমৃত্যু ও বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরনো মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের অবলোপ, নতুন মূল্যবোধের অভাব—এই সব মিলে চিন্তাবিদদের বিভ্রান্তি চরমে উঠল। শিল্পী-সাহিত্যিকও এই বিভ্রান্তি থেকে নিস্তার পেলেন না। Surrealism, cubism, abstractionism ইত্যাদি পরীক্ষামূলক আঙ্গিকের মাধ্যমে তাঁদের মানসিক বিভ্রান্তি প্রকাশিত হতে লাগল। অণু-পরমাণুর গঠন জানা নেই, দেখা যায় না, আঁকা যায় না। শুধু অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রতে ধরা পড়ে তাদের গতিপ্রকৃতি কিংবা পর্দার ওপর হঠাৎ আলোর ঝলকানি থেকে পাওয়া যায় তাদের অস্তিত্বের আভাস। Quantum তত্ত্ব দিয়ে বড় জোর ব্যাখ্যা করা যায়। ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মাইক্রোকসমের অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়, বিমূর্ত গণিত শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয় বিশ্বের মৌল উপাদানকে বুঝতে গেলে। আবার দেখা গেল মহাশূন্যের নতুন জ্যামিতি ইউক্লিডিয় জ্যামিতিক নিয়মে চলে না। এসব থেকে সাধারণের মনে (যারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ছাত্র নন) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। অসংখ্য পরমাণু-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড শুধু logic বা শব্দার্থবিদ্যার কারিগরী—মাত্র একটি প্রতীক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অনভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের অবাক হওয়ারই কথা। নিউটন ও প্লাভুকে একসঙ্গে কি করে মানব। তরঙ্গ ও কণিকা একই সঙ্গে ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব? আজকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গতকালের তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছে, আগামী দিনের কাছে নস্যাৎ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই অবস্থা শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে তাদের স্পর্শাতুরতার জন্য সত্যি ভয়াবহ। তাঁদের পক্ষে ভাববাদ দর্শনের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতার দ্বারা সংক্রামিত হওয়াই স্বাভাবিক। শিল্পে, কাব্যে, তুলি ও লেখনীর অস্থির দুর্বোধ্য, অনিশ্চিত সঞ্চালনে তারই প্রতিকৃতি। বিমূর্ত শিল্প ফ্রয়েডীয়-মনস্তত্ত্ব, কামু-সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ এ সবই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রতিফলন।

আশা করি এটা আমরা বোঝাতে পেরেছি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভাবাদর্শগত সংঘর্ষ যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি পার্টি ও রাষ্ট্রের ভূমিকাও থাকবে। বুর্জোয়া

গণতন্ত্রের শিল্প-সাহিত্যের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। অলমতি বিস্তারেন। আমরা এখন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের আলোচনায় আসতে পারি। তিনি মনে করেছিলেন যে বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের পর বহুল প্রচারিত বরফ গলার আবহাওয়ায় রাশিয়ার সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত শিল্পীর স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। "রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবণতার যে সহাবস্থান প্রচলিত ছিল তার সম্ভাবনা হয়তো পুনরুজ্জীবিত হবে। অন্তত রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেনিনের সহনশীলতা ফিরে আসবে বলে আশা করেছিলাম।" এর উত্তর ইলিয়াচফ ও ক্রুশ্চভই দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন না যে লেনিন ভাবাদর্শগত সহাবস্থানের সপক্ষে ছিলেন। ইলিয়াচফ লেনিনের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। "Yes, dear Clara we cannot help it, we are both old. It is enough for us that we remain young and in the first rank at least in the revolution. We cannot keep pace with the new art and shall live behind. এ কথাগুলো ইলিয়াচফের মতে লেনিনের স্বভাবসুলভ sarcasm-এর নিদর্শন। আর এক জায়গায় ইলিয়াচফ লেনিনের গোর্কিকে লেখা এক খোলা চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সময় গোর্কির মধ্যে আদর্শগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল, উদ্ধৃতিটি এই রকম: "Your good intention remain your private affair, a subjective innocent desire. Once you have expressed it, it reaches the masses and its significance is determined not by your good wish but by the co-relation ef social forces, the objective co-relation of classes." শিল্পী বা সাহিত্যিক তার সৃষ্টি দিয়েই বিচার্য, ব্যক্তিগত সততার প্রশ্ন অবান্তর।

ক্রুশ্চভ তার বক্তৃতায় এরেনবুর্গকে লক্ষ্য করে এক জায়গায় বলেছেন, "You know very well that it was actually Lenin who set forth the principle of introducing party ideology and partisanship in literature and art. This view was latter ardently supported by Gorky and other writers who look firmly to the stand of the Soviet power to the stand of the struggle for the cause of

the working class, the stand of the struggle for the victory of communism.

রথী মহারথীদের উদ্ধৃতি না নিয়েও একথা খুবই স্পষ্ট যে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সহাবস্থান কোনোমতেই সম্ভব নয়, কেননা বুর্জোয়া সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু হলেও তাকেও টিঁকিয়ে রাখার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ভাবে। মার্কসবাদ-বিরোধী ভাবধারা প্রচারের জন্য বহু Foundation trust দেশে দেশে কেন্দ্র খুলেছে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় মার্কসবাদকে হেয় করবার জন্য অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানির ইস্ট ইওরোপীয়ান ইনষ্টিটিউট এ-রকম একটি প্রতিষ্ঠান। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাম্য, স্বাধীনতার অভাব-বিষয়ক গবেষণা চলেছে। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টি বুর্জোয়া সভ্যতার ধ্বজাধারী শিল্প-সাহিত্যের প্রচার সংখ্যার তুলনায়, অতি নগণ্য। আমাদের মতন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রে যদি এই অবস্থা হয় তবে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমেয়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এ-দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সহজ নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রেও যেখানে পঞ্চাশ বছর হলো মার্কসবাদী-পার্টির শাসন চলেছে, সেখানেও কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। অর্থনৈতিক কারণে বা হিউম্যানিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী, কিন্তু মার্কসীয় জীবনদর্শন (যেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে সব কিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়) আয়ত্ত করতে যে সর্ব-সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয় তা সহজসাধ্য নয়। বিজ্ঞানের আলোকে অনুদ্ভাসিত অঞ্চলে এখনও বাসা বেঁধে আছে পুরনো দিনের মায়াবাদ, সংশয়বাদ ও রহস্যবাদ। আগেই বলেছি, হাজার হাজার বছরের শ্রেণী সভ্যতার সংস্কৃতি ও তার পরিপোষক দর্শনের ধারা—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যক্তিমানসেও দৃঢ়বদ্ধ। এর ওপরে আছে কোটি কোটি ডলারিপুষ্ট মনপোলি প্রেসের প্রচারযন্ত্র। তাছাড়া, আদর্শগত সহাবস্থানের মাধ্যমে যে কোনো স্ফুটোন্মুখ ভাবধারার পক্ষে মারাত্মক। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে আমাদের দেশে বসন্তের টীকা নেওয়ার পরিবর্তে মা শীতলার কৃপাভিক্ষা করে বসন্ত প্রতিরোধ করতে চায় অনেক লোক। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এখানে নিশ্চয়ই কাম্য। সতীদাহ বা গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের

সমর্থনে যদি কোনো সাহিত্যিক সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হন তবে তিনি নিশ্চয়ই ধিকৃত হবেন।

কাজেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পী-সাহিত্যিকের Formalistic বিকৃতি যে ধিকৃত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে, কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে বিশেষ ভাবাদর্শ প্রভাবিত সৃষ্টিকর্ম সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাম্য। কেননা, "Leading Marxist thinkers always have emphasised the partisan character of dialectical materialism and equally partisan or class character of its opponents."

(Page 240, Soviet Psychiatry).

যখন কোনো মার্কসবাদী শ্রেণী আনুগত্যের কথা বলেন তিনি 'objective truth'-এর প্রতি আনুগত্যের কথাই মনে করেন। "Marxism does not recognise the existence of ideas outside of social context." (Ibid—240) এই সূত্রে লেনিন বলেছেন : "Impartiality among the bourgeoise is generally only a hypocritical, hidden and passive expression of the allegiance to the party of the contented, to the party of the masters, to the party of the exploiters." আদর্শগত সহাবস্থান লেনিন মেনে নেননি। আবার এটাও ঠিক বামপন্থী গোঁড়ামিকেও তিনি বিপ্লবের অজুহাতে কোনোদিন প্রশ্রয় দেন নি। It is nationalism and not Marxism to want to trace changes in these (sex) relations directly, and disociate from their connection with ideology as a whole, to the economic foundation of society." ক্লারা জেট্‌কিনের কাছে লেনিনের এ-উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শিল্প-সাহিত্যের স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে স্বভাবত বিজ্ঞানের প্রশ্নও এসে পড়ে, কেননা সোভিয়েত সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের অবদান অপরিমিত। এ-সম্পর্কে একজন আমেরিকান লেখকের মন্তব্য তুলে দিচ্ছি—"The dissident opinion is tolerated in Soviet Union, just as it is here, but is subject to strong social sanction as it is here." (J. Oates in U. S. A.) বিরোধীপক্ষকে বিশেষ রাজনৈতিক কারণ না থাকলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয় না বা অন্য কোনোভাবে তাদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া হয় না। অবশ্য সোভিয়েত রাষ্ট্রে সমালোচনার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা

আমাদের উদারনৈতিক মনকে বিচলিত করতে পারে কিন্তু ওদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক কি বৈজ্ঞানিক এই সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে মনে করেন না বা অযথা বিব্রত বোধ করেন না। "Mutual criticism is now regarded in the Soviet Union as a normal necessary and important feature of their mode of life. It is probably no exageration to say, they regard it as the most important single means for assuming their own progress from this point on" ; এই উক্তি ঐ ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৫২ সালে।

ঝানভের আমলে ব্যক্তিপূজার আওতায় একদেশদর্শীতা ও আতিশয্য ঘটেছিল একথা স্বীকৃত। এবং তার ফলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "ফরাসী কমিউনিস্টরা সার্ত্র প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের সৃষ্টিকর্মকে কবরস্থ করলেন ও আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমালোচনায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নস্যাৎ হলেন।"

লেখক বলতে চেয়েছেন ঐ সময় আন্তর্জাতিক অবস্থা নাকি স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ছিল, কাজেই ঝানভের এই ধরনের ভুল নাকি অমার্জনীয় অপরাধ। লেখককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই সময়ে মার্শাল প্ল্যান মারফৎ যুদ্ধে অক্ষত আমেরিকা যে গোটা ইওরোপের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়েছিল, ডালেস-ট্রুম্যান যে-নীতি অনুসরণ করেছিলেন, পূর্ব ইওরোপে যে ব্যাপক গোয়েন্দাগিরি শুরু হয়েছিল, তাতে এই সময়টাকে ঠিক স্বচ্ছন্দ বা স্বাভাবিক বলা চলে না। তখন শুধু আমেরিকার হাতে আণবিক বোমা, সোভিয়েত রাষ্ট্র যুদ্ধের বিরাট ক্ষয়ক্ষতির ভারে পীড়িত। এই সময়ে তাঁদের নীতিতে আতিশয্য বা অস্বাভাবিকতা খুব একটা অমার্জনীয় অপরাধ নয়। রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরবর্তীকালে সোভিয়েত দেশে গবেষণা হয়েছে এবং এদের সৃষ্টিকর্মের বিচারে সোভিয়েত পণ্ডিতরা সহনশীলতার পরিচয়ই দিয়েছেন। তবে দুঃখের সঙ্গে একথা বলব যে এঁদের সম্পর্কে আমাদের দেশে সঠিক মার্কসীয় পদ্ধতিতে আলোচনা বোধহয় এখনও হয় নি। প্রতিটি লেখকের অগণিত গুণরাজী ও সদর্থক ভাবধারার পাশাপাশি নঞর্থক ধ্যানধারণাও থাকতে পারে ; তার বিচার ও সম্যক সমালোচনার দিন এসেছে। প্রতিটি সাহিত্যকৃতির মধ্যেই অসঙ্গতি বা স্ববিরোধিতা থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পাঠকের কাছে সেটা তুলে

ধরা তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক নয় বরং তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতি ও বিরোধিতার প্রতিফলন উদ্ঘাটন। লেনিন তলস্তয়কে শ্রদ্ধা করতেন তা সত্ত্বেও "Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian Revolution" প্রবন্ধে তলস্তয়ের সমালোচনা করতে পরাঙ্মুখ হন নি। সাঁত্র্ সম্বন্ধে অবশ্যি আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। শুধু ঝানভের আমলে নয় সম্প্রতিকালেও তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক মার্কসবাদ-বিরোধী বলে সমালোচিত হয়েছেন। "Jean-Paul Sartre while conceding that the theory of Marx has scientific value, reduces it merely to one of the methods of investigating and percieving history. The Marxists even when they speak of the dialectics of nature, he claims limiting dialectics to the sphere of consciousness....It would be dangerous to follow this advice. The co-existence of states with differing social system and the strengthening of contacts of all kinds in particular economic and cultural contacts is the vital issue of the day, the main aim for which the communists and all other peace partisans are working. But this should not be confused with the co-existence interpenetration and fusion of ideologies.

(Leo Figures—W. M. R—Jan 63. p 13-14)

মার্কসবাদ সম্পর্কে সাত্রে´র ধারণা তার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে। "After having drawn us to it as the moon draws the tides, after having transformed all our ideas, after having liquidated all the categories of bourgeois thought, Marxism suddenly left us in the lurch."

(Satre—Existentialism and Marxism)

মনে রাখতে হবে ঝানভের আমলে পার্টিনেতা, সরকার ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনোরকম 'heart to heart', সৃজনশীল আলোচনা হয় নি—এবার যেটা হয়েছে। এবার নির্দেশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের

অভিযোগ কেউ আনেন নি। ইভতুশেঙ্কো ত্রুটি স্বীকার করলেও নতি স্বীকার করেন নি সম্পূর্ণভাবে। মুখোমুখি বাদানুবাদ করেছেন অনেক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক ক্রুশচভের সঙ্গে। তাদের এখনো গর্দান যায় নি। খুব স্বল্পসংখ্যক তরুণের পশ্চিমী আদর্শে "angry young man" হবার প্রচেষ্টা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে—এইটেই আলোচিত হয়েছে সভাতে। বেশির ভাগকেই আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করা গেছে।

"ডক্টর জিভাগো পড়ে, বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক কোনো দিক থেকেই আমার কোনো মহৎ উপন্যাস বলে মনে হয় নি" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত যদি এই হয় তবে সোভিয়েত সমালোচনায় তার আপত্তিটা কিসের? সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ বইটির জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হলো পস্তেরনাককে, এই ছিল সোভিয়েত সমালোচকদের অভিযোগ। ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের সদর্থক দিকটা একেবারে চেপে গিয়ে শুধু নঙর্থক দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যিকের পক্ষে সততার অভাব বলেই মনে করব। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ডক্টর জিভাগো যদি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পকৃতি বলে স্বীকৃত হয় তবুও বিষয়বস্তুর বিকৃতির জন্য লেখক মার্কসবাদী সমালোচকের চোখে নিঃসন্দেহে নিন্দিত হবেন। এমন কি 'স্তালিন যুগের শেষাঙ্কের নিপীড়ন কালিমালিপ্ত ইতিহাস' বিধৃত করতে দেখে কোনো সাহিত্যিক যদি ঐ যুগের কিছু চরিত্রের মধ্যে সদর্থক আশাবাদ ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, ঐ অন্ধকারের মধ্যে আলোকবিন্দু আবিষ্কার করতে না পারেন তাহলে বুঝব তিনি বাস্তববিচ্যুত হয়েছেন। কেননা, স্তালিন যুগে যথেষ্ট Positive aspectsও ছিল; তা না হলে সেই যুগকে অতিক্রম করে সোভিয়েত রাশিয়া নতুন উদ্যমে সাম্যবাদে উত্তরণের পথে অগ্রসর হতে পারত না। শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা সৌন্দর্যসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য কিনা—এখন এই বিচারে আসা যাক।

নীতিশাস্ত্র ও নন্দনশাস্ত্রের সাপে-নেউলে সম্পর্ক সুধীমহলে বহুল পরিচিত হলেও অধুনা এ-ধারণা অবৈজ্ঞানিক। আসলে নীতিবোধ এবং সৌন্দর্যের অনুধ্যানের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়েই মহৎ শিল্পের সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়াটার কথা ভুলে যান বলেই নীতিবাগীশ ও নন্দনতাত্ত্বিকরা মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শিল্পীর প্রাত্যহিক জীবনের নীতি-বিচ্যুতি একান্তই ব্যক্তিগত কিন্তু তার শিল্পকৃতিতে নীতিবোধের

দেওয়া, আইডিয়ার বস্তুনির্ভরতা অস্বীকার করা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পে বিমূর্তকরণের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী, আশা করি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার অনিবার্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত লেখাটির মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ল। যেমন, "শিল্পকলায় বাস্তবের সাদৃশ্য রচনা ও সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতিফলন—সাম্যবাদ গঠনের কাজে সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের এটাই একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে; এ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বিবেচিত হবে—এই মর্মে হুঁশিয়ারীও দেওয়া হয়েছে।" আমার যতদূর মনে হয় আঙ্গিক নিয়ে কোনো নির্দেশ জারি করা হয় নি। ক্রুশ্চভ বলেছেন, "He who advocats the idea of peaceful co-existence in ideology is objectively sliding down the position of anti-communism." ব্যক্তির রীতি বা প্রকাশবৈশিষ্ট্য তাঁর নিজস্ব। এ সম্পর্কে ক্রুশ্চভ বলেছেন, "How best and most correctly to carry out this line in artistic creation each decides in accordance with his understanding of his duty to the people and the peculiarity of his talent of his artistic individuality."

সোভিয়েত সংস্কৃতির অতীত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনি কবি ব্লকের খেদোক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছেন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই "শিল্পসৃষ্টির মেরুদণ্ডকে রাষ্ট্র-করায়ত্ত করার ব্যবস্থা হয়েছিল।" একটু পরেই লিখছেন, "সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রথম কয়েক বৎসর তাই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ দেখা দিয়েছিল"। উক্তি দুটি কি পরস্পর-বিরোধী নয়।

মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার একমাত্র কারণ Rapp-এর প্ররোচনা একথা কি সত্যি? মায়াকোভস্কির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তার আত্মহত্যায় মর্মাহত আমিও। প্রতিটি আত্মহত্যার পেছনে জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবানুষঙ্গ বিদ্যমান। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা 'Trigger point' হিসেবে কাজ করতে পারে। তা বলে অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাটিকেই আত্মহত্যার একমাত্র বা প্রধানতম কারণ বলে ফতোয়া দেওয়া চলে না। মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার কারণ নির্ণয়েও অতি-সরলীকরণ পদ্ধতি অচল। তাঁর কবিসুলভ অব্যবস্থচিত্ততা ও অস্থির মতিত্বের সঙ্গে আত্মহত্যার খানিকটা সম্বন্ধ নেই কি?

"মার্কসবাদ একটি জীবনদর্শন। আদর্শরূপে তা যদি কেউ গ্রহণ করেন, তবে সেটা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রূপায়িত করবে এবং তাঁর শিল্পকর্মেও তার পরোক্ষ প্রকাশ ঘটবে"—কোনো মার্কসবাদী স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাসী নয়। ইতিহাসের পরিবর্তনে প্রত্যেকের সচেষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। মার্কসবাদ শুধু জীবনকে ব্যাখ্যা করে না, জীবনকে পরিবর্তিত করার জন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। "শ্রেণী সংগ্রামপ্রসূত রাজনীতির দুই শিবিরকে শিল্প-সাহিত্যে আমদানী করতে গিয়ে নকল বুঁদির গড়ের লড়াই ছাড়া আর কিছু হয় নি।" পরিচয়-এর পাঠকদের কাছে অন্তত এ বুর্জোয়া উদারনীতিক উক্তির কোনো মূল্য নেই বলে আমি মনে করি।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় "মানুষের আদিম সৌন্দর্যবোধের কাছে রঙ ও রেখার একটা প্রত্যক্ষ আবেদন আছে" বলে বিশ্বাস করেন। সৌন্দর্যবোধ অন্যান্য সমস্ত বোধের মতোই পরিবর্তনশীল। যে রং ও রেখায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পুলক সঞ্চার করে সেই রং ও রেখা অন্যমনকে বিষাদ-ভারাক্রান্ত করতে পারে। সৌন্দর্যের উপলব্ধির শাশ্বত বা সনাতন কোনো ছক বাঁধা নেই। একটি দেশ-কালের সমসাময়িক ধ্যান-ধারণার দ্বারা সৌন্দর্যের সত্তা নিরূপিত হয়—সৌন্দর্য উপলব্ধি কি শর্তাধীন নয়। "Beauty then is almost meaningless word if one attempts to attach to it any absolute value. It is merely a convinient and ingenious speech of short hand. ...Beauty in work of art is not an inherent quality but an attribute within into it the moment it begins to communicate its massage." একজন প্রখ্যাত আর্ট ক্রিটিকের এই উক্তি পুরোপুরি মনো-বিজ্ঞান সম্মত না হলেও এর মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। ইবস্টাইনের ভাস্কর্য বা পিকাসোর চিত্রকলা চিরকালই যে সুন্দর বলে প্রশংসিত হবে এ বিশ্বাস আমি করি না।

বিপ্লবোত্তর যুগে রুশ শিল্প-সাহিত্যে "বাস্তব জগতের নির্জীব সাদৃশ রচনা" ছাড়া বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে এ-আলোচনা শেষ করব। বুর্জোয়া সমালোচকদের মতে ডক্টর জিভাগো উঁচুদরের সাহিত্যকৃতি—অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সে ধারণার শরিক নন। 'The Man' বা Babiyar সম্পর্কে স্বভাবতই বুর্জোয়া ক্রিটিক ও ক্রুশ্চভ এক মত হবেন না। সমালোচনার

নির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকলে শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণী বিচার সম্ভব কি ? "মরুস্থানের মতো মাঝে মাঝে দু-একটি সৃষ্টিকর্ম বর্হিজগতকে" যদি সচকিত করে থাকে তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা, সোভিয়েত জীবনবিন্যাস, মূল্যবোধ বা নীতিবোধ কোনোদিক থেকেই বুর্জোয়াদের সগোত্র নয়। তাছাড়া কোনো দেশেই যুগে যুগে মহান সাহিত্যিক বা সৃজনশীল শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন না। শেক্সপীয়রের পরে একশো বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয় নি এবং তলস্তয়ের মতো মহান স্রষ্টা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় আবির্ভূত হয় নি বলে ক্ষোভের কিছু নেই। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ এর জন্য দায়ী নয়। বিগত চল্লিশ বছরে কোনো দেশের শিল্প-সাহিত্যেই শেক্সপীয়র-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের মতো মহান স্রষ্টার সাক্ষাৎ মেলে না। প্রাক্-বিপ্লব যুগে সাহিত্য-শিল্পের যতটা উৎকর্ষ ঘটে বিপ্লবোত্তর যুগে সেই উৎকর্ষের মানদণ্ড মোটামুটি বজায় থাকলেও উৎকর্ষতর সৃষ্টির সাক্ষাৎ মেলে না। প্রাক্-বিপ্লব যুগের বিপরীত ভাবধারার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষই বোধহয় তার মূলীভূত কারণ। ঐ বিসম-দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষেই জীবনমথিত প্রক্ষোভের আলোড়ন, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রাণশক্তি।

বুর্জোয়া দেশেও যে গত পঞ্চাশ বছরে মহান শিল্পসৃষ্টির কোনো উল্লেখযোগ্য নজীর নেই, এরিক নিউটন তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তার মতে, "What was modern in 1906 still modern in 1955." কারণ উনিশশো ছ সালে পিকাসোর Les Demesolvs d' Avignon অঙ্কিত হওয়ার পরে আধুনিক শিল্পের অগ্রগতি—"are in fact movement for movement's sake which is hardly distinguishable from art for art's sake" এবং বিপ্লবের মাতামাতির পর বুর্জোয়া শিল্পজগতে এখন নিরুদ্যম নিশ্চল অবস্থা। কারণ, শিল্পীদের নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যার প্রতি আত্যন্তিক ঝোঁক স্পষ্টতই মূর্ত সামাজিক ও মানবিক সমস্যা থেকে পশ্চাদপসরণ মাত্র।

উপসংহারে লেখককে জানাতে চাই মার্কসের উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁর তথাকথিত উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত হয় নি। প্রথম উদ্ধৃতিটি প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে এ মন্তব্য অচল। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি 'মুক্ত দুনিয়ার' শিল্পী লেখকদের প্রতিও প্রযোজ্য। মার্কসবাদ একটা ডগমা নয়, আর মার্কসের বাণীর আক্ষরিক সত্যতা রক্ষাই কি মার্কসবাদীর ধর্ম ? তাছাড়া মার্কসীয় দর্শনের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে টেনে

আনা তাঁর মোটেই উচিত হয় নি। পরিশেষে পরিচয়-এর লেখকের কাছে বিমূর্ত শিল্প সম্পর্কে সোভিয়েত শিল্পীর অভিমত পেশ করছি।

"That which is the dearest of all man with his thoughts and deeds—is of no value to them and does not arouse there interest. Man is dear to me, whereas an abstractionist is indifferent to him.

"Some men of culture who say that a tendency is noticeable in our country to make a single artistic manner general. Socialist realism has room for numerous artistic styles. That is its strength, its attractive power". (Pavel Korin—People's Artist)

"It is necessary to work consistently so as to eliminate them, these despicable thorns—the manifestation of abstractionism and diverse formalistic trends alien to us" [Abbumom Unov I.]

কোটিপতি শিল্পসম্রাট হ্যারিম্যান ও রকফেলারদের আর্টপ্রীতি ভুবনবিদিত। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়দের মতোই এঁরা বিশেষ ধরনের আর্টের ভক্ত। মেক্সিকোর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Reviera নিউইয়র্কের রকফেলার সেণ্টার ফ্রেসকো চিত্র অঙ্কিত করবার জন্য আদিষ্ট হন। কাজটি পরিসমাপ্তির মুখে নেলসন রকফেলার বুঝতে পারেন রিভেরা বিমূর্ত শিল্পীর গোষ্ঠীভুক্ত নন এবং তাঁর চিত্রে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছে। বহু অর্থব্যয়ে আঁকা চিত্র নষ্ট করে ফেলেছেন নেলসন।

মনে রাখা দরকার, এঁরা সাহিত্যশিল্পের জন্য—সাহিত্যশিল্পের পেট্রন নন। "For all there talk about 'pure art' the Rockfellers know very well, of course, that art is also a form of politics. That is why they encourage the abstract artist. Any art that takes the people's mind off the realities of life and clouds their understanding, that carries no message of any kind to the people, well deserves their support and they willingly popularise it. The millions they invest in abstract art business yield good dividends, politically if not financially." (New Times—No. 13, 1913)

বিমূর্ত শিল্পের রেখা ও রঙে—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একটু নজর করলেই দেখতে পারেন—ম্যামনের প্রতিমূর্তি।

"সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা"

সতীন্দ্র চক্রবর্তী

এক

ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়'-এ শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় "সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা" শীর্ষক যে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সে প্রবন্ধের জন্য তিনি মুক্তবুদ্ধি সমাজতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রপ্রেমিকদের সাধুবাদ অবশ্যই পাবেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে, কল্পনার চড়া রং ঢেলে সোভিয়েত দেশকে যারা 'সব পেয়েছির দেশ' হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা প্রবন্ধটি পাঠ করে হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন। তবুও সরকারী মার্কসবাদের ধরাবাঁধা চিন্তাধারার ব্যতিক্রম হিসাবে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অসামান্য। সাবলীল ভাষায় লিখিত বুদ্ধির ও মননশীলতার ঔজ্জ্বল্যে আকর্ষণীয় প্রবন্ধটি প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দায়িত্বশীল সমাজতান্ত্রিকের অবশ্যপাঠ্য বলেই মনে করি।

সুমন্তবাবু সোভিয়েত মার্কসবাদের দার্শনিক প্রত্যয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন নি। তবুও যে সব প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, সে প্রশ্নগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। সমাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সমাজতন্ত্র কি চিরকালই গণতন্ত্র বর্জন করে স্বেচ্ছাচারের পথ ধরে চলবে? সোভিয়েত দেশের ইতিহাসে শিল্প-সাহিত্যের উপর রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব ও পার্টি-নায়কতন্ত্র বার বার দেখা দেয় কেন? কেন সোভিয়েত দেশে তথা অন্যান্য সাম্যবাদী দেশে জনসাধারণের শিল্পকর্মের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে মাঝে মাঝেই লাল ও সবুজবাতির সংকেত দিতে হয়? সমাজতান্ত্রিক জীবনবেদের স্রষ্টারা ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের নাগরিকের শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সমাজতন্ত্রে সেই স্বাধীনতা প্রহেলিকায় পথ হারাল কেন? কেন সেসব দেশে আজও শিল্প-সাহিত্যের পথ এত ক্ষুরধার, বহু বাধাবিঘ্ন-কণ্টকিত? কেন সমাজতন্ত্রের দেশে শিল্পী-সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণীর সম্মান রাষ্ট্র ও পার্টি-নায়কদের স্থূল হস্তাবলেপে প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়, বিবেক বিসর্জন না দিলে কেন এসব দেশে সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, সুরকার, ভাস্কর, সকলেই হৃতগৌরব হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান?

সুমন্তবাবু এ ধরণের প্রশ্ন তুলেছেন। সর্বত্র হয়তো সোজাসুজি নয়, খানিকটা উহ্য রেখে। তবুও এসব মৌলিক প্রশ্ন প্রবন্ধটিতে উত্থাপিত হয়েছে এবং সেটাই আমাদের লাভ।

সুমন্তবাবু প্রবন্ধটি যখন লিখেছিলেন তখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্তা শ্রীইলিচভের ঝানভ-ঐতিহ্যাশ্রয়ী বক্তৃতা এদেশে এসেছে। পরবর্তীকালে শ্রীক্রুশ্চভের বক্তৃতাও আমরা পেয়েছি। জিজ্ঞাসু পাঠক শ্রীইলিচভের ও শ্রীক্রুশ্চভের ভাষণ পাঠ করলে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে আজও সোভিয়েত দেশে পার্টি-নায়কতন্ত্রের উদ্ধত অশালীনতা কতখানি প্রগল্ভ হতে পারে। আমাদের দেশে কবি ও আলংকারিকেরা বলেছেন, অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করো না, কেননা সাহিত্যশিল্পরস সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য। আজও সোভিয়েত দেশে কথাটা অন্য ধরণের। সফল পার্টি-নেতা হলেই শিল্প-সাহিত্যে তিনি অধিকারী! কেননা রাজনৈতিক সাফল্যই প্রমাণ করে যে নেতা রুচিবান্, সহৃদয়হৃদয়, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গম (মহামতি স্তালিন তাই ছিলেন না কি?) ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রায় দেন, কবি এসেনিন-ভোলপিনের কাব্যগ্রন্থ "অর্ধশিক্ষিত দার্শনিক গ্রন্থ, এতে আছে মানববিদ্বেষী, সোভিয়েত-বিরোধী কবিতা। এ সাহিত্য-সৃষ্টিকে 'কবিতা' না বলে উন্মাদের প্রলাপ বলাই সঙ্গত।" শ্রীইলিচভের নিজের ভাষায় বক্তব্যটা শুনুন। "The book contains pretentious and semi-literate 'philosophical treatise' as well as anti-Soviet misanthropic verses, like a lunaties ravings." কবি এসেনিন-ভোলপিনের কাব্যকৃতির সামগ্রিক আলোচনা নয়, কোনও রসবেত্তা কাব্য-সমালোচক কবির সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নও করছেন না, ঝানভের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ-রায় দিয়েছেন পার্টি-নায়ক শ্রীইলিচভ, বিপদটা সেখানে। শ্রীইলিচভ কবিমানসের বিশ্লেষণ করেন নি, কবির তত্ত্ববোধ কতখানি যথার্থ, শিল্পকর্মসমন্বিত, এ-হেন 'অর্বাচীন' আলোচনায় তিনি যান নি। পার্টি-নেতা হিসাবে তিনি শুধু ঘোষণা করেছেন: "It is permeated with fierce hatred for Soviet society, for the Soviet people. The book by Esenin-Volpin is represented abroad as the manifesto of the new Soviet generation in revolt.

Nonsense, this *rogue* certainly repersents no one. He is

merely a *poisoned fungus rotten to the core.*" [বাঁকা হরফ প্রবন্ধকারের]

কবি ভোলপিনের কাব্যচর্চার ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অকিঞ্চিৎকর। ফলে কবির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে আমরা অপারগ। কিন্তু যখন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখি যে একজন জনপ্রিয় কবি সম্পর্কে পার্টি-নেতা অশ্রাব্য মন্তব্য করেন, কোন কবিতা পাঠ্য কোন কবিতা অপাঠ্য সে সম্পর্কে রাজনৈতিক রায় দেন, সাহিত্যমূল্য আলোচনা না ক'রে কবিকে 'দুরাত্মা' (rogue), অভ্যন্তর-পচে-যাওয়া (rotten to the core) ফাংগাস্ বলে অভিহিত করেন, তখন সত্যিই মনে হয় যে সোভিয়েত সংস্কৃতিজগৎ আজও রাজনৈতিক দিঙ্‌নাগদের গুণ্ডাঘাতে বিপর্যস্ত, কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের 'প্রজাপতি', 'স্রষ্টা' হয়ে ওঠবার পথ স্তালিনোত্তর যুগেও সে দেশে যৎসামান্য, হয়তো বা সাময়িকভাবে অপস্রয়মান।

দুই

স্তালিন আমলের পর যখন সোভিয়েত দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নমনীয়তার আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই বরফগলার যুগে, ১৯৫৪ থেকে সোভিয়েত সংস্কৃতি জগতের আলোড়নের সংবাদ দেশে-বিদেশে পৌঁছেছে। জানা গেছে যে সংস্কৃতিজগতে তখন পুরাতন ও নবীনের সংঘাত প্রকাশ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে গোঁড়া, ধরাবাঁধা চিন্তায় অভ্যস্ত, পার্টি-আশ্রিত সাহিত্য-শিল্পীর দল, অন্যদিকে নরমপন্থী নতুন সৃষ্টিপ্রয়াসী সাহিত্যশিল্পীগোষ্ঠী। এই দুই দলের মননে ও নিদিধ্যাসনে, কর্মে ও সৃষ্টিতে, দুস্তর ব্যবধান। ১৯৫৬-৫৭ সালে সোভিয়েত সংস্কৃতিজগতে যে ভাববিপ্লব অলক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, তৎকালীন সোভিয়েত সাহিত্যপাঠকেরা সেকথা জানেন। সাহিত্যবাসরে, বৈঠকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সর্বদাই মুখর আলোচনা। রক্ষণশীলেরা স্তালিন যুগের কূর্ম-বৃত্তির পরিপোষণ করে তখনও দাবী তুলেছেন: 'সাহিত্যশিল্পে ইডিওলজিকাল নিয়মাবলী মেনে নিতে হবে', আওয়াজ তুলেছেন যে 'ইডিওলজিকাল দিক থেকে ভ্রষ্ট সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টি একান্তই নিরর্থক।' অন্যদিকে নব্যপন্থীরা দাবী তুলেছেন যে সাহিত্যশিল্পে মূল অভীষ্ট: 'শিল্পগত উৎকর্ষ—artistic quality'। তাঁরা দাবী করেছেন, সব ভাবনা ও চিন্তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে হবে। এমনকি শ্রীসিমোনভ আরও সুদূর-

প্রসারী বক্তব্য রাখলেন, বললেন: সাহিত্যশিল্পে এমনকি পার্টিজানসিপ-নীতি স্বতঃপ্রমান নয়, পরতঃপ্রমান। সাহিত্যশিল্পের গুণগত উৎকর্ষের মাপকাঠিতে এই পার্টিজানশিপ-নীতির যাথার্থ্য পরীক্ষা করতে হবে, অন্যথা এই নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন হবে না। [লিটারারি গেজেট—মে ৫, ১৯৫৫, সিমোনভের ভাষণ]।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত দেশে নব্যপন্থীরা নানাভাবে সাফল্য অর্জন করেন। যে সব লেখক ও সাহিত্যিক স্তালিন আমলের তাণ্ডবে জীবন আহুতি দেন তাঁদের অনেকের পুর্নবাসন ঘটে। "পার্টি-বিরোধী" ম্যালেনকভ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় এমন কথাও (১৯৫৫, ১৮ নম্বর সংখ্যা) বলা হয় যে, উনবিংশ কংগ্রেসে ম্যালেনকভ-প্রতিপাদিত "শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টিজানসিপ"-তত্ত্ব বহুলাংশে ভ্রান্ত।

১৯৫৭ সালের হাঙ্গেরি-অভ্যুত্থানের পর সোভিয়েতের পার্টি ও সরকারী নেতারা কিছুটা প্রমাদ গণলেন। তখন থেকে স্বয়ং শ্রীক্রুশ্চভ শিল্প-সাহিত্যে পার্টির তদারকির সমর্থনে অগ্রসর হলেন। নব্যপন্থীদের উপর মতবাদগত আক্রমণ নানাভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উদ্যত হলো। ১৯৬১ সালে শ্রীক্রুশ্চভ যে বক্তৃতা দিলেন সেই বক্তৃতায় নতুন করে স্তালিনের সদর্থক-দিক সম্পর্কে জোর দেওয়া হলো। বলা হলো স্তালিন-আমলে বাস্তবকে রঙীন করে দেখান হয়েছে, একথা বলা অন্যায়। শ্রীক্রুশ্চভ বললেন: স্তালিন পুরস্কার বিজয়ীরা অনেকেই সার্থক স্রষ্টা কেননা এঁদের সাহিত্য-শিল্পকর্মে "আমাদের জীবনের সদর্থক-দিকই প্রতিফলিত হয়েছে", ইত্যাদি। শ্রীক্রুশ্চভ সমগ্রভাবে যে বক্তব্য রাখলেন তাতে গোঁড়া শ্রুতিবাদীরা অনেকখানি শক্তিসঞ্চয় করল, নব্যপন্থীরা খানিকটা অসুবিধার সম্মুখীন হলো। তবুও শ্রীক্রুশ্চভ সাহিত্য-শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে-নীতি নির্ধারণ করে দিলেন তাতে কিছু ফাঁক ছিল। শ্রীক্রুশ্চভ বললেন: (১) সোভিয়েত বাস্তবকে 'সমগ্রভাবে' মসীকৃষ্ণ করে দেখানো চলবে না (২) এই বাস্তবের নঙর্থক দিক এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত না হয় এবং মনে রাখতে হবে যে অগ্রগতি দিক্‌নির্ণয় করবে পার্টি (৩) তবে গীতিকবিতা কিম্বা অনুভূতি-আশ্রয়ী বিষয় বর্জন করতে হবে এমন দাবি পার্টি করবে না (৪) সাহিত্য-শিল্প ফ্রণ্টে অনেকেই ভ্রমপ্রমাদ করেছেন তবুও স্মরণ রাখতে হবে যে সাহিত্যিক কিম্বা শিল্পী ভ্রমপ্রমাদ করলেও, কেউ-ই ক্রিমিনাল নন।

১৯৫৭ সাল থেকে কিছুকাল তাই সোভিয়েত সংস্কৃতিজগতে বিরোধী সমাগমের চিত্র দেখা গেল। 'পার্টি-নীতির ভিত্তিতে সব লেখকের ঐক্য',—ভুলবোঝাবুঝির পালা শেষ করে সাহিত্য-শিল্পফ্রন্টকে সংহত ঐক্যে নিয়ে আসা, এই ছিল তৎকালীন পার্টি-দাবি। বলা হলো যেসব সাহিত্যিক ও শিল্পীরা পার্টি-নীতি থেকে অনেকদূরে সরে গেছেন তাঁদের কর্তব্য হবে কাজের মধ্য দিয়ে ভ্রমসংশোধন। আর পার্টিপ্রেমিক সাহিত্যিকদের কাজ হবে অতীতকে খুঁচিয়ে না তোলা। অর্থাৎ সংগ্রামবিরতি। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত দেশে তৃতীয় সাহিত্য কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই সাহিত্য কংগ্রেসের পর কট্টর পার্টি-সেবক শ্রীসুরোকভের পদাবনতি ঘটে, স্থলাভিষিক্ত হন কিঞ্চিৎ নরমপন্থী শ্রীফেদিন। অন্যান্য দু-একটি ব্যাপারেও নরমপন্থীরা অগ্রসর হন। রক্ষণশীলেরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তবে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২—এই চারবছরের ইতিহাস সংগ্রামবিরতি এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বেরই ইতিহাস। এ কবছরেই একদিকে রক্ষণশীলেরা আবার একজোট হয়েছে সর্বশ্রী সুরোকভ, কোচেতভ ও গ্রিবাচভের নেতৃত্বে। অন্যদিকে নরমপন্থীদের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন সর্বশ্রী ইরেনবুর্গ, ইয়েভতুশেংকো এবং তি. ভার্দোভস্কি।

বিরোধী-ঐক্য ও বিরোধী-সমাগমের এই পটভূমিকায় ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে এই কংগ্রেসে মোট বত্রিশজন লেখক যোগ দেন এবং আলোচনায় পাঁচজন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে কোচেতভ নাম-না-করে ইরেনবুর্গের আত্মজীবনীর তীব্র সমালোচনা করেন। কবি ইয়েভতুশেংকোকে আক্রমণ করে বলেন: এঁরা সব বিশেষ আগ্রহান্বিত কাব্যিক কুক্কুটশাবক, তবে এঁরা সংগ্রামী কুক্কুট হিসাবে প্রতিভাত হতে (chickens sparsely sprinkled with yellow stuff, who are desperately eager to appear as fighting cocks.)

শ্রীযুক্ত গ্রিবাচভ Literaturnaya Gazeta-র বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ আনেন:

এই মাসিক পত্রিকায় সোভিয়েত দেশের জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাহিত্যকৃতির পরিচয় মেলে না। নন্দনতত্ত্বের সমস্যা সম্পর্কে এই পত্রিকার

ঔদাসীন্য আত্যন্তিক। অনুভূতিবেদ্য ব্যাপার নিয়েই এর মাতামাতি। 'সেনসেশন-মংগারিং'-ই এ পত্রিকার একমাত্র কাজ।

নরমপন্থীদের অন্যতম নেতা টি. ভার্দোভস্কি পার্টি-কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দেন তা নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। "The reader is surely in need of the whole truth. He is annoyed at evasion and subterfuse on the part of the artist…when a writer asserts today that the cup is full to the brim or even brimming over, he will get nothing but ridicule from his annoyed reader…"

"Writers are called the Party's closest helpers—this is a high title that carries with it many duties, but it may be understood in different ways. These are some who think that to be "a helper of the Party" means merely to go along with the Party, "using literary media" to illustrate the various proposals of the Party, the tasks it dafines in economy and production. In practice it works out something like this : "The bright rays of the setting sun were still painting with gold the tops of birch trees around the cottages to the Path to Communism kolkhoz coper ? Grunya, the diarymaid, having calculated all factors, resolved to obtain from her cows liters of milk above the quaintity required by her commitments."

"Perhaps it is not always as primitive as all that, but that is what the 'literary form' of the illustrative metthod actually boils down to. Its unsoundness is obvioses" [Soviet Literature No. I 1962] স্পষ্টই দেখা যাবে যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' তত্ত্বটির উল্লেখ না করেও টি. ভার্দোভস্কি এই তত্ত্বটির হাস্যকর রূপটি উদ্ঘাটিত করেন। বহুল প্রচারিত "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার গৌরবময় ঐতিহ্য" সম্পর্কে মৌন থেকে টি. ভার্দোভস্কি বলেন যে, শিল্পে-সাহিত্যে শিল্প-সাহিত্যসুষমা, মনোহারিত্বই প্রধান কথা। শিল্পগত উৎকর্ষ যদি না থাকে তবে শুভ ইচ্ছা কিম্বা সঠিক মতাদর্শে কিছুই হবে না।

পক্ষান্তরে শ্রীগ্রিবাচভ ১৯৫৬-৫৭ সালের উদারপন্থীদের "স্বাধীনসৃষ্টি"র দাবি সম্পর্কে বলেন : 'At that time there were advanced, sometimes by the Communists, demands for the liquidation of the Party influence on literature, even demands to publish everything freish as is written, without editing, since as one of the spokesmen stated "a writer has a right to nonsense".

টি. ভার্দোভস্কি ২২তম পার্টি-কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, (বোধ হয় কূর্মবৃত্তিধারীদের কথা মনে রেখেই) যে : "Despite all the obvious achievements of our literature in recent years···in my opinion it has not yet been able to take full advantage of those favourable conditions which the 20th Party Congress laid down for it."

২২তম কংগ্রেসে রক্ষণশীল ও উদারপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে মতাদর্শগত পার্থক্য লক্ষিত হয় সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীলেরা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'কে ধরাবাধা সূত্র হিসাবে তুলে ধরেন, উদারপন্থীরা জোর দেন শিল্পের গুণগত উৎকর্ষের উপর। রক্ষণশীলেরা দাবি করেন সোভিয়েট সাহিত্যে নায়ক হিসাবে চিত্রিত হবে 'পজিটিভ হিরো', জ্ঞানে কর্মে, চারিত্র্যমর্যাদায়, সাম্যবাদী নৈতিকতায় যে বীর একান্তই অপাপবিদ্ধ। অথচ টি. ভার্দোভস্কি রসিকতা করে বলেছেন : সত্যি, এমন একটি আদর্শ চরিত্র 'সর্বগুণান্বিত'—'but just imagine having to share a carriage with him to Vladivostok'। ২২তম পার্টি কংগ্রেসে শ্রীশোলোকভ ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের দুকুল রাখবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিভাবান সাহিত্যিক হিসাবে শোলোকভ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তবুও কংগ্রেসে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সমস্যা সম্পর্কে শোলোকভ বিশেষ কিছুই না বলে খানিকটা পরিহাস রসিকতা করে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করেন। কংগ্রেসে পার্টির যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় সেই নির্বাচনে তিনজন লেখক সাফল্যলাভ করেন। শোলোকভ পূর্ণ-সদস্যপদলাভ করেন। বোধ হয় তিনি নির্গোষ্ঠী, এই কারণে। প্রার্থী-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন দুজন, শ্রীগ্রিবাচভ (রক্ষণশীল) এবং শ্রীটি. ভার্দোভস্কি (উদারপন্থী)। ফলে শিল্পসাহিত্য ফ্রণ্টে ভারসাম্য বহাল থাকে, কেন্দ্রীয় কোনও বিশেষ-পন্থীরা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন করতে পারেন না।

কমিটির নির্বাচনের ফলাফল থেকে বোঝা গিয়েছিল যে উদারপন্থীদের পথ দুর্গম, ক্ষুরধার ; এ পথ পরিক্রমায় উত্থানপতন আছে, সাময়িক পরাজয় সম্ভব। রক্ষণশীলেরা সহজে পরাস্ত হবে না, প্রগতির রথচক্র থামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, স্তালিন-আমলের অনমনীয়তার আমদানী করবে 'পার্টি-সাহিত্য' ও 'পার্টি-শিল্পে'র নামে, এ দুশ্চিন্তা তাই নিরর্থক ছিল না। সাম্প্রতিক রক্ষণশীল-প্রাধান্য প্রমাণ করেছে যে, উদারপন্থীদের কপালে আরও দুঃখ আছে, কঠিন তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হবে অভীষ্ট-অন্বেষণে।

তিন

বিগত শীতকালীন অধিবেশন প্রমাণ করেছে যে সোভিয়েত দেশের শিল্পচর্চা নতুন সংকটের সম্মুখীন হলো। শ্রীইলিচভের ও শ্রীক্রুশ্চভের ভাষণ পড়লে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সোভিয়েত দেশে কিছুকাল পুনরায় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার তাণ্ডব দেখা দেবে, শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীনসৃষ্টির প্রয়াস পার্টি-লাঠিয়ালদের দৌলতে নিষ্পিষ্ট হবে। আগেই বলেছি ডিসেম্বর মাসে শ্রীইলিচভ যে ভাষণ দেন সে ভাষণের অশালীন অসংযম স্তালিন-ঝানভ যুগেরই উত্তরাধিকার। ভল্গা দিয়ে অনেক স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যে, কিন্তু পার্টি-নায়কদের চারিত্রের টিপিক্যালিটি সনাতন। সাহিত্য-নীতি কিম্বা শিল্পনীতির সক্ষম আলোচনা নয়, আলোচনায় বিনয়নম্র রসজ্ঞতার পরিচয়ও নয়। পুরাতন সূত্রাবলীর পুনরাবৃত্তি করে, পার্টি-নির্দেশ হিসাবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে ফতোয়া পৌছে দেওয়া, আজও পার্টি-নায়কতন্ত্রের এটাই কাজ। শ্রীইলিচভের ক্রোধ এবং ভীতি থেকে বুঝতে পারি সোভিয়েত দেশে এই ক বছর নব্যপন্থীরা নতুন নতুন তত্ত্ব আমদানী করেছেন। আঙ্গিককে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, ধরাবাঁধা লাইন বর্জন করে বাস্তবকে সাহিত্যভাত করবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীইলিচভ এ কারণে রুষ্ট, শ্রীক্রুশ্চভ নিতান্তই বিরক্ত। শ্রীইলিচভ বলছেন, আমাদের তত্ত্ববাগীশদের হল কি ? সবাই বিচিত্ররূপপ্রয়াসী, ব্যক্তিরুচির সমর্থক !

"They are endeavouring, under the cloak of overcoming *imaginary dictates*, to impose real *dictates of subjective tastes* which have divorced people from life and arc alien to every normal, healthy-minded person"। (বাঁকা হরফ প্রবন্ধকারের) ভিন্ন ভিন্ন

সাহিত্য-শিল্পরুচি অনুযায়ী বিচিত্র, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি হবে, এই সাংঘাতিক দাবি (শ্রীইলিচভ ঘোষণা করেছেন) শুধু যে সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশধারার পরিপন্থী তাই নয়, এ-হেন নাস্তিক্যবুদ্ধি, লেনিনবাদ-বিরোধী, পার্টি-বিরোধী তো বটেই। কেননা ইলিচভের মতে শাস্ত্রগত সত্য শাশ্বত, সনাতন, অক্ষয়, অব্যয়। এবং সে সত্য হলো : শিল্প কলার ইডিওলজিক্যাল রাজনৈতিক প্রবণতা থাকবেই এবং কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণই শিল্পসৃষ্টির কর্তব্য। "We should bear in mind as an *immutable truth* that art has an idiological political trend, that in one way or another it expresses and upholds the interests of different classes and social strate. And when we encounter a particular tendency in art. the first question which naturally arises is whose interests does it serve, what does it call for, what social ideals does it proclaim ? [বাঁকা হরফ প্রবন্ধকারের)। শ্রীইলিচভ রায় দিয়েছেন যে সমকালীন শিল্প-সাহিত্যচর্চায়, সোভিয়েত দেশে, দুটি বিপদ দেখা যাচ্ছে, একটি হলো আঙ্গিক-সর্বস্বতা (formalism) অন্যটি বিমূর্ত শিল্পচর্চা (abstractionism)। পার্টি-নায়ক বলছেন : আজ যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আয়ুধাগারে ২২তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী সঞ্চিত হয়েছে, সঞ্চিত হয়েছে শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চভের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সুভাষিতাবলী তখন সাম্যবাদ-গঠনপ্রয়াসী দেশে কিনা দেখা গেল, শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে উন্মার্গগামিতা, সোভিয়েতের বাস্তবতার ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলা! নব্যপন্থী বিমূর্ত শিল্পীরা বলছেন 'আমরা সত্যসন্ধানী' (seekers)। অথচ এঁরা সবাই প্রচ্ছন্ন, বুর্জোয়াশিল্পের অনুগামী। এসব শিল্পীর শিল্পচর্চা কিম্বা সাহিত্যচর্চা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এঁদের সাধারণ জ্ঞানেরই অভাব (commonsense)। এককেন্দ্রিকতার (accentricity) প্রকাশ এঁদের শিল্পকর্মে এবং এই শিল্পকর্মে হিতকারী (wholesome) কোনো ধর্মই নেই। বিমূর্ত শিল্পীরা যে সৃষ্টির গর্ব করেন সে সৃষ্টিকে 'অঙ্কন' বলা চলে না, বলতে হয় 'লেপন' (abstract daubs)। এবং এ সৃষ্টিতে অপুর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমতার কোনও নিদর্শন নেই আছে শুধু পশ্চিমী বুর্জোয়া দেশের বিমূর্ত শিল্পের অক্ষম অনুকরণ। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অবসাদখিন্ন, বিষণ্ণতায় আবিল, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া শিল্পকলার অক্ষম অনুকৃতি—এ-হেন বিমূর্ত

শিল্প সোভিয়েত শিল্পচর্চারই সম্পূর্ণ বিরোধী। লেনিনবাদ ও পার্টি-বিরোধিতাই এর মর্মবস্তু।

শ্রীইলিচত বিমূর্তশিল্পীদের বিবিধ দোষাবলীর 'রাজনৈতিক' আলোচনা করেছেন। কেন সাম্যবাদ-গঠনপ্রয়াসী 'সব পেয়েছির দেশে' এই প্রবণতা এত বিস্তৃত হলো তার কারণানুসন্ধান অবশ্য তিনি করেন নি। বোঝা যাচ্ছে কূর্মবৃত্তির ধারক-বাহকেরা নূতন প্রবণতা দেখে ভয় পেয়েছেন। শ্রীইলিচভ বলছেন : "Unfortunately formalistic trends have begun to spread not only in the graphic arts, but also in music, literature and cinema." এই প্রবণতা রুদ্ধ করবার পথ কি? বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতার কি যাচাই হবে? শিল্পী-সাহিত্যিক কি তাঁদের সত্যানুসন্ধানের ফলাফল মহাকালের দরবারে পেশ করবার সুযোগ পাবেন? সোভিয়েত দেশের 'নতুন মানুষ' কি আপন উপলব্ধির কষ্টিপাথরে এই শিল্পকর্মের মূল্য নিরূপণ করবেন? পার্টি-নায়ক বলেছেন : 'তা হবার নয়।' কেননা বিমূর্ত-শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টি—"Cannot raise any arguments, in general, because they are outside art।" প্রশ্ন হবে—এসব বিমূর্ত-শিল্পীরা কি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র-বিরোধী? সাম্যবাদ-গঠনপ্রয়াসী শ্রেণীশোষণহীন সোভিয়েত সমাজে এঁরা কোন শত্রুশ্রেণীর পক্ষে কাজ করেছেন? পার্টি-নায়ক বলছেন যে, শিল্পীর মানসে অসদভিপ্রায় হয়তো নেই, হয়তো এঁদের মধ্যে অনেকেই গত যুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণও করেছেন, তবুও এঁদের শিল্পকর্মের বিষয়গত তাৎপর্য মারাত্মক। এ তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এই শিল্প-সৃষ্টিতে শত্রুশক্তির সহায়তা হচ্ছে, অতএব অহিতকারিতা-দোষে এই শিল্প দুষ্ট।

"Sometimes people ask whether a man devoted to the Soviet system can be reproached with serving the interests of classes hostile to Socialism on the sole ground, say that his creative method and the methods of an art alien to its are as like as two peas. For the artist himself does not want to harm our country, for which he possibly shed his blood during the last war ; he is motivated by the best intentions....

তথাপি, "The good intentions of the artist do not at all exclude the fact that objectively his works may serve the interests of hostile forces।" ফলে শিল্পী স্বাধীনতা পাবেন না, পুরাতনের পাষাণভার বয়ে শিল্পী-সাহিত্যিককে চলতে হবে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', 'পার্টিজান্‌সিপ-নীতি,' 'জনসাজুষ্য' প্রভৃতি প্রত্যয়ের কঠিনবন্ধনে সমাজতন্ত্রের বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করতে হবে, এ দাবিই শ্রীইলিচভ করেছেন।

চার

শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চভ ৮ই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণ সম্পর্কে চৈত্র সংখ্যা 'পরিচয়'-এ সারানুবাদক শ্রীসত্যেশ রায় লিখেছেন: "সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিক, জনগণ ও পার্টির নেতৃবর্গ যে ওদেশের শিল্প-সাহিত্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে এরকম খোলাখুলি মতবিনিময়ে মিলিত হতে পেরেছেন, তাতে বিংশতি ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী বছরগুলিতে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে তারই প্রকাশ।" শিল্প-সাহিত্যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল কথাটা যথার্থ। তবে সেই আবহাওয়া যে কেটে যাচ্ছে, সোভিয়েত সংস্কৃতিজগতে আবার দেখা দিচ্ছে বদ্ধ গুমোট, শ্রীক্রুশ্চভের ভাষণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্রীক্রুশ্চভের ভাষণটি শ্রীইলিচভের সূত্রাবলীরই প্রামাণিক ভাষ্য। পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারী ও সরকারের প্রধানকে যখন নিজের এলাকা ছেড়ে শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য এমনিতরো রসলোকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, তখন অন্তত personality cult, কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা ও শিল্প-সাহিত্যে হস্তক্ষেপের অভিযোগ শুধুই স্তালিন ব্যক্তিপূজকদের প্রাপ্য বলে বোধ হয় না। আমরা জানি যে ২২তম কংগ্রেসের কর্মসূচীতে স্তালিনেত্তের যুগের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, সোভিয়েত সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে, সৃষ্টিশীল মার্কসবাদ সম্পর্কে আত্যন্তিক আনুগত্য দেখাতে পারে নি। স্তালিন-যুগের ধরাবাঁধা সূত্র ঐ কর্মসূচীতেও স্থান লাভ করেছিল। তবু মনে হয় যে, ঐ কর্মসূচীতে যেটুক প্রগতিশীল বক্তব্য স্থান পেয়েছিল, শ্রীক্রুশ্চভের সাম্প্রতিক ভাষণে সেটুকু বক্তব্যও স্থান লাভ করেনি। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল: In the art of socialist realism, which is based on the principles of partisan-

ship and kinship with the people, *bold pioneering* in the artistic depiction of life goes hand in hand with the cultivation and development of the *progressive traditions of world-culture.* Writers, artists, musicians, theatrical workes, and film makes have every opportunity of displaying creative initiative and skill, *using manifold forms, styles and generes.* (বাঁকা হরফ লেখকের)

কর্মসূচীতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র কথা আছে, "partisanship and kinship with the people"-এর কথাও আছে। তবুও বলা হচ্ছে জীবনকে শিল্পভাত করবার জন্যে দুঃসাহসী নতুন পথিকৃৎ-এর প্রয়োজন। আরও বলা হচ্ছে যে কূর্মবৃত্তি নয়, বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রগতিশীল ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন। এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এই প্রগতিশীল ঐতিহ্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বিকশিত হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কী হবে? কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, "The Communist Party shows solicitude for the proper development of literature and art and their ideological and artistic standards, helps social organisations and literary and art associations in their acturties।" অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি সামাজিক সংস্থা এবং সাহিত্য-শিল্পসংস্থার কাজে সহায়তা করে, বন্ধুর ভূমিকাই নেয়।

৮ই মার্চ সোভিয়েতের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সমস্যা বিষয়ে শ্রীক্রুশ্চভ যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণের পূর্বে মত আদানপ্রদান ব্যাপকভাবে কখন হলো? ১১ নম্বর 'নিউ টাইমস'-এ বলা হয়েছে যে: "Leaders of the Communist Party and Soviet Government met with writers and artists in Kremlin Sverdlov Hali on March 7-8. The meeting was a continuation of an earlier discussion on December 17, 1962." বক্তৃতা কারা দিলেন? 'নিউ টাইমস' লিখেছে: Speeches were made by L. F. Ilyichov. S. V. Mikhalkov, A. A. Prokofiev, A. S. Malyshks, P. U. Brovka, M. A. Sholokov, M. I. Romm, E. V. Shevelyova, T. N. Khrennikov, G. N. Chukrai, V. V. Yermilov, B. V. Hoganson, R. I. Rozhdestvensky, L. S. Sobolev, A. A.

Plastov, E. I. Neizvestny, W. Wesileiwska, A. A. Voznesenky, I. I. Golitsyn, V. P. Aksyonov, E. Y. Maltsev, V. A. Smirnov, A. G. Arutunyan, V. A. Kochetov, C. F. Azgus, D. A. Nalbandyan, Mirzo Tursun-Zoda. পাঠক লক্ষ্য করবেন এ-হেন 'ব্যাপক আলোচনায়', যেখানে খোলাখুলি নাকি 'মতবিনিময়' হলো, খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিক অনেকেরই নাম নেই। ইরেনবুর্গ, ইয়েভতুশেংকো, তি. ভার্দোভস্কি, ফেদিন, কবি নেক্রাসভ এমনিতরো বিদেশে পরিচিত, বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেন 'ব্যাপক আলোচনায়' যোগ দিলেন না বা দিতে পারলেন না, এ দেশে বসে তা বোঝা শক্ত।

শ্রীক্রুশ্চভ ৮ই মার্চ প্রধান চারটি পর্বে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। এই পর্বগুলি হলো: (১) কমিউনিজমের গঠনকার্য এবং সৃজনশীল শিল্পের কর্তব্য (২) সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের মূলনীতি—জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তা (Kinship with the people) ও পার্টি-মনোভাব (Party spirit) (৩) মতাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরুদ্ধে (৪) এবং লেনিনবাদী পার্টির পরিচালনা—সমস্ত সাফল্যের উৎস। আগেই বলেছি কর্মসূচীতেও (Programme) পার্টিজানসিপের কথা, জনসাযুজ্যের কথা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বক্তব্যও ছিল। জীবনকে রসাভিষিক্ত করে শিল্পায়িত করতে হবে (artistic depiction of life) এবং সেজন্যে চাই নিত্যনতুন পথপরিক্রমা (bold pioneering), এ বক্তব্যও কর্মসূচীতে ছিল। বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রগতিশীল ঐতিহ্য আছে এবং এ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অঙ্গাঙ্গিযোগ, এ-হেন নাস্তিক্যবুদ্ধির কথাও কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা পুরাতনের বোঝাই শুধু বয়ে বেড়াবেন, বিবর্ণ, বিশীর্ণ সৃষ্টিতে প্রতিভার অপচয় করবেন, এ দাবি কর্মসূচীতে নেই। অপরপক্ষে কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে শিল্প-সাহিত্যকর্মীরা সৃজনশীল উদ্যোগ নেবেন, তাঁদের সৃষ্টির পথে বিবিধ আঙ্গিক, বিচিত্র স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, তবেই উজ্জ্বল সৃষ্টি সম্ভব হবে (using manifold forms, styles and generes)। সোভিয়েত দেশের তথা সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে যে-সব দেশ আছে সে-সব দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কথাও কর্মসূচীতে ছিল, সে-সব দেশেরও যে সাংস্কৃতিক সাফল্য আছে এ স্বীকৃতিও ছিল। "The Party considers it necessary to expand the Soviet Union's cultural

relations with the countries of the socialist system and with *all other countries* for the purpose of exchanging scientific and cultural achievements and of bringing about mutual understanding and friendship among the peoples." সর্বশেষ বক্তব্য এই যে কর্মসূচীতে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, পার্টি বন্ধু, সামাজিক ও সাহিত্যিক সংগঠনকে সাহায্য করাই এর উদ্দেশ্য। 'নেতৃত্ব দেওয়া', 'পরিচালনা করা' প্রভৃতি তত্ত্ব বোধ হয় সজ্ঞানে কর্মসূচী থেকে বাতিল হয়েছিল।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে শ্রীক্রুশ্চভ সোভিয়েত সংস্কৃতি জগতকে, নতুন করে একতন্ত্রী বীণায় রূপান্তরিত করতে চাইছেন। ফলে কর্মসূচীতে নেই এমন তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন ব্যক্তিপূজার যুগকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। ক্রুশ্চভ বলেছেন: সোভিয়েত সংস্কৃতিজগতে নানামত, নানা-প্রবণতা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না এবং শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টি মেনে নেবে না কোনোদিন। সহাবস্থানের কথাটা ইরেনবুর্গ তুলেছিলেন। ইরেনবুর্গ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে বিপ্লবোত্তর লেনিনের রাশিয়ায়: "তৎকালে ছিল নানা সাহিত্যিক শিল্পীসম্প্রদায়ের ছড়াছড়ি: কমিউনিস্ট, ফিউচারিস্ট, ইমাজিনিস্ট, প্রলেটকাল্টবাদী, প্রকাশবাদী, উদ্দেশহীনতাবাদী, আকস্মিকতা-বাদী এমনকি কিছু-না-বাদী।...আমি সেই ফেলে-আসা সময়ের সমর্থনে দাঁড়াতে চাই।" ক্রুশ্চভ বলছেন: ইরেনবুর্গের এ-সব কথা লেখার মানে কি? স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের ঐ 'বামপন্থী' ধারাগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি রয়েছে এবং এই সবের সমর্থনে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। প্রশ্ন ওঠে: কাদের বিরুদ্ধে ইরেনবুর্গ এ সবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন? শ্রীক্রুশ্চভ উত্তরে বলছেন, স্বভাবতই আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? তার কারণ ইরেনবুর্গ চান যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' ও 'ফর্ম্যালিজম' পাশাপাশি অবস্থান করুক, আমরা "নানামত নানাপথ" বলে শিল্পে সহাবস্থান মেনে নিই।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বলছেন: "Peaceful coexistence in the field of ideology is treason to Marxism-Leninism, betrayal of the cause of the workers and peasants." কল্পনা করতে পারি রোষ-

কষায়িত নেত্রে পার্টির নেতা শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বলছেন: "রাজনীতিতে ঠাট্টার স্থান নেই।"

"Soviet Society has reached the stage now when complete, monolithic unity of the socialist peoples in the country, of all sections of the people—workers, collective farmers, intellectuals —who are successfully building communism under the leadership of the Leninist Party, has been achieved." এহেন এক-পাথুরে ঐক্যের সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বরসঙ্গতির সাধনার প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক, কেবল-ঐক্যের সমাজে নানা স্বরকে মিলিয়ে সমবেত সংগীতকে জাগিয়ে তোলবার প্রস্তাব কমিউনিজমের শত্রুদেরই প্রস্তাব। শ্রীক্রুশ্চেভেরই বাণী শোনা যাক।

"He who advocates the idea of peaceful co-existence in idealogy is objectively sliding down to the positions of anti-communism. The enemies of communism would like us ideologically disarmed. And the try to reach this perfidious aim of theirs through the propaganda of peaceful co-existence of ideologies with the help of the "Trojan horse" which they would gladly sneak into our midst." ফলকথা এই যে, সাম্যবাদ বিরোধিতার পিচ্ছিল পথ ধরেছেন এরেনবুর্গ, সমাজতন্ত্রের দেশের মানুষ হয়ে সমাজতন্ত্র-বিরোধীদের বুর্জোয়া দেশের পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা নিচ্ছেন। কি করে এমনটি সম্ভব হলো? ক্রুশ্চভ এরেনবুর্গের অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখাচ্ছেন যে, এ-রকমটি যে হবে তা ইরেনবুর্গের ঠিকুজিতেই ছিল। একদা ইরেনবুর্গ প্যারিসে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, লেনিনের সহানুভূতি ও সৌজন্যে লালিত হন। সেই আমলে তিনি পার্টিতে যোগও দেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি পার্টির সংস্রব ত্যাগ করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তিনি প্রত্যক্ষ কোনো অংশ গ্রহণ করেন নি, বাইরে থেকে দর্শকের ভূমিকায় অবস্থান করাটাই বোধ হয় তাঁর কাজ ছিল। আজ যে ট্রোজান অশ্বের ভূমিকা নিচ্ছেন ইরেনবুর্গ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর সব অধ্যায় সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর বহিরঙ্গ দর্শকের ভূমিকা থেকেই আসে।

ক্রুশ্চভ বলেছেন: নিঃসাড় দর্শকেরা বাস্তবতার বিচার করেন শুধুমাত্র আস্তাকুড়ের পূতিগন্ধ শুঁকে। মানুষকে তাঁরা কদাকার করে চিত্রিত করেন। মসীকৃষ্ণ রং ব্যবহার করে সোভিয়েত জীবনকে একপেশে, বিকৃত বিবর্ণতায় বিধৃত করেন।

"সোভিয়েত লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার এবং সমস্ত সৃজনশীল শিল্পের কর্মীদের কমিউনিজম স্রষ্টাদের সারিতেই স্থান নিতে হবে, পার্টির আদর্শ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ের জন্য প্রতিভা নিয়োজিত করতে হবে," এ দাবি জানিয়ে শ্রীক্রুশ্চভ সিনেমা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, শিল্প, সবেরই অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। শ্রীক্রুশ্চভের টীকা থেকে জানা গেল যে ইরেনবুর্গ মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে লেনিনবাদী শিল্প-সাহিত্যনীতির ব্যত্যয় ঘটাচ্ছেন, আর্নেষ্ট নেইজভেসংনির উদ্ভাবনীগুলি বীভৎস, বিকৃত—revolting, আলাবিয়ান ও সিমবির্‌ত্‌সভের কাগানোভিচ-প্রশ্রয়পুষ্ট সোভিয়েতের সামরিক থিয়েটারের স্থাপত্য আঙ্গিকসর্বস্বতারই হাস্যকর অভিব্যক্তি, এবং ঝুতোভস্কির যা এঁকেছেন তাতে সৃষ্টি হয়েছে দানব (monster); অর্থাৎ সোভিয়েত সাহিত্য-শিল্পের পদ্মবনে আগাছারই বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় সুরভিত পদ্মের খুবই অভাব। তাই যদি না হবে বিমূর্ত শিল্পীদের বিকলাঙ্গ, রক্তহীন বীভৎস উদ্ভাবনীর প্রদর্শনী হলো কেমন করে? কেমন করেই বা খুতাসিয়েভ নিজের মাথা থেকে 'সমস্যা' বানিয়ে তথাকথিত দুই পুরুষের সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত বাস্তবতার বিকৃতিসাধন করলেন? খুতাসিয়েভ যে রূপকাশ্রিত ফিল্মটি তুলেছেন তার ত্রুটি কোথায় আলোচনা করে ক্রুশ্চভ বলছেন:

I remarked yesterday that the sequence in which the hero meets the ghost of his father, who has been killed in the war, evokes grave objections on points of principle. When the son asks the ghost how he ought to live, the ghost in turn asks the son how old he is. Hearing the son say 23, the father says he is 21…and vanishes.

প্রশ্ন হবে, ঐ চিত্রে নীতিগত আপত্তিটা কোথায়? আপত্তি আছে। শ্রীক্রুশ্চভ বলছেন—এটা কি বাস্তবতা সম্মত হলো?

"No one will ever believe that! It is common knowledge that even animals don't abandon their offspring. If you take

a puppy from its mother and throw it into water, she will at once dash in at the risk of her own life to save it.

Can one indeed believe that a father would not answer his son's question and help him by advising him how to find the correct and proper road in life ?" দেখুন চিত্র-প্রযোজক বাস্তবতাকে কতভাবে বর্জন করেছেন। প্রেতাত্মা বাস্তব সত্য নয়, অথচ ফিল্মটিতে প্রেতাত্মার আমদানী করা হলো। পুত্রের বয়স যেখানে তেইশ সেখানে প্রেতাত্মার মুখ থেকে নিঃসৃত হলো—"আমার বয়স একুশ"। এ তো সম্ভবই নয়। তারপরে দেখুন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে প্রযোজকের কি আত্যন্তিক অবজ্ঞা! পুত্রের যে মৌলিক প্রশ্ন—"কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার জীবনযাপন করা উচিত"—সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই পিতার অশরীরী অত্মার অন্তর্ধান। শ্রীক্রুশ্চভ বলছেন, "এই রূপকাশ্রয়ী ফিল্মটির তাৎপর্য আরও গভীরে। আমরা সেই তাৎপর্যটি ধরে ফেলেছি।"

"There is more to this that meets the eye. There is a definite meaning to this. The idea is to impress upon sons that their fathers cannot teach them in life, that there is no point in asking them for advice." এবং সব থেকে মারাত্মক কথা হলো, ফিল্ম প্রযোজকেরা বলতে চান যে যুবকেরা নিজেরাই জীবনের ঔচিত্যানৌচিত্য খুঁজে নেবে, বর্ষীয়ানদের উপদেশ ও সাহায্যের অপেক্ষা না করে।

"In the opinion of the film-makers, young people ought to decide the question of how they should live by themselves, without asking their seniors for advice and help."

ফিল্ম-সমালোচক শ্রীক্রুশ্চভের নির্মোক স্খলিত হলো, আবির্ভাব হলো পার্টি-নেতার। তিনি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: "But haven't you gone too far ? Do you really want to set youth against the older generations, make them quarrel, and introduce discord into the big friendly Soviet family which welds both young and old in the joint struggle for communism ? ফলে রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ দিলেন: "You can't do such things. Comrades, simply you can't."

অবশ্য মস্কো থেকে জনৈক বাঙালী সাহিত্যিক রিপোর্ট করেছেন: "এবারকার 'হস্তক্ষেপে' অন্তত ব্যক্তিগত হুকুম ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভিযোগ করতে পারে না কেউ।" এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে শ্রীইলিচভের ও স্বয়ং শ্রীক্রুশ্চভের হুকুমনামার উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি। আমরা এও জানি ইতিমধ্যে সমালোচিত শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তমঃ থেকে জ্যোতির রাজ্যে অগ্রসর হচ্ছেন! বর্ষীয়ান ইরেনবুর্গ 'আগে তো বেঁচে থাকা তারপর চিন্তা করা' এই নীতির অনুসরণ করে পার্টি-পিতাদের জানিয়েছেন "আমি মতাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাটা ঠাট্টা করে বলেছিলাম।" কেন্দ্রীয় কমিটির মূল বক্তব্যের সঙ্গে 'একমত' হয়ে বক্তব্যকে স্বাগত করছেন সাহিত্যিকেরা। ভজনিসিয়েনাস্কি 'আত্মসমালোচনা' করে বলেছেন: "আমি শ্রীক্রুশ্চভের পরামর্শ সত্যিই গভীরভাবে নিয়েছি।" কবি ইয়েভতুশেংকোও পিছিয়ে থাকেন নি। তিনিও তাঁর 'ত্রুটি স্বীকার' করে নিয়েছেন। (শ্রীননী ভৌমিকের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

এখন কিছুকাল অশ্রুপাত ও আত্মসমালোচনার পালা। আশা করি যে 'মনোলিথিক' ঐক্যের দেশে কিছুকাল আবার আকাঙ্ক্ষিত মনোলিথিক ঐক্য সংস্থাপিত হবে। ঝানভ মৃত, ঝানভ দীর্ঘজীবী হউন।

পাঁচ

সোভিয়েত দেশের শিল্প-সাহিত্যচর্চা অধুনা যে নতুন বিপদের সম্মুখীন, সেই বিপদকে লঘু করে দেখাটা বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা মানুষের ভবিষ্যৎ আজ বহুল পরিমাণে সোভিয়েত ও আমেরিকার কাজের উপর নির্ভরশীল। হয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়তো সামগ্রিক ধ্বংস—এই দুই বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বিশ শতকের মানুষ। আভ্যন্তরীণ নীতিতে কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামি, ক্রমবর্ধমান 'শ্রেণীসংগ্রাম'—আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', এ-হেন অসঙ্গতি দীর্ঘকাল চলতে পারে কিনা সন্দেহ। এবং সত্যিই বিস্মিত হই যখন দেখি, যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা সহাবস্থানের অনিবার্যতায় বিশ্বাসী, তাঁরাই স্বদেশে এক পাথুরে একতার জয়ধ্বনিতে মুখর। এর ফলে, সহাবস্থান-নীতির নৈতিক-মানবিক গুরুত্বের যে হানি হয়, কৌশল ছাড়া যে এ-নীতির কোনও সার্থকতা চোখে পড়ে না, কুশলী রাজনৈতিকদের ঐ সহজ সত্যটা বোঝা উচিত। মতাদর্শের ক্ষেত্রে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'

অগ্রাহ্য বলে সোভিয়েত দেশে যদি জেমসের কিম্বা ডিউয়ির দর্শনকে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয়, বুর্জোয়া দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়, তবে যখন কোনও নতুন ম্যাককার্থি এসে আমেরিকায় সমাজতন্ত্রকে নিষিদ্ধ করবেন, মার্কসের ক্যাপিট্যাল ও অন্যান্য গ্রন্থকে বে-আইনী ঘোষণা করবেন, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহাবস্থানের আবহাওয়া যে দূষিত হবে না একথা জোর করে বলার উপায় নেই। তাছাড়া, ভাষার মতো শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও শ্রেণী স্বার্থাতীত সর্বকালীন বিস্তার আছে, বিশেষত মহৎ শিল্প-সাহিত্যের। ফলে তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' শিল্পে যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্যের প্রভাব আছে, এবং তথাকথিত 'বুর্জোয়া শিল্পে'ও বাস্তবকে শিল্পভাত করবার প্রশ্নও দেখা দেয়। বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা এসে মেশে, সেই ধারায় লেবেল-আঁটা 'বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি' বিশুদ্ধ আর্যের মতোই একেবারেই মিথ্যা, প্রপ্যাগাণ্ডার জগতে ছাড়া যার অস্তিত্ব নেই।

তবুও সোভিয়েতকে এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় কেন, ছুঁৎমার্গের অতি সংকীর্ণতাকে সমাজতন্ত্রের সারবস্তু বলে প্রচার করতে হয় কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন। কেন সোভিয়েতের দর্শক ও পাঠক-সাধারণকে এখনও সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কেরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন, সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সোভিয়েত জনসাধারণ সম্পর্কে আজও কমিউনিস্ট পার্টি এত দ্বিধাগ্রস্ত কেন, এ সমস্যারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এবং রাষ্ট্রনায়ক ও পার্টি-নায়কের মতামত প্রকাশিত হলে, কেন সোভিয়েত দেশে, আজও, শিল্পী-সাহিত্যিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, "আত্ম-সমালোচনা"য় মুখর হন, এ সমস্যার গভীরেও যাওয়া প্রয়োজন।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার নিরাকরণ করে যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হলো ১৯১৭ সালে, সেই সমাজে আজও প্রবুদ্ধতার (Enlightenment) আবহাওয়া তৈরি হলো না, ভীত-সচকিত অস্তিত্বের গ্লানি বহন করে চলল মানবাত্মার কারুকর্মীরা (স্তালিনের ভাষায় engineer of the human soul ; শ্রীক্রুশ্চভ এবার বলেছেন smith)। সেই আত্মচ্যুত, প্রাণভয়ে ভীত, সাহিত্য-শিল্পস্রষ্টাদের করুণ কাহিনী ইরেনবুর্গ লিখেছেন। কিন্তু কেন এমন হলো? কেন এবারেও সোভিয়েত সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রকাশক্ষম অংশ পার্টি-নায়কের ভ্রূকুটির পরই আত্মসমর্পণ করল? মানবাত্মার ভাস্বর রূপ কোথায় প্রত্যক্ষ করলাম? মার্কস বলেছিলেন, "doubt everything"। মার্কসের ঐতিহ্যগরবী সমাজতন্ত্রের দেশের দাবি "প্রশ্ন করো না, সংশয় ও জিজ্ঞাসা পাপ।" (শ্রীক্রুশ্চভ বলেছেন "Scepticism, weak will and slackness, pessimism and a nihilistic attitude to reality are alien to Soviet people")।

মার্কস লিখেছিলেন : "Prometheus is the chief saint and martyr of the philosophical calender"। দেবতার অভিশাপকে বরণ করে, অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে, প্রমিথিউস মানবকল্যাণে তিল তিল করে আত্মদান করেছিলেন। কবি বাইরন তাই লিখেছিলেন :

"In the endurance and repulse
Of thine impenetrable spirit,
Which earth and heaven could not convulse.
A mightly by lesson we inherit."

কি সেই মহামন্ত্র? মানবাত্মা অজেয়, অপরিমেয়। মানবচৈতন্যের ঐশ্বর্য কোনো দেবতার পায়ে বিকিয়ে দেওয়া চলে না। এই মহামন্ত্রের সাধক হিসাবে মার্কস বহু জায়গায় প্রমিথিউসের বন্দনা করেছেন। অথচ মার্কসীয় ঐতিহ্যের পতাকাবাহী সোভিয়েত সমাজে কোনও 'প্রমিথিউস' সৃষ্টি হলো না আজও। রাষ্ট্রদেবতার এবং পার্টি-দেবতার পায়ে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বারবার মাথা নত করলেন। শ্রীক্রুশ্চভ বলছেন, শুধু যে আজ ব্যক্তি তার নির্বাধ স্বাধীনতা পাবে না তাই নয় (নির্বাধ স্বাধীনতা—absolute freedom দাবি করেছে কে?) কমিউজম যখন পূর্ণতা লাভ করবে তখনও ব্যক্তি নির্বাধ স্বাধীনতা পাবে না। "I consider that never, not even under complete communism, will there be absolute freedom of the individual.") এ সমাজেও 'পরিচালনা' ও 'সঞ্চালনে'র প্রশ্ন থাকবে, ফলে নির্বাধ স্বাধীনতার প্রশ্ন কোনোদিনই উঠবে না।

আগেই বলেছি এ সমস্যা গুরুতর। মার্কস ভেবেছিলেন আর্থিক শোষণ-মুক্ত সমাজে মানুষ শুদ্ধতা ও পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবে, নতুন সমাজে মানুষের অপরবশ্য, ভাস্বর রূপের হবে প্রকাশ! তখন মানুষের জীবনকে ও চৈতন্যকে সঞ্চালিত করবার প্রশ্ন থাকবে না, থাকবে শুধু বস্তুসম্ভারের উপর কর্তৃত্ব ও তদারকি—administration of things। অথচ বর্তমান সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক নির্বিকারচিত্তে বলছেন—"Not only socialist system, even the

smallest collective of people, cannot exist without the principle of organisation and *direction*······And in our time of the atom, electronics etc., it is all the more necessary to have harmony, the best possible co-ordination and organisation *in all the links* of the social system, both in the field of material production *and that of spiritual life.*"

বিশ্বমানবতার মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র জন্মলাভ করেছিল, সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের যৌবনোত্তর কালেও ব্যক্তি-মানবিক সত্য সম্পর্কে তার অশালীন উপেক্ষা কেমন করে সম্ভব হলো, কোন দর্শনপ্রতীতি থেকে শ্রীক্রুশ্চভের অপ্রচ্ছন্ন সমষ্টিতান্ত্রিকতার জয়গান উদ্গাত হলো, এ আলোচনা না করলে সোভিয়েতের শিল্পচর্চার বিভ্রাটের স্বরূপ বোঝা যাবে না।

সোভিয়েত মার্কসবাদীরা বলেন যে, মার্কসীয় দর্শন ক্লাসিক্যাল জার্মান দর্শনের উত্তরসূরী। অথচ এই দর্শনের প্রবুদ্ধতার যে-সংজ্ঞা, সে-সংজ্ঞা সোভিয়েত মার্কসবাদে অস্বীকৃত। 'Foundation of the Metaphysics morals'-এ ইম্যানুয়েল কাণ্ট প্রবুদ্ধতা (Enlightenment) প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

Enlightenment is man's release from his self-incurred tutelage. Tutelage is man's inability to make use of his understanding without direction from another. Self-incurred is this tutelage when its cause lies not in reason but in lack of resolution and courage to use it without direction from another. "Have courage to use your own reason"—that is the motto of enlightenment.

Laziness and cowardice are the reasons why so great a portion of mankind, after nature has long since discharged them from external direction, nevertheless remains under lifelong tutelage, and why it is so easy for others to set themselves up as their guardians. It is easy not to be of age. If I have a book which understands for me, a pastor

who has a conscience for me, a physician who decides my diet, and so forth, I need not trouble myself. I need not think······

স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা—চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতার দাবি করা—এত কঠিন, বন্ধুর পথপরিক্রমারই সামিল। কাণ্ট্ বলেছেন, সত্যিই তাই। শুধু তাই নয়। "After the guardians have first made their domestic cattle dumb and have made sure that these placid creatures will not dare take a single step without the harness of the cart to which they are tethered, the guardians then show them the danger which threatens if they try to go alone. Actually however, this danger is not so great, for by falling a few times they would finally learn to walk alone. But an example of this failure makes them timid and ordinarily frightens them away from all further trials." ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই বক্তব্যের আধুনিক স্বাদ সত্যিই অসামান্য। নায়কিয়ানার চরিত্র বিশ্লেষণে এবং নায়কিয়ানায় অভ্যস্ত সমাজের মানুষের দুর্গতির রেখাচিত্র অঙ্কনে কাণ্ট বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষ প্রমিথিউসের উত্তরাধিকারী, তার পথ দুর্গম ও ক্ষুরধার, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এ দুর্গমতার লাঘব নাও হতে পারে। পার্টিয়তা ও জনীনতার নামে মানবস্বরূপের শৃঙ্খলিত অবস্থা যে বিলম্বিত হতে পারে, ব্যক্তিত্বের আনন্দময় প্রকাশ ব্যাহত হতে পারে, নায়কিয়ানার উদ্যতদণ্ড শিল্পী-সাহিত্যিককে পথভ্রষ্ট করতে পারে, ইতিহাস তার সাক্ষী। তবুও মানবাত্মার অপরিমেয় ঐশ্বর্যে আমরা আস্থা রাখি এবং সেজন্যে সমাজতন্ত্রের বিকৃতাবস্থায় আমরা যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হই। এই বিকৃতির কারণানুসন্ধানের চেষ্টা প্রসঙ্গান্তরে করবার ইচ্ছা আছে।

[সোভিয়েত শিল্প বিতর্ক সম্বন্ধে এই সংখ্যায় দুটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হলো। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক সোভিয়েত নীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে যা বলবার আছে এই রচনা দুটিতে মোটের উপর তা প্রায় সবই বলা হয়েছে। এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা আমরা প্রকাশ করতে প্রস্তুত। কিন্তু যেহেতু পরিচয়-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা সীমাবদ্ধ তাই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাঁরা এই আলোচনায় যোগ দিতে চান তাঁরা এই কথাগুলি যদি মনে রাখেন এবং তাঁদের বক্তব্য অনধিক চার-পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে আমরা বাধিত হব।

—সম্পাদক, পরিচয়]

উচ্চকিত মাঠ ছাড়াতেই ॥ অরুণ মিত্র

উচ্চকিত মাঠ ছাড়াতেই
আমরা এত কাছে,
প্রতিধ্বনির চক্র থেকে বেরিয়ে আসার পর
আমাদের ধমনী শুনছি ;
আমরা স্পর্শের নির্জনে নেমেছি,
কাঁচামাটি আর ঝাউ দেবদারুর সন্ধ্যায়
আমরা প্রবেশ করেছি,
ছায়ায় আমাদের মুঠো খুলেছি,
এবার একবার গাঢ় পুকুরে
আমাদের হাত পা মুখ ধুয়ে নেব।

বিস্তর কথা জমায়েতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
তাদের অর্থ পরিষ্কার ছিল না
কিন্তু তারা ঝড়ের মতো
আমাদের উদ্দাম নাড়িয়েছিল,
কুটিকুটি রোদের ঘূর্ণিতে
আমরা ঘুরছিলাম ;
তখন এক মুহূর্তও ভাবিনি
এই প্রতিশ্রুত সময়ে আমরা ফিরে আসব
বাতাসে আমাদের মুখ তুলেছি,
মনে হয় বৃষ্টি হবে ;
আমরা বৃষ্টি আর শীকরের কাছাকাছি,
আর একটু হাঁটলেই গাঙ
সেখানে আমাদের জন্যে একলা
তন্দ্রাহীন নৌকো দুলছে।

যখন তোমার মুখ ॥ রাম বসু

বিকালে তোমার মুখ হয়ে গেল পশ্চিম আকাশ। আমি মর্মরিত দেবদারু। সন্ধ্যাকে সাজাতে তুলে দিলাম সব আভরণ। নিজের জন্যে কিছুই রাখি নি আর। আমার নিঃস্বতা তোমার পায়ের নিচে গোধুলির স্বর্ণরেখা নদী।

হে বাতাস, হে অন্ধকার, পৃথিবীর পরিণতি, শব্দের হীরক-আধারে হাসির ওপচানো নিঃশব্দ অস্তিত্বের দিকে বিকশিত। আমি তাকে ধরতেও অক্ষম।

হে শিথিল গ্রন্থি সময়, হলুদ ধুলোর রেণু বিছানো সবুজে। শিরার জটিল বাগানে রক্তের প্রথম আদেশ সঞ্চারিত শস্যের ভিতরে। আমি যা গড়ি তা এক নিভৃতের পান্নার কোরক।

যখন তোমার মুখ বিচ্ছুরিত পশ্চিম আকাশ।

দূরতম স্বপ্নের সীমান্তে প্রীত-মুদ্রা হাতের উদ্ভাস যেন ঢেউ-এর চূড়ায় থাকা ঝলসানো শাঁখ। চেতনার বাইরের বিপুল কল্লোলে আমি উচ্চারিত তোমার বন্দনা।

হে আদি তমস্বিনী মাতা, জল, এই অস্থির নিভন্ত গ্রহে মৃত্যুর বিষাদ নূনে ও গোলাপে মিশে আছে। আমি কাঁদি জংলা ঘাসের ঝোপে ওই ভাঙা মূর্তির কিনারে ;—যে কান্না আমার সমভূমিতে ঋতুবদলের পথ করে দেয়।

আমার শৈশব, শ্যাওলা, গন্ধের অপরিমেয়তা নির্দোষ উপকূলে অকর্ষিত মাঠের সঙ্গে খেলা করছে। স্মরণ-ভূষিত মহাকাশে তোমার চোখের মণির মত দ্যুতিময় তারা আমাকে চিরকাল আবৃত করুক জংলা-ঘাসে, ওই ভাঙা মূর্তির কিনারে। আমার নীরবতা তোমার পায়ের নিচে স্থির রূপকথা।

যখন তোমার মুখ উচ্ছ্বসিত পশ্চিম আকাশ।

রোগিণীরা ॥ সিদ্ধেশ্বর সেন

বিকেল। আলোয় শয্যা ভেসে আছে
পর-পর

প্রত্যেক বেডের তুঙ্গে নারী, প্রত্যেক বেডের তুঙ্গে নারী
তাদের অন্তর

যে সব কীটের প্রবেশের
পথ হয়ে আছে, আরো

বেশী সংক্রমণ হয়ে, তারপর
অন্ত্র ও অন্তর, ক্ষয় হয়

ক্ষয়, পাণ্ডু-বিকেলের এতকাল এমন চলিত ক্ষয়
নিদারুণ পরিণাম চেয়ে চেয়ে, ক্ষয়

আমি তার জন্মঋণ, রক্তঋণ, নিগূঢ় তর্পণ বাড়াবো না আর
আমি তার নিজের বিবেক
হয়ে যাব, যদি
হয়ে যেতে পারি, এই বার

হয়ে যাব মুসম্বীর
রস
গেলাসের কাঁচে টলমল, স্বাস্থ্যের মতন উজ্জ্বল

হয়ে যাব বেদানা, নাস্পাতি
দ্রাক্ষাসার
নারঙ্গীর ত্বক অবিকল

এক-এক দিন স্বাদু সুপথ্যের মত বিকেলে আলোয় ভাসা ঘর, ধবধবে

শয্যার উপর
শুশ্রূষার পার্শ্বচর, হব

বিকেলের আলো এসে ওয়ার্ডের, সব
ঘরদোর
ছড়াছড়ি করে যেতে পারেনি'ক
আরোগ্যের পরিসর ততোধিক, নয়

এখনো এ সমাজের
শুশ্রূষার কাজ ধৃষ্ঠ অবহেলা সয়ে
বাঁচে, সয়

কোনোদিন আরো বড় পরিসর, পরিসর
পাওয়া যাবে নাকি,

আকাঙ্ক্ষার কথা মুখে ধরে
বিকেলের সিঁড়ি
ভেঙে
স্টাফ-নার্স ওঠানামা করে

নার্স-সিস্টারদের ওঠানামা আজীবন, হাউস
সার্জনদের ছায়ায়

কতজন নিরাময় হয়ে
ঘরে ফেরে
বিকেলের ব্যবহার কত, যা হারায়

সব উত্তর খুঁজিনি হাসপাতালে জিজ্ঞাসার
হাসপাতাল থেকে
আমি বড় আরোগ্যশালার স্ফীত ভিড়ে, এ প্রশ্নের জট
গায়ে ঠেকে

সমাজের প্রবল হিতৈষী
বহু, সমাধান

বাস্তব সুফল, কই, দিল না'ক

দেবে না'ক
সমাজের ক্রম-বিবর্তন যতদিন আরো, সুস্থির-সঙ্গত
নাকি, ন্যায়ে, প্রচলিত হয়

কিম্বা পরিবর্তনের ধাঁচ, আরো না জোরালো
দেখা দেয়

পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মে, তবু
রয়ে গেছে
কোন্ আলো চিরকাল—
চিরকাল
অনেক আলোর মধ্যে ছায়া
বিবর্তিত হয়
অনেক ছায়ার থেকে আলো উপচার

এই সংঘাত-পুনঃস্থিতি
বস্তু প্রকৃতির, তারপর
সামাজিক আধারের কাছে

আরো বড় আধারেও এই কাজ আরব্ধ হয়েছে

বিকেল। আলোর কমলা
লেবুর কোয়া ফেটে, গড়িয়ে
গড়িয়ে পড়ছে
শয্যাগুলি ঠেলে দূর অন্ধ ঘোর, তাম্র-
বর্ণের তিমিরে

রোগিণীরা শুয়ে আছে আমাদের
মায়ের মতন
আমারই মায়ের মতন

সমস্ত পটের পরিবর্তন ; তিমির-জোড়া
এক ঘর
রোগিণীরা সরে আসে অগ্রবর্তী ছায়ার ভিতর, এই ঘরে

কিম্বা প্রাচীন, প্রাচীন ছায়া, পৃথিবীর
আদি জলাধার

জলাধার পড়েছিল, শ্যাওলায়
প্রোটোজোয়া
কোটি কোটি বছরের জীবকোষ, গঠনের
স্তর পার হয়ে, ছিল

পৃথিবীর তিনভাগ জলাধার
ছেড়ে
জীবন ভূভাগ ধরে উঠেছিল, ফের

বড় বড় অতিকায় ডিনোসর, সরীসৃপ একদিন
আদিম অরণ্য চষেছিল
উড়ন্ত-বাদুড় থেকে ড্রাগনের ডানা, আরো
ভয়াবহ ছিল

তবু, সব ভয়াবহ রাত নিজের নিয়মে
কেটে যায়

মানুষ, অপরিণত যূথ থেকে, সমাজের
দিকে অগ্রসর হয়ে
একেক সমাজ থেকে সভ্যতায়
প্রাক-ইতিহাস থেকে ইতিহাসে, ক্যারাভ্যানে মরু
পারাপার হতে গিয়ে, ফের
শতাব্দী হারায়

আর কত শতকের বাতাস আমাদের নিশ্বাস
গ্রহণের আগে বয়ে যাবে

পৃথিবীর গোলা-বারুদের ভাঁড়ার, সে কতবার
অপরিহার্য বা গণনীয় হবে

নৃপতিরাজন্যবর্গ গেলে যারা থাকে
একপতি
একচ্ছত্র কার্টেলের, গিল্ড, পুঁজিপূজক প্রভৃতি
স্মরণীয় ভোরগুলি ছত্রিশ-পয়েন্টে
ভাঁজে মুড়ে, সেধে যায়
প্রত্যহ ও দৈনিকের বীভৎস, উলঙ্গ তেজারতি

অথচ অজস্র লোক, আরও অনেক শুয়ে
প্রতিদিন, হাসপাতাল,
অসংখ্য নরনারী সংশয়ের, ভয়ের
চোখ, চায়

হাসপাতাল, ওয়ার্ডের ঘর ভরে গেলে,
স্থান নেই, স্থান নেই বলে
অদৃষ্ট চাপড়ায়

স্থান নেই, স্থান নেই
পৃথিবীতে মানুষের শুশ্রূষার স্থান নেই স্থান, নেই, আছে
রিরংসার—
রিরংসার ছাউনী-ব্যারাক, বেড়ে যায়

হাসপাতাল বেশি নেই, সঙ্কুলান
নেই
অনেকেই পঙ্গু হয়ে নিজের ঘরের বিছানায়
প'ড়ে
নিচু ঘরে
ঘর নেই, ছাদ, ছাদের ওপারে কার্নিশের
ধারে আকাশের হাতছানি, নেই

স্যানাটোরিয়ম, কিম্বা কিছু
নেই পাথেয়, বাঁচবার

এই সব পাথেয় পৃথিবীর অঢেল ভোগ
করবার
ঐশ্বর্যভাণ্ডার বলে কথা হয়েছিল, কবে
(কথা হয়েছিল সেই ভোরবেলা, আজ দ্রুত
বেলা পড়ে গেছে)

রোগিণীরা শুয়ে আছে নিজেদের
আচ্ছন্ন-শয্যায়
স্টাফ-নার্স ওঠানামা করে
ঘড়ি ধরে টেম্পেরচর, টেম্পেরচর চার্ট
তুলে নেওয়া হয়

রোগিণীরা শুয়ে থাকে আমাদের
মায়ের, ভাইবোনস্বজনের, আমার
মায়ের মতন

স্বাস্থ্যপ্রদ ফল, আমি
ফলের নির্যাস
হয়ে বয়ে যেতে চাই এই স্নায়ু, পীড়াপ্রদাহের শোণিতের কাছে

এক দণ্ড, অনু,—পল, এক যুগ
একেক শতাব্দী
আমি শুশ্রূষায় রত হতে চাই

শুশ্রূষার চেয়ে আর আজ কী বিপুল সত্য,—এই
শতকের মুখ চেয়ে, আছে ॥

স্বরচিত নির্জনতা ॥ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

স্বরচিত নির্জনতা, স্বহস্তসজ্জিত নির্জনতা
তুমি আছো পার্শ্ববর্তী তুমি আছো কী অপূর্ব সুখ।
বাইরে উন্মাদ হাওয়া বইছে বহুক।

পুষ্পবনে প্রলাপের ঝড়।
পল্লবেরা মৃত নাকি বিস্মৃত মর্মর!
কণ্টকের অবশ্যই নেই কোনো সঙ্কটের ভয়
তাই তাকে এত বেশি তৃপ্ত মনে হয়।
যে সব কুসুমগুলি মহত্তম আন্তরিকতায়
পৃথিবীতে নিজেদের স্নিগ্ধতার সৌন্দর্যের সুষমার রূপায়ণ চায়
কেবল তাদেরই মুখে শোকচিহ্ন
চোখে অশ্রু ফুটে আছে বুঝি
ফুটেছে ফুটুক।
বাইরে বর্বর হাওয়া যদি ভাবতে চায়
বিশ্বটাকে ভরে দেবে রক্তে রণে বিশৃঙ্খলতায়
ভাবে তো ভাবুক
নির্জনতা
সযত্নসৃজিত নির্জনতা
তুমি আছো পার্শ্ববর্তী কী অপূর্ব সুখ।

হায়, অবিশ্বাসী ॥ তরুণ সান্যাল

কারা পিছে দুন্দুভি বাজায়, ফিরি না, চিবুকে ছায়া নড়ে
কেমন জটিল শাখা জড়াজড়ি এমন জঙ্গলে :
আরো যদি যেতে হয়, যাবো, পথে কাকে মনে পড়ে
কারা পত্রসঞ্চালনে মর্মরে কাহার কথা বলে !

দুঃসময় যত বড় হোক, আমি মানি না চোখের রক্তিমতা
ঢের দুঃখ জানা আছে সভ্যতার জন্মের নাড়িতে :
ভ্রান্তিগুলি সময়ের দূরব্যাপী বক্রতায় লতা
ক্বচিৎ সার্থক ফুল ফেটে ওঠে স্তবকসারিতে।

ঘাড়ের পেছনে রয় পাহাড়ের ঢালে মাটি, নেশা
সজীব ঘাসের গন্ধে শিশিরে আর্দ্রতা :
সমুদ্রের ফেনকষে অশ্বারোহী বাহিনী ও হ্রেষা
দেহের অঞ্জলিপাতে শ্রম বিন্দু, বিস্ফারিত কথা।

আমি ঢের বক্ররেখ পথপুঞ্জ পার হব জানি
ইতিহাস ঋজু চলা নয় কিছু, ধাঁধা আসে বাঁকে,
যেমন বাঁকানো ছোট বড় পঙক্তি শব্দধ্বনি, মানি
অনিবার্যতায় স্ফুট আশ্চর্য উত্তীর্ণ কবিতাকে।

উপলক্ষ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পথে অজগর ডবল ডেকার, সেই অজুহাতে
তোমাকে ধরবো দুহাতে।

দয়িত ব্যতীত কিছুই দেখতে পাও না দুচোখে,
কাছে টানি সেই সুযোগে।

'দৃশ্য বদল ভীষণ জরুরি, আর, নিসর্গে'—
বলে নিয়ে যাই পার্কে।

আকাশে মস্ত শূন্য পরিখা, তাই তো রক্ষে :
চুম্বন রাখি চক্ষে।

বিনা অছিলায় যে-মেয়ে আমার সঙ্গে মিশতো
তার ঠোঁট উচ্ছিষ্ট।

মেঠো হাওয়া—তা-ও এখন ক্বচিৎ সহজলভ্য,
পায় শুধু একলব্য,

যে একলব্য সন্ধানে থাকে, ঈশ্বর ছাড়া
যার বুকে হা-হা সাহারা

ব্যথায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, যার উপাস্য
নয় জীবনের পাচশো

তরল দেবতা, যার উপাস্য মাত্র একটি
অনধিগম্য ব্যক্তি,

তারি 'পরে নামে মাঠের ঈষৎ বাতাস হঠাৎ,
পরক্ষণেই প্রতিবাদ

ক'রে স'রে যায় ; তবে তুমি আর প্রভু পরোক্ষ···
ক'মাত্রা পার্থক্য ?

পরোক্ষ প্রভু (ঈশ্বর), তুমি (অনীতা)—কতোটা
স্বতন্ত্র দু'টি সত্তা ?

স্বতন্ত্র হলে সে-প্রভু তোমার চেয়েও হাজার
গুণে উপাসনাযোগ্য—

নাকি তুমি এক দারুণ অছিলা বিধাতা পাবার
অলজ্ঘ্য উপলক্ষ ?

মঞ্চ ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

এই যে মশাই শুনছেন। টিকিটটা, ও মশাই !

একেবারে ট্রামের বাইরে লোকটা খোদার নামে হাওয়ায় ঝুলছিলো
পতাকার মতো পায়রার মতো উড়ছিলো একটা পা···
হঠাৎ ঝাঁকি মেরে, হঠাৎ-ই, ফুটবোর্ড থেকে ঝটকায় ম্যাজিকের চালে
একদম ম্যাজিকের চালে লোকটার পা-হাত-পা
এইমাত্র যাট্, যাট্, আলাইবালাই
পাশের গলির গর্তে পিছলে গেল অন্ধকারে ঝাঁপ দিলো,
মানে, ডুব দিলো।

কী আশ্চর্য টিকিটটা না-কেটেই
কী আশ্চর্য টিকিটটা না-কেটেই
টিকিটটা না-কেটে, কী মশাই, ও মশাই
টিকিটটা ?
বাহ্ রে, সাবাস পাঠ্ঠা
(অর্থাৎ, চালাক খুব চালাকচতুর)
আপিস-ফেরৎ-মুখে ফতুয়ার পকেটে ফতুর
টিকিট ছাড়াই চড়ে সি, টি, সি-র গাড়ি !···ফোরটোয়েন্টির ঠাট্টা ?

এবং সে একটুও দেরি-না-করেই তড়িঘড়ি বের করলো বিড়ি
উড়ের দোকানে থেমে নিচু হয়ে চেয়ে নিলো একছিট বিড়ির আগুন,
ফাঁদা ধুতিকামিজের ভিতরে লুকানো ছিলো ঈশ্বরের ঢাউস উনুন।

কীটদষ্ট আনাজের থলি হাতে ক্ষণকাল পিছনের রাস্তায় হাঁ-করে
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ট্রামটাকে চলে যেতে বিলকুল পাকা-লাইন-ধরে ;
তারপর সটান হেঁটে উঠে গেল জ্যোৎস্নায় তারায় আরো উপরে উপরে—

টিকিট ছাড়াই তার সামনে খোলা ছিলো গগো-ঠাকুরের সিঁড়ি।

কলকাতা

দেবেশ রায়

শেয়ালদা স্টেশনে সময় কাটাবার সবচেয়ে ভালো উপায় উদ্বাস্তুদের ঘর-সংসার দেখা ও দুঃখবোধ করা ও সাতচল্লিশ সালের ভারত-ইতিহাসের ওপর কিছুক্ষণ হাত রাখা। একটি প্রাচীন ক্ষত থেকে রক্ত-ক্ষরণের তাজা চিহ্ন। আমি তাই দেখছিলাম।

চরিত্র নষ্ট হয়েছে সন্দেহ করে লোকটি ফুটপাথের ওপরই বেদম মেরেছে বৌটিকে। এখন বসে বসে হাঁপাচ্ছে। বৌটি কাঁদতে-কাঁদতে বলছিল, লোকটি আগে নাকি এ-রকম ছিল না। লোকটির বুকের খাঁচা দেখে মনে হয়, হাটে-হাটে নৌকা বাইত কিংবা মুনিষের কাজ করত। লোকটি এবং বৌটিকে ঘিরে ধরে এক দঙ্গল লোক।

ঠিক তার পাশেই ভাইবোনের মতো কয়েকজন বসে বসে পথের আলোতে বাঘবন্দী খেলছিল। দেখে, তাদের সেই স্বাভাবিকতা দেখে, আমার সাধ হলো অপুকে সংবাদটা জানাই: মানবতার জয় হবে। অপু বিশ্বাস করে মানবতার জয় হবেই এবং এ-ধরনের যে-কোনো সংবাদে খুশি হয়।

একদিন কলুটোলায় বিরাট এক শোভাযাত্রার আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে দেখি সারাটা কলুটোলা জুড়ে মানুষ আর মানুষ আর লাল ত্রিকোণ নিশান। সারাটা মিছিল বুক-চাপড়ে কোনো এক শোকের সহস্রবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। অথচ শহিদদের নাম হাহাকারের মতো মাটিতে মিশে যাওয়ার বদলে উল্লাসে আকাশে ভেসে যাচ্ছে। বিস্মৃত সেই শোকদিবসের দেহহীন কফিন নিয়ে চলমান মোহরমের শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে অপু শক্ত মুঠিতে রেলিঙটাকে চেপে ধরেছিল এবং পাঞ্জা-লড়ার সময় যেমন শিরা আর হাড়গুলো চামড়া ভেদ করে ওঠে, তেমনি তার দু-হাতের আঙুল আর কব্জিগুলো শরীরের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। স্বগতোক্তির মতো অপু বলেছিল—"আর যদি এটা বিপ্লবের মিছিল হতো, যদি এটা"—অপুরও বিশ্বাসের রঙ লাল।

একবার কোনো এক ভোটে অপু ছ-ছটা জাল ভোট দিয়ে সপ্তমটির বেলায় ধরা পড়েছিল। না-খেয়ে-দেয়ে সারাদিন তাকে সেই বুথে বসে থাকতে হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের আড্ডায় এসে একটা মাংসের চপ কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে, এক গ্লাস জল ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে দোকানিকে পয়সা শোধ করে অপু আমাদের কাছে গল্প বলছিল।

এক আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে আর এক আত্মীয়কে টেলিগ্রাম করে রাত একটা দেড়টার সময় সি-টি-ও থেকে ফিরছিলাম। জাপানী চিত্রকরের আঁকা "পূর্ণিমা রজনীতে রাজধানী (সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর)"—এই প্রকার ছবির মতো দৃশ্য। শুধু সেই চিত্রে তারকাবিরল, জ্যোৎস্নাময়ী গগনপটের দৃশ্যটুকু নেই, কারণ, আকাশ, "কলিকাতা ইলেকট্রিক কোম্পানি (ইংলণ্ডে রেজেষ্ট্রীকৃত)" কর্তৃক প্রচারিত বিদ্যুতের জলন্ত প্রবাহের উর্ধ্বে, কোথাও, নয়নের অগোচরতায়। পথ জনমানবশূন্য ছিল না, কারণ, দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্তল, পঞ্চতল বা তদূর্ধ্ব তলবিশিষ্ট বিরাট বিরাট অট্টালিকার পাদদেশে, মাথার ওপরে ব্যালকনির আচ্ছাদনের নিরাপত্তায়, সারি সারি মানুষ শুয়ে ছিল। অপরিচিত দৃশ্যপটে সহসা মনে হতে পারে, সেই দুই দিগন্তের দিকে মাথা ও পা বিস্তার করে শায়িত নরদেহগুলি দেখে সহসা মনে হতে পারে, যে বুঝি-বা এরাই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও মাটির দিকে মাথা ও পা বিস্তার করে এই দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্তল বা পঞ্চতল বা তদূর্ধ্ব তল-বিশিষ্ট বিরাট বিরাট অট্টালিকার ওজন বহন করবে। অন্ধকারে স্থির রঙীন বিদ্যুৎ-খোদিত কিছু নাম, বিদেশী ভাষায় ও বিদেশী অক্ষরে জলন্ত। জলেছে ও নিভেছে যে আলোকমালা, তারা বর্তমানে নির্বাপিত। দূরে, কার্জন পার্কেরও অপর পাড়ে, ট্রেনের তারে প্রদীপ্ত নীলশিখা। কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি (ইংলণ্ডে রেজেষ্ট্রীকৃত) তাদের তার-জংশন মেরামত করছে। আলেয়ার মতো সেই নীল-আলোর নিচে একটা রোমশ-পেশল এশীয় হাত প্রায় ম্যারাথন-দৌড়ের চিত্রকল্প রচনা করছে। আমি মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাজ্যপাল ভবনের তোরণের মাথায় সিমেন্টিকৃত ব্রিটিশসিংহের লম্ফনোদ্যমের ভঙ্গি, বহু সিঁড়ির ওপরে ধূপছায়া রঙের প্রাসাদ। সম্মুখে কার্জনপার্কের ট্রাম লাইন আর ইলেকট্রিক আলোর প্যাঁচে হরিরাম গোয়েন্কা ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিশাহারা ভাব। এমন সময় হাইড্রেণ্ট থেকে একটি বেশ নধর মেয়েছেলে নেচে নেচে বেরিয়ে এল—কালো কুচকুচে শরীর যেন কষ্টি-

পাথর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটি মুখর, যেন এশীয় কোনো উপজাতির সমবেত সঙ্গীত। স্বাস্থ্য ও জীবনের সেই ভরা ভাণ্ডারের উপর রাজ্যপাল ভবনের (পুরনো ছোটলাট-ভবন, ইংলণ্ডীয় স্থপতি দ্বারা নির্মিত) সিংহ-তোরণের উপরিস্থিত সিমেন্টিকৃত সিংহটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সনারী সেই সিংহ হাইড্রাণ্ট দিয়ে তলিয়ে গেল, অদৃশ্য সেই শিকড়ের সন্নিকটে, যেখান থেকে রস কলকাতার প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই সিংহটি নিশ্চয়ই রমণীটির সঙ্গে যথেষ্ট রমনসুখ লাভ করেছে, তারই প্রমাণস্বরূপ কার্জন পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট ক্যাকটাস গাছটাতে নারীগণের দেহে যৌবন-আগমনের ধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি সৃষ্টি করে একটা বিরাট ফুল ফুটে উঠতেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে একদল অশ্বারোহী 'ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রীকৃত' ঐ অঞ্চলটার ওপর ভারতীয় দখলদারি কায়েম করল। তদবধি ফুলের প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি আমাকে আক্রমণ করে।

অনেকদিন পর আমার এক ক্যাকটাস-বিলাসী বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম: একপ্রকারের ক্যাকটাস গাছে শুধুমাত্র ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার মধ্য-রজনীতে একটিমাত্র সাদা ফুল ফোটে। সে বন্ধুকে আমি বলি নি যে কার্জন পার্কের উত্তর-পশ্চিম-কোণস্থিত ক্যাকটাস গাছটিই সেই গাছ।

কলকাতার পথ সেদিন চারজন নারীর শরীরের রক্তে লাল। অপুকে নিয়ে আমি সেই কাঁটাগাছের তলায় রাত জাগছিলাম। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছিলাম যেন, কলকাতার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়ে সেই প্রকাণ্ড সাদা ফুলটা আজ না ফোটে। আমি জানতাম অপু অপেক্ষা করছিল একটি রক্তবর্ণ গোলাপের।

ছেলেটি বেজাতে প্রেমে পড়েছিল। মেয়ের বাপ পাজিপুথি মিলিয়ে মেয়েটির আর এক জায়গায় বিয়ে ঠিক করেছিলেন। আমরা, আমাদের বন্ধু, সেই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির গোপন রেজিষ্ট্রি-বিবাহ সম্পন্ন করে, সিঁদুর-লেপা অস্ত আকাশের তলায় রিক্তসিঁথি মেয়েটিকে একটা বাসে উঠিয়ে দিয়ে, রাতে এমন এক পাড়ায় উৎসব করতে গেলাম, বারো বৎসর আগে আমাদের শ্রেণীর লোকেরা দিনেও সেখানে যেত না। এক বন্ধু বলতে লাগল—"এই লাইনে সারি-সারি ছোটো-ছোটো মদের দোকান ছিল। সবগুলোর ভেতরে জুয়ো চলত। আর দিনে গোটা পাঁচেক খুন না হলে তো সেদিন ভালোয়-ভালোয় কাটলো।" এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় তিনজন কিছু মদ ও

মাংস খেয়ে (বিবাহিত যুবকটি সবচেয়ে বেশি পান করল, আমাকে রাত্রিতে ইস্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে বলে ও অপরজনকে রাত্রিতে স্ত্রীর পাশে শুতে হবে বলে, আমরা দুইজন অল্প-অল্প পান করলাম) বাইরে বেরুতেই একটু দূরে মোড়ে দাঁড়ানো এক ট্যাকসির দিকে আঙুল দেখিয়ে এক ট্যাকসিওয়ালা ষড়যন্ত্রসঙ্কুল কণ্ঠে ডাকল—"বাবু, ট্যাকসি।"—একজন খিস্তি করে চেঁচিয়ে উঠলো—"এ-খানকি কলকাতা কোনোদিনই তিলোত্তমা হবে না, হবে না।"

সন্ধ্যাবেলায় ষড়যন্ত্রসঙ্কুল কণ্ঠে "বরফ" বলে হেঁকেই কুলপিওয়ালা মিলিয়ে যায়। "বেলফুলের মালা" আর রিক্সাওয়ালা সওয়ারি হেঁকে যেতেই গ্যাসবাতি আর রাস্তার দুপাড় বেশ্যাতে এমনভাবে ভেঙে পড়ে যে তখন ট্রাম চলে গেলে মনে হয় ঘোড়া দুটো আছে কিন্তু দেখতে পেলাম না।

আমার ঘরটার পাশেই দেবতার মন্দির। দেবতার মন্দির আর আমার ঘর—এই দুই দেয়ালের আশ্রয়ে এক কুলি-দম্পতির বাস। আমাদের সারির বিপরীতে বস্তি।

সারাদিন কাজকর্মের শেষে এক নাপিত কুলিটির কাছে আসে গাঁজা খেতে। সে গাঁজা খেয়ে নানাপ্রকার গল্প করত। একদিন গল্প করেছিল। "একবার এক বাবু পথে যেতে-যেতে দেখে ঝোপের মধ্যে এক বাঘ শুয়ে আচে। দেখামাত্র বাবু বন্দুক দিয়ে দড়াম, ব্যস, বাঘ তো চিৎপটাং। তারপর তিনদিন পর হঠাৎ আদালত থেকে শমন এসে হাজির—বাবুকে আদালতে হাজির হতে হবে। বাবু আদালতে গিয়ে দেকেন সেই মরা বাঘটাই বুঝি হাকিম হয়ে বসে আচে। লাল টকটকে এক সায়েব চেয়ারে বসে বাবুকে জিগেস করলে: 'বাঘটাকে যে তুমি মেরেচ, বাঘটা তকন কোথায় ছিল, তোমা থেকে কতো দূরে—' বাবু বললেন—'মনে হয় হাত পঞ্চাশেক দূরে ছিল, একটা ঝোপের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিল—' সায়েব শুধোলেন—'বাঘটা তোমার কিছু না-করতেই তুমি মেরেছ?' বাবু বললেন—'আজ্ঞে।' ব্যস, অমনি সায়েব পঁচিশ টাকা জরিমানা করে দিল। হুঁ হুঁ, বাবা, ইংরেজের আইন—"

যতীন নামে এক মাজাভাঙা মানুষ ছিল। সে দেবমন্দিরটির ধোয়া-মোছা করত। দিনরাত, থেকে থেকে-ই সে "এই গণেশের বাপ" "এই কালী, কালী, কা—আ—লী" "বাবা সত্যনারায়ণ, এটটু শুনে যাও দিকি"

"এই কালীর ভাতার" এইসব বলে চেঁচাত আর গালাগাল করত,—"হারামজাদী, বেলা ডুকুর গড়ালো, আর খাওয়ার নামটি নেই, জুতো মেরে মুখ ধুইয়ে দেব" বা "ফের গ্যাজা খেয়েচ গো ? অ্যাঁ, নজ্জা করে না তোমার, মুয়ে আগুন।" এ-সব কথাই যতীন তার ভগবানকে বলত।

অপু সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সারা কলকাতা চষে বেড়াত। রাগে-দুঃখে-আনন্দে-ঘৃণায়, সকালে-দুপুরে-বিকালে-রাত্রিতে প্রায়ই সে খানকি, বুড়ি, রাক্ষুসী, ছেনাল—ইত্যাদি বলত। আমি অনেক পরে বুঝেছিলাম—এগুলো সে কলকাতাকেই বলত।

আমার ঘর থেকে কুমোরটুলি দশ পা-ও নয়। এক এক পুজোর সময় সেখানে রাশি-রাশি গাড়ি আসত। অপুর কলকাতা যতীনের ভগবানকে গাড়িতে করে নিয়ে যেত।

আউটরাম ঘাটে একটা বিদেশী জাহাজের দিকে তাকিয়ে অপু বলছিল—"জানিস, ঐ জাহাজটার কাছে কলকাতা একটা বন্দর ছাড়া কিছু-ই নয়। পূর্ব এশিয়ার মালপত্তর জমা করে রাখে যে-যে শহরে উড়োজাহাজে বা জলজাহাজে বা ট্রেনে তুলে দিতে, কলকাতা সেরকম একটি শহর। জাহাজীরা কলকাতায় এলে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে, কেন বল্ তো। আগের বড় শহরটা ছাড়বার পর যে-যে জিনিস তারা পাচ্ছিল না, এবার সে-সব জিনিস পাবে। কী জিনিস ? মদ-মেয়েমানুষ-মাংস-মোটরগাড়ি-জুয়ো—আর স্মাগলিঙের জিনিসপত্র বিক্রির খরিদ্দার। এক একটা জাহাজ আসে, আর সেই জাহাজের চাকায়-চাকায় গত তিনশ বছরের বাণিজ্যপথ আরো গভীর হয়। আর এই বাণিজ্যপথকে পাহারা দিচ্ছে কে, দেখো। সম্রাট পঞ্চম জর্জ।" পঞ্চম জর্জের মূর্তির পাশ দিয়ে, নকলবনের পাশ দিয়ে, অন্ধকার ভরা সেই মাঠটা পার হতে-হতে দাঁতে দাঁত চেপে অপু সেদিন বারবার বলছিল—"বুড়ি খানকি, চরিত্রহীন, শালা বেজম্মা।" বলতে-বলতেই অপু এক একবার পেছন ফিরে গঙ্গা দেখছিল, গঙ্গা যেন তেলরঙে আঁকা একটি ছবি—আকাশের নক্ষত্রদীপ্ত নীলিমা থেকে শুরু করে অপর পাড়ের চটকলের আলোর মালা, ও জাহাজ-লঞ্চ-ষ্টিমার-নৌকোর অসংখ্য রঙীন আলো পর্যন্ত বুকে ধরতে চায়। গঙ্গার জলে নানারঙের আলোর প্রতিবিম্ব। গঙ্গা রঙময়ী হয়ে উঠেছে।

গঙ্গা যেন ব্যবসায়ী ইংরেজ চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত বাঙালী খদ্দেরের পূর্বপুরুষের ছবি। মূলে চিত্রকরের তুলির বিদেশীত্ব জমিদারবাবুটির চোখ ও

চুলে ছিল, ইদানীং স্বদেশী ধুলিতে রেখা ও রঙের সকল জটিলতা আচ্ছন্ন। মদনমোহনতলার গঙ্গা। পার: প্রাসাদে সাহেব পরিচালিত মোগলাই রাজমিস্ত্রির দোআঁসলা স্থাপত্যের শতবার্ষিক উদ্‌যাপন করছে সাইডিঙে দাঁড়ানো একটি বিষণ্ণ ওয়াগন; মানুষের বুকের এক্স-রে ছবির মতো দুটো রেল, হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা করে বলে যার নাম হৃৎপিঞ্জর; বাড়িঘরের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে যেটা ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের মতো পৌরাণিক পৌরুষে দড়, সেটা যশোর-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ থেকে আসা বহরের নৌকার আলকাতরা মাখানো মাস্তুল—অত বিস্তৃত নদীর মাঝখানে একটি বিন্দুর মতো একটিবার অবান্তর মনে হয়, অথচ অত স্রোতের মধ্যে এত স্থির, যেন, ঐ স্থিরতার উৎস গঙ্গার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিহিত। পাড় উঁচু, নদী ক্রমে নিচু থেকে নিচু, যেন স্বর্গ থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গা এখানেই পাতালের দিকে মোড় নিয়েছেন। সেই মোড়ের পরই নিমতলার শ্মশানঘাট, হাওড়া ব্রিজ, এবং ক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা তৈলচিত্রের মতো: আকাশের নক্ষত্রখচিত নীলিমা থেকে চটকলের আলোর মালা প্রাণে মেলাতে চায়।

রাওয়ের পিতৃভূমি মাদ্রাজ, তিনপুরুষের ব্যবসা কটকে, নিজে এসেছে কলকাতায় চাকরি করতে। কোনো আসামী মেয়ের সঙ্গে রাওয়ের বিয়ে দিলেই সে 'পূর্বভারতের জাতীয়-সংহতির উদাহরণ' হয়ে উঠবে। রাও তার প্রথম কলকাতা আগমনের গল্প বলত "আমি কি ভাই আর ইমাজিন করেছি, যে এতো বিরাট ইস্টেশন হাওড়া। আমার ফ্রেণ্ড-রা অবিশ্যি বলেছিল যে আগে চিটিপত্তর লেকে যাও, নইলে গিয়ে বিপদে পড়বে। আমি তো মস্তানি করে একা একাই রওনা দিলাম। হাওড়ায় পৌছে কোটকের মস্তান আমি, আমার মস্তানি ছুটে গেল—" এই জায়গায় আমরা হো হো করে হাসতাম—"শালা পিপিলের একেবারে ইণ্ডিয়ান ওসেন। আমি আমার স্যুটকেসের ওপর সতরঞ্চি পেতে বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। শেষে এক পুলিশ বাবা এসে সব জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিকানায় পৌচে দিলে—"

মাথার চুল কোঁকড়া ও গায়ের রঙ ফরসা করার জন্য বিজ্ঞাপিত যাবতীয় তেল, সাবান ও স্নো কিনে রাও তার মাইনের এক তৃতীয়াংশ খরচ করত। সন্ধ্যাবেলায় গড়িয়াহাট মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখত। রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে চেঁচাত—"বাঙালী লেডিদের মতো লেডি হোল্ ওয়ার্ল্ড মে নাহি হ্যায়।" তারপর ইংরেজি সুরে গান গাইত—"আই শ্যাল ম্যারি এ বেঙ্গলি গার্ল।"

রাওয়ের তিনপুরুষের বাস কটকে। ভালো তামিল বলতেই পারে না। তবু রাও দুইবেলা ভাত খেতে যেত মাদ্রাজী হোটেলে। কলকাতার মেসের আমিষ রান্না রাও একদিন-ও খায় নি। রাও এক ছড়া বানিয়েছিল :

"স্নো, সিনেমা এ্যাণ্ড গার্ল
ই হাঁয় ওয়েস্ট বঙ্গাল।"

কলকাতার পথ নিয়ে অপু একটা ছড়া বানিয়েছিল ; যতদূর মনে পড়ে 'মিছিলের শহর' নাম দিয়ে, ছড়াটার প্রথম কয়েক চরণ এই রকম

হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে রাস্তার উপর কে ?
ট্রাম বাস সব থেমে আছে—স্বখনরামের বে।
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, রাস্তার উপর কে ?
ইংলণ্ডের মহারানী দর্শন দিচ্ছে।
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, রাস্তার উপর কে ?
মজুররা সব ছাঁটাই হয়ে মিছিল করেছে।
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, রাস্তার উপর কে ?
শ্রী ১০৮ অমুক বাবার ভাব ধরেছে।
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, রাস্তার উপর কে ?
অ্যাটম বোমা বাতিল করার জলুস চলেছে।

প্রথম প্রথম ছড়াটা অপু বলতো হো হো করে হাসতে হাসতে। হাসিটা এত বেশি, এত উচ্চধ্বনি-বিশিষ্ট, যে, মাঝখানে মনে হতো—অপু কিছু একটা ঢাকতে চাইছে।

আমি জানতাম অপু একদিন মরবে—এতো ভালোবাসা নিয়ে কেউ বাঁচে না।

ঘরভাড়া করার পয়সা না থাকায় এক শিল্পী ফুটপাথে তাঁর চিত্রকর্মের প্রদর্শনী করেছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বুক চাপড়ে চাপড়ে, গ্রামের মেলার সার্কাসের বালকটির মতো, অপু চেঁচাত—"দেখে যান, দেখে যান, দেখে জন্মো সার্থক করুন, নতুন খেলা, নতুন খেলা, জয় মা কালী কলকাত্তাওয়ালী।" তারপর অন্যমনস্কের মতো পদাবলী কীর্তনের আধখানা সুর গুনগুন করত—"বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী--।" তারপর বুক চাপড়ে আর্তনাদ করত—"উঃ মা, আমি মরে যাব রে।"

সেই প্রদর্শনীতে একটা ছবি ছিল : পেছন দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া একটি নগ্ন নারীদেহ, তার কালোচুল—যেন অন্ধকার প্রপাত, সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট করুণ রেখায় তার মুখখানি ভাসছে, নাভিমূল থেকে এক সঙ্কীর্ণ রেখা দুই স্তনের মাঝ দিয়ে কণ্ঠের দুই নালীর গর্তে গিয়ে পড়েছে—যেন হৃৎপিণ্ডে কোনো শ্বাস জমা হয়ে আছে—সে শ্বাস নির্গত হতে পারে শেষ শ্বাসরূপে, প্রাণবায়ুরূপে, আর ঐ ক্ষীণ দেহ ডুবে যাবে অন্ধকারে, পটভূমির অন্ধকারে, যে অন্ধকার কেশদামে নিয়ত-নির্ঝর ; সে শ্বাস নির্গত হতে পারে প্রথম শ্বাসরূপে, প্রাণবায়ুরূপে, আর ক্ষীণ দেহ ভেসে উঠবে আলোয়, যে আলো নাভিমূলে নিয়ত প্রস্রবণ। হাত দুটির মাত্র কনুই থেকে দৃশ্য, মৃত্যুতে নিমজ্জিত যেন-বা, অথচ দুটি হাতের করতল যুক্ত হয়ে ঠোঁটে এসে মিললেই 'শঙ্খবাদনের' প্রাচীন মুদ্রা হয়ে উঠবে। জন্ম ও মৃত্যুর সংজ্ঞার্থে ভূষিত এই ছবিটির নাম 'কলকাতা'।

অফিস-বেলার ভরা ট্রামে লাফ দিয়ে উঠতেই এক ভদ্রলোকের প্যান্টে স্যাণ্ডেলের ঘষা লাগল। ভদ্রলোক বললেন, "দেখে উঠতে পারেন না মশাই ?"

রাও উত্তর দিল, "সরি, এত ভিড়,"

"ভিড় তো সব সময়ই আছে, ট্রামে ওঠা শিখতে হয়।"

"হয়েছে মশাই, অত পিটপিটুনি থাকলে ট্যাকসিতে গেলেই পারেন—" ততোক্ষণে ট্রাম পরের স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা নামবে, তাদের জন্য গেট ছেড়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল-ধরা-রা নেমে দাঁড়াল। টং টং। ট্রাম চলা শুরু করতেই রাও লাফ দিয়ে উঠল। ভদ্রলোক উঠতে না পেরে রাও-কে একটানে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। ট্রামটা চলে গেল। রাও ঘুরেই ভদ্রলোককে এক ঘুষি। তারপর দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কে একজন চিৎকার করে উঠল "শালা মাদ্রাজী।" সারি সারি ট্রাম থেমে গেল, উদ্যত বাহুর অরণ্যে রাও হারিয়ে গেল। হাসপাতালে রাও দুঃখ করছিল একটি-ই কথা বলে—"এত স্নো-পাউডার মাখি, আমাকে তাও মাদ্রাজী বলে চিনতে পারল।" তারপর থেকে রাও দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। 'দেশ' বলতে রাও কটক বোঝাত।

জলনিকাশী নালা নিয়ে পাশের বাড়ির সঙ্গে মোকদ্দমায় শেষ পর্যন্ত বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে শম্ভুরা ঠিক করেছিল দেশে ফিরে যাবে। শম্ভুদের 'দেশ' মেদিনীপুরের কোন্ একটা গাঁ।

একবার কালীপুজোর সময় আমার গৃহস্বামীর গ্যারেজের পাশে যে সামান্য একটু জায়গা পড়ে ছিল, সেটুকুর ওপরে ত্রিপলের এক ছাউনি দিয়ে আশি টাকায় এক সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলেকে ভাড়া দেওয়া হলো। ভাড়া পাওয়া মাত্র ছেলেটি রাতদিন খেটে বিরাট সাইজের কতকগুলি কালীমূর্তির কাঠামো তৈরি করল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেটি মাঝেমধ্যে আমার কাছে বসে বিড়ি টানতে টানতে গল্প বলত—এইবারের কালী বেচে সে আগের মহাজনের ধার শোধ করবে, এই প্রথম তার নিজের কারখানা করল—এর আগে মজুরি খাটতো, তাদের পক্ষে কৃষ্ণনগরের মেয়ে বিয়ে করা খুব লাভ ও সম্মানজনক। কালীপূজোর আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ছেলেটি কালীমূর্তির চোখ, ঠোঁট, ভুরু ইত্যাদিগুলো শেষ করছে—এমন সময় তার আলো নিবে গেল। আলোর লাইন মালিকের। কী ব্যাপার? ছেলেটি নাকি অর্ধেক ভাড়া দেয়নি। এবং আজ-কালের মধ্যে ভাড়া না দিলে, কালী বিক্রির টাকা নিয়ে ছেলেটি ভেগে যাবে। ঘণ্টা দুয়েক পরে আলো জলন। বিরস বদনে ছেলেটি রং-তুলি নিয়ে কালির ভুরু, চোখ, ঠোঁট ইত্যাদি আঁকতে লাগল। কিন্তু একটি কি দুটি বায়না করা কালী ব্যতীত আর কোনো মূর্তি তার বিক্রি হলো না। ছেলেটি ভেগে গেল। রোদ-জলে মা কালীর অঙ্গ গলে গেল। ওপর থেকে ময়লা পড়তে লাগল মা-কালীর অঙ্গে —কেননা মা-কালীর কারখানা হবার আগে জমিটা ময়লা-ফেলার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু অতগুলো মা-কালীর বিনিময়-মূল্য শূন্য তাই তান্ত্রিক ঐতিহ্য ও হিন্দু কল্পনার ওপর তরকারির খোসার পাহাড় জমতে লাগল।

রাস্তার দু-ধারের আনাচ-কানাচ থেকে, শেষ ট্রাম-বাস চলে যাবার পর— কলকাতা মহানগরীর ধনতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক কল্পনার ওপর উপচে এসে পড়ল বেশ্যার দল।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মন্দির নির্মাণ হবে বলে দেশবিদেশ থেকে নানাবর্ণের নানা মূল্যের নানা শোভার পাথর এনে জমা করা হলো। প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন শিল্পীর দল সেই পাথরের ওপর নানা মূর্তি খুদে তুললেন: ঝাঁকা মাথায় মেছুনী, শিব-পার্বতীর মিলন নৃত্য, শবরের হরিণ শিকার, রামের বিবাহ, ব্যাধ—কিংবা···। ভাবা ছিল—এই খণ্ডিত খোদিত স্বপ্নগুলি মিলিত হয়ে সেই মন্দিরের শরীর রচনা করবে।

একটি বিরাট কষ্টিপাথর পড়ে ছিল। ভাবা ছিল—ঐ খোদিত খণ্ডিত স্বপ্নগুলি মিলিত হয়ে যে দেবতার কল্পনা রচনা করবে, তার মূর্তি ধীরে ধীরে ঐ কষ্টিপাথরে ফুটে উঠবে।

একশ বৎসর কেটে গেল—মূর্তি দেখা দিলেন না। নানা শিল্পীর গড়া টুকরো মূর্তিগুলো পাঁজা হয়ে পড়ে রইল। সেই কষ্টিপাথরের দেবতার মূর্তি ফুটে উঠলো না। সেই সব খণ্ডমূর্তির শরীরে ময়লা জমে উঠলো, কল্পনাগুলো প্রত্ন হয়ে গেল, মৃত্যুর খরখরে হাওয়ায় নোনা ধরলো মূর্তির আনাচে-কানাচে—কষ্টিপাথরে দেবতার মূর্তি ফুটে উঠলো না। কালো পাথরটার বুকের ভেতর সমুদ্র আছে। অপু মাথা ঠুকছে সেই কালো পাথরে—ভাঙবার জন্য। অপু সমুদ্রকে ভালোবাসে। সমুদ্র-গর্ভ কলকাতাকে। আমি জানতাম অপু একদিন মরবে, এতো প্রেম নিয়ে কেউ বাঁচে না।

গোলদিঘির চত্বরে দাঁড়িয়ে সিনেট হলের দিকে মুখ করে বেদান্ত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে এক পাগল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। বিস্মৃতির দেশ থেকে উড়ে এসে মহাপণ্ডিত ভুষণ্ডী কাক বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাথায় বসে ঠোঁটে আহরিত অন্ধত্বের পিচুটি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাথায় ঘষতে লাগলো। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মূর্তিটা হাঁটতে হাঁটতে রেলিং টপকে গোলদিঘির জলে পড়ে গেল। গোলদিঘির গর্তে ধরা-পড়া চাঁদ বৃত্তাকারে পাড়ে এসে চূর্ণ হলো আর সমবেত আত্মহত্যার সম্মেলক সঙ্গীত গাইতে গাইতে চিৎপুরের মোড়ে একদল হিজড়ে শূন্য ট্রাম লাইনের ওপর "খাঁটি দুধ, টাকায় পাঁচ পোয়া, পরীক্ষার্থে সাতদিন বিনামূল্যে এক পোয়া করিয়া দুধ"—লেখা লাল ফেস্টুনের চাঁদোয়ার নিচে এসে পৌঁচতেই কিছু রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা ও বেশ্যা এসে তাদের কোমর ধরে নাচতে লাগলো—সমবেত আত্মহত্যার সম্মেলক নৃত্য। পানের পিকের পিচকিরিতে কলকাতার হৃদয় পিঞ্জর, ট্রাম লাইন পাতা রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে উঠলো।

শীতের গভীর রাত্রিতে মধ্য-কলকাতার ফুটপাথে অপ্রাসঙ্গিক একটি বাচ্চা তেঁতুল গাছে ঠেস দিয়ে অপু দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী বিরতিতে বলছিল—"এখান থেকে দেখ—যতদূর দেখা যায় দুপাশের ফুটপাথ আর রাস্তারও কোনো কোনো অংশ জুড়ে সুরাহত মানুষের নানা ফিগার। প্রত্যেকে তো তাদের অষ্টপ্রহরের ভঙ্গি নিয়েই বসে আছে, আধশোয়া হয়ে

আছে, বা শুয়ে আছে। অথচ মাঝরাতের জলসার এই গান শুনতে এসে সেই আটপৌরে ফিগারগুলো কী রকম সুর-আপ্লুত মনে হচ্ছে, যেন মধ্যযুগের শিল্পীগণের আঁকা খ্রীষ্টভক্তগণের ছবি। সারাটা কলকাতা যেন সুরে মূর্ছা গেছে।" মাইকে সেতারের তার বাঁধার আওয়াজ এলো। তবলার ঠেকা। "চোখবুঁজে যখন গান শোনা যায়, মনে হয়, কলকাতাই বুঝি কানাড়ায় বা মালকোষে গান গাইছে। এমন-কি, আজ যখন ভেতরে নাচের প্রোগ্রাম চলছিল ভেতরে আমার মনে হচ্ছিল কলকাতাই যেন নাচছে—ক্ষুধিত পাষাণের নায়িকার মতো। কিছু স্বাদ, কিছু গন্ধ আমি পাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই সেখানে পৌছতে পারছি না। হয়তো কেদারায় সানাই বেজে উঠবে, হয়তো শেষরাতে রামকেলিতে আমার শরীরের রক্ত বেজে উঠবে, হয়তো আমার দেহের শিরা উপশিরাগুলিতে ভৈরবীর স্বর তরঙ্গ তুলবে। আমি ঘুমের ভেতর মনে করবো, আমাকেই বাজাচ্ছে কলকাতা, আমাকেই। কলকাতা আর আমি মরে যাবো —" বুক চাপড়ে উঠলো অপু। সেতারীর হাতে জোনপুরী। মধ্যরাত্রিতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ শয্যাত্যাগ করে দেখলেন—চারপাশে তার ভোগ্যা ও ভুক্তিতা নারীগণ মুখব্যাদান করে পড়ে আছে। রতিপ্রিয়া হস্তিনীর ন্যায় ধীরে অথচ ব্যাকুলতার সঙ্গে সুর এগোচ্ছে। আকাশ-বাতাস থেকে সন্ন্যাসের হাওয়া এলো। যে-ক্রন্দন শুরু হয় সাতসমুদ্রের গভীরতম স্তর থেকে, তারে তারেই ব্যঞ্জনা। বিসম্বাদী সুরের পাশ দিয়ে সুর যখন এগিয়ে চলেছে—অপু তুই ভুরু কুঁচকে পাষাণ। আর কন্টকিত সেই বিসম্বাদের ওপারে পৌছে সর্বঅস্তিত্বে সুর যেই কেঁপে উঠেছে, অপু ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

আমি জানি অপু একদিন মরবে—এতো প্রেম নিয়ে কেউ বাঁচে না।

কলকাতার রাজপথে মিছিল রাত জাগছিল। দু-পাশের শাল গাছের মতো বাড়িগুলোর মাঝ দিয়ে ছায়াপথ সাইজের একটি আকাশ পথে চিত হয়ে শোয়া মানুষগুলোর চোখের সম্মুখে রাতদুপুরে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও একদল জটলা হয়ে ছবি ও লেখা আঁকছিল। সারাদিন কারা-কারা মিছিলকে খাবার পাঠিয়েছে, চাঁদা পাঠিয়েছে ও সেদিন সরকারের সঙ্গে শেষতম যোগাযোগ কী হয়েছে—তার সংবাদ। কোথাও-বা সমবেত সঙ্গীত—হয়তো মিলনের, হয়তো বিরহের। ফুটপাথের ওপরে কাপড় শুকোবার মতো করে দড়ি টাঙানো। ছবি এঁকে তাতে ঝোলানো হচ্ছিল।

সকালে কলকাতার লোক দেখবে মিছিলটা যেন উৎসবের। অথচ এরই মধ্যে আনাচে কানাচে সতর্ক দৃষ্টি আছে—হত্যাকারীর দল যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। "আমরা আজ মরে গেলে কলকাতার লোক কাল দেখবে আমরা একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলাম।" অন্ধকারে মুখ ঢেকে বাষট্টি-তেষট্টির এক বুড়ি গুন্‌গুন্ সুরে—বাসরে যে গানটা গেয়েছিল, সেই গানটা গাইছে। অপু বুক চাপড়ে সারারাত ছটফট করেছে—আমি মরে যাবো, আমি মরে যাবো। তারপর ভোরের দিকে একটা ইটে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, ভোরে উৎসবে ঘুম ভাঙবে আশায়।

আমি জানি অপু একদিন মরবে। এতো প্রেম নিয়ে কেউ বাঁচে না।

ডাকবাংলার ডায়রি

সুবচনী

গ্রামের নাম নিমতিতা

হাওড়া থেকে ট্রেনে পুরো একবেলার পথ। শেষ স্টেশন আগে ছিল ধুলিয়ান। নদীতে ভেঙে যাওয়ায় এখন নিমতিতা।

ট্রেন এসে থামল শেষ রাতে। প্ল্যাটফর্মে টিমটিমে বাতি। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। বেরোবার দরজা থেকে নিচে নেমে গেছে সিঁড়ি। নামতে নামতে বুঝলাম নিচের জমি থেকে স্টেশন অনেকখানি উঁচুতে।

গাঢ় নীলগোলা জলের মতো অন্ধকার। একটু দূরে দৈত্যকায় কয়েকটা গাছ। হাঁটুর কাছে ছেঁড়াখোঁড়া আকাশ। মহাজনদের আড়তের মতো দেখতে টিনের বড় বড় চালাগুলো আবছা আবছা নজরে পড়ে।

কাছেই কয়েকটা টাঙা দাঁড়িয়ে। সঙ্গে হারিকেনের আলো। ঝোলানো আলোয় তলাকার মাটিটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়োমাখা খড়কুটো আর শুকনো পাতার মধ্যে পাটকাঠিগুলো শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের মতো ঠিকরে আছে। ঘোড়াগুলো ঘুমচোখে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মাঝে মাঝে পা বদলাচ্ছে। তখন একটু করে ঠুনঠুন আওয়াজ। ধুলিয়ানে লোক নিয়ে যাবে যে স্টেশন-ওয়াগন, সেটা ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। তাই তার তেমন হাঁকডাক নেই।

টাঙা দেখে খুব ছেলেবেলাকার পুরনো একটা ছবি মনে পড়ল। কলকাতা থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে আমরা এসে নেমেছিলাম সান্তাহার স্টেশনে। তখন সবে রাত পুইয়ে সকাল হচ্ছে। ব্লটিং পেপারে কালি শুষে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে। দূরে মাথার অনেকখানি ওপরে ওভারব্রিজটা, কী আশ্চর্য, কিছুই না ধরে কেমন করে যে ঝুলছিল। আমি আর দাদা আনন্দে হাত ধরাধরি করে আগে আগে চলছিলাম। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল টমটম। ঠিক টাঙ্গারই মতো। এক ঘোড়ায় টানা দু-চাকার গাড়ি। হাসিখুশিতে এক্কার ছবি দেখেছিলাম তার ঢের ঢের পরে।

টাঙায় উঠে পেছনের সিটে বসে পুরনো কথাগুলো মনে করতে বেশ লাগছিল।

পর পর কয়েকটা টাঙা। আউটডোরে ছবি তুলতে চলেছে দলবল। আমি অবশ্য রেয়োভাট। দলের কেউ না হয়েও ভিড়ে পড়েছি দলে। সরজমিনে না দেখলেও নিমতিতা আমার একেবারে অদেখা নয়। দেখেছি 'জল্‌সাঘরে' আর 'দেবী'তে। দেখার চেয়েও বেশি শোনা। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পদ্মা দেখবার এই নাকি একমাত্র জায়গা। সে লোভ অনেকদিন থেকেই আমার মনে মনে ছিল।

বসেছিলাম পেছনের সিটে। গাড়োয়ানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। মাঠঘাট পেরিয়ে আস্তে আস্তে লোকালয় পাওয়া গেল। পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়া-বাঁধানো সড়ক। দু-পাশে বৃষ্টির জলনিকাশী খানাখন্দ। মধ্যে মধ্যে কালভার্ট। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা উত্তর-বাংলা উত্তর-বাংলা গন্ধ।

টাঙায় পেছনের সিটে বসা মানেই উল্টোমুখো হয়ে বসা। তার ওপর পা রাখার জায়গাটা রাস্তার সঙ্গে প্রায় ঠেকে গিয়ে কেমন একটা আধ-দাঁড়ানো গোছের ভাব হয়। আর দু-পাশের দৃশ্যগুলোও আসে হঠাৎ আচমকাভাবে। আগে থেকে একটুও জানান না দিয়ে। সামনে যারা বসে আছে তাদের ওপর রাগ হয়। ওরা যেন একলষেঁড়ের মতো আগেভাগে সব দেখে নিয়ে পেছনের লোকদের জন্যে টিপে টিপে একটু একটু করে ছাড়ছে। নতুন জিনিস একটার বেশি একসঙ্গে কিছুতেই দেখাবে না।

গাড়ির গতি কমবার ধরনে বোঝা গেল এবার আমরা এসে পড়েছি। রাস্তা ছেড়ে উঁচুনিচু অসমান জমি। আবছা আলোয় একটা-দুটো স্তম্ভ। এখানে এই প্রথম এলেও কেমন যেন সব চেনা-চেনা। নিজেকে জাতিস্মরের মতো মনে হয়। বাড়ির দোরগোড়ায় টাঙা এসে থামল। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। গলির দু-পাশে একতলার পৈঠে। বাইরের অন্ধকার আলোর খোঁচাখুঁচিতে উঠে বসে আড়ামোড়া ভাঙলেও বাড়ির ভেতরের অন্ধকার তখনও দিব্যি মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লণ্ঠনের একটা আলোকে পা টিপে টিপে নিচে নেমে আসতে দেখা গেল।

গায়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাওয়া লাগতেই পেছন ফিরে তাকালাম। সামনে হাঁ হাঁ করছে আকাশ। আমরা কি তবে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি? ঠিক

ঠাহর করতে পারলাম না। সামনে উঠোনের মাঝখানে একটা শান-বাঁধানো চত্বর। পাশেই নড়েচড়ে পাহারা দিচ্ছে এক বন্দুকধারী সেপাই। দোতলায় উঠতে উঠতে শুনলাম এ-বাড়ির একতলায় সীমান্ত-পুলিশের ফাঁড়ি।

এককালে এ-বাড়ির কী জাঁক ছিল, ভেতরে এলে বোঝা যায়। দোতলায় ভেতরে বাইরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। স্বচ্ছন্দে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। বাঁদিকে হলঘর। রং-করা দেয়াল। দেয়ালে ইলেকট্রিকের লাইন। যখন এ গাঁয়ে বিজলী আসেনি তখনই নিজেদের ডায়নামো চালিয়ে এ বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালানো হতো। ডায়নামোটা এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে, সারিয়েই বা কী হবে? ইলেকট্রিকেরও আগে ছিল ঝাড়লণ্ঠনের যুগ। হলঘরটা তখন ছিল সত্যিকারেরই জলসাঘর। ও-ঘরে ফুর্তির ফোয়ারা বয়ে গেছে একদিন।

গরম চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে পুবের বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালাম, আকাশ যেন ডিমের কুসুমের মতো ফেটানো। সামনে গঙ্গা। একটু বাঁদিকে চরের গা ঘেঁষে গেছে পদ্মা। পদ্মা পার হয়ে দিগন্তের পায়ের কাছে সবুজ নরুণপাড় বনরেখা। কাছে চরের গায়ে কাঁচা রোদ পড়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে কাশফুল। রোদ ওঠবার আগেই সবাই মুরপুরের বাগানে চলে গেল ছবি তুলতে। আকাশটাকে মুখে করে আমি একা। রাস্তা জেনে নিয়েছি। বেলা হোক। তারপর নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে যাব।

খানিক পরেই এসে গেলেন রাধানাথবাবু। রাধানাথ রায়। এঁদেরই বাড়ি। রায়েরা শুধু বনেদী জমিদার নন, পড়াশুনো-করা রুচিবান মানুষ। এ অঞ্চল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হলো।

রায়বাড়ির একতলায় সরকারী সেট্‌ল্‌মেণ্ট ক্যাম্প। ফরাক্কা আর শামসেরগঞ্জ—এই দুই থানা নিয়ে কাজ। ফরাক্কায় চার-চারটে ইউনিয়ন: অর্জুনপুর, বেনিয়াগ্রাম, ফরাক্কা আর শ্রীমন্তপুর। সব মিলিয়ে বাহাত্তরটি মৌজা। আর শামসেরগঞ্জ থানায় ইউনিয়ন তিনটি: নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, ভাসাইপাইকর। মোট পঞ্চাশটি মৌজা।

ওপরদিকে পশ্চিম দিনাজপুর অবধি ধরলে মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের বেশ একটা আজব-প্রাণী আজব-প্রাণী চেহারা হয়। এই আজব প্রাণীর গলাটাই

হলো শামসেরগঞ্জ। বাংলার এই সরু গলাটা বিহারের গায়ে প্রায় লেপটে আছে। সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে তার ছাপ মেলে।

আগে গণ্ডগ্রাম বলতে যা বোঝাত, নিমতিতা তাই। তিনটি উদ্বাস্তু কলোনি নিয়ে গ্রামে মোট হাজার পাঁচেক লোক। এলাকা আগে আরও অনেক বড় ছিল। পাকিস্তান হয়ে এ গ্রামের পাঁচ-ছ হাজার বিঘে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আরেক শত্তুর নদী। উনিশশো একচল্লিশের ভাঙনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু-আড়াই হাজার বিঘে জমি গেছে নদীর পেটে। জমি হারিয়ে পাঁচ-ছ শো চাষী পরিবারকে জাত খোয়াতে হলো। এরা এখন কেউ মোট বয়, কেউ বাগান নিড়োয়, কেউ ঘরামির কাজ করে, কেউ গাড়ি চালায়, কেউ আনাজপাতি বেচে। তবে এদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই বিড়ি বাঁধে।

চাষীদের মধ্যে এখানে মোটামুটি তিন জাত। মুসলমান, মাহিষ্য আর ধানুক। মুসলমান চাষীরা বেশির ভাগ থাকে বাগড়ী এলাকায়। নদীর ধারে ধারে। মেটাল এলাকায় থাকে মোটামুটি মাহিষ্য আর ধানুক। ধানুকরা এসেছে বিহার থেকে। রাঢ় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই বাস। আরেকটা জাত আছে, তাদের বলে 'চাঁই'। ওরা সাধারণত তরিতরকারির আবাদ করে।

বিশ পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে ছিল লাক্ষার ফলাও ব্যবসা। লাক্ষাকে চলতি কথায় বলে 'লাহা'। সব পরিবারই তখন কিছু না কিছু লাহার চাষ করত। এ অঞ্চলে লাহার চাষ হয় কুলগাছে আর বিহারে হয় পলাশ গাছে। লাহার বিছনকে বলে 'তুড়ি'। কুলগাছে তুড়ি দিয়ে একহাত করে ডাল বেঁধে দেওয়া হয়; তারপর সেই গাছে পোকার দল ছড়িয়ে পড়ে লাহা তৈরি করে।

লাক্ষার গাছগুলো এখন নদীর পেটে। তাছাড়া লাক্ষার বিছনও এখন যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি দুর্মূল্য। লাক্ষার ব্যবসায়ে এখনও লেগে আছে শতকরা চার কি পাঁচজন। লড়াইয়ের আগে তুড়ির যা বাণ্ডিল ছিল, এখন তার দাম হয়েছে তিন থেকে পাঁচগুণ। লাক্ষার দাম কমেছে সেখানে টাকায় আট আনা থেকে বারো আনা। আগে প্রচুর লাক্ষা যেত ইংলণ্ড, আমেরিকায়। জার্মানিতে কৃত্রিম রেজিন তৈরি হওয়ার পর থেকে লাক্ষার বাজার গেছে।

অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি, এই দু-কারণেই ধানের চাষ এদিকে আগের চেয়ে কমে গেছে। বন্যায় কম নষ্ট হয় বলে পাটের চাষটাই বেড়েছে। ক-বছর

পাটের দরও পাওয়া গেছে ভালো। কালীগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ, নিমতিতায় স্থানীয় লোকের আড়তই আছে দেড়শো। তাছাড়া বাইরের স্বরজমল জৈন, মঙ্গলবাবু, জে. সি. মুখুয্যে—এদেরও আছে শতখানেক আড়ত। পাটের কেন্দ্র হিসেবে নিমতিতার স্থান ধুলিয়ানের ঠিক পরেই। নৌকো, ট্রাক আর ট্রেনে বছরে আট দশ লক্ষ মণ পাট এখান থেকে চালান যায়। রাজমহল বা কাছাকাছি আরও নানা এলাকার পাট নিমতিতা হয়েই যায়। চাষীর হাত থেকে কমপক্ষে চার হাত ঘুরে পাট যায় চটকলে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো যেতে ফারাক হয় পাঁচ-সাত টাকার।

রাধানাথবাবুর দুই ছেলে সৌম্যেন আর খোকন। ওদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। ঠিক হলো নুরপুরে যাওয়ার পথে গাড়ুলীপাড়াটা একবার ঘুরে যাওয়া যাবে। গাড়ুলী নামটা আগে কখনও শুনিনি। শুনলাম নিচু জাত; কম্বল বানানো পেশা। বোকা লোককে আমরা গাড়ল বলি কেন? গাড়ল মানে কী? খোকন তক্ষুনি একটা অভিধান এনে হাজির করল। 'গাড়ল'। গাড়ল মানে ভেড়া। যারা গাড়ল পোষে তারাই গাড়ুলী। এরা এক-ধরনের আদিবাসী। বিহার থেকে বাংলায় এসেছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে ভাঙা হিন্দীতে।

রাস্তার ওপারে নদীর ধারে ছোট পাড়া। আট-দশ ঘর গাড়ুলীর বাস। মাইল তিনেক দূরে আলমশাহী, বাসুদেবপুর, মজিলপুর—পাশাপাশি তিনটি গাঁয়ে থাকে আশী-নব্বই ঘর গাড়ুলী। জঙ্গীপুর মহকুমার বাইরেও মুর্শিদাবাদ জেলার আরও নানা জায়গায় এদের বাস আছে। তাছাড়া বিহারের গাড়ুলীদের সঙ্গেও এদের বিয়ে-থা হয়।

গাড়ুলীপাড়ায় ঘর বলতে সবই খড়ের চালা। মহেন্দ্র ঘোষের দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ একথা-সেকথা হলো। তারপর দুলু ঘোষের সঙ্গে পাড়াটা একবার টহল দেওয়া গেল।

এ পাড়ায় জমি কারো নেই বললেই চলে। সামান্য একটু বাস্তু আর দু-এক বিঘে চাষের। থাকবার মধ্যে সব বাড়িতেই কম্বল বোনার একটা করে সাদাসিধে যন্ত্র।

বাংলা-বিহারের অনেক জেলাতেই চাষীরা বাড়িতে ভেড়া পোষে। ভেড়ার মাংস কিংবা ভেড়ার লোমের চেয়েও তাদের কাছে কদর বেশি ভেড়ার নাদির।

কেননা ভেড়ার নাদিতে ভালো সার হয়। বাংলা-বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাড়ুলীদের ভেড়ার লোম যোগাড় করতে হয়। বছরে বেরোতে হয় তিনবার। কেননা ভেড়ার লোম কামাবার তিনটে সময়: মাঘ-ফাল্গুন, জষ্টি-আষাঢ়, আশ্বিন-কার্তিক। বছরের অর্ধেক সময় তাদের বেদের টোল ফেলে ঘুরতে হয়।

লোমের জন্যে গেরস্থকে ভেড়াপিছু দিতে হয় এক আনা দু আনা। লোম কামাতে লাগে একটা হেঁসোর মতো যন্ত্র কিংবা কাঁচি। একেকটা বস্তায় দুশো ভেড়ার লোম হয়। পঁচিশ-তিরিশ সের তার ওজন। পাঁচ-ছটা কম্বল হবে তাতে। জঙ্গীপুরে আছে ভেড়ার লোমের মহাজন। তাদের কাছ থেকে কিনতে গেলে দর পড়ে মণকরা নিরেস তিরিশ টাকা। তাও কশাইখানার চুনমেশানো লোম। কারণ, ভেড়ার চামড়া থেকে ওরা লোম তোলে চুন লাগিয়ে। মহাজনেরা যে সরেশ লোম বেচে তার দর আশী থেকে একশো টাকা।

লোম আনবার পর থাকে ধোয়াবাছার কাজ। রংওয়ারি বেছে বেছে লোমগুলোকে আলাদা করতে হবে। নলের ঝুড়িতে লোম নিয়ে গঙ্গায় চুবিয়ে ধুতে হবে। ধোয়ার পর শুকোনোর পালা। তারপর তুলো ধোনার মতো করে ধুনে চরকায় সুতো কাটতে হবে। সুতো কাটার পর তানাহাঁটি করে ঝাঁপে বুনতে হবে। তাও সবটা একবারে নয়। আলাদা আলাদা চারটে ফালি বুনে সেগুলোকে সেলাই করে জুড়ে দু-পাশে ঝালর লাগিয়ে তারপর জমাট করতে হবে।

আটপৌরে একেকটা কম্বল বেচে দশ-বারো টাকার বেশি পাওয়া যায় না। পাঁচ ফালি জোড়া-দেওয়া একেকটা অর্ডারি ভালো কম্বল বেচলে পাওয়া যায় গোটা তিরিশেক টাকা। তেমন অর্ডার দু-চারখানার বেশি মেলে না। বছরে একবার মালদহের রামকেলির মেলাতেই যা কম্বল বিক্রি হয়। আর হয় পাইকাররা বাড়িতে এসে কিনলে। চারজন খাটবার লোক থাকলে কম্বল হয় দু-দিনে একটা। বোনার যন্ত্র সাত টাকা, চরকা সাত টাকা আর কাঁচির দাম পড়ে বাইশ থেকে পঁচিশ টাকা।

এ পাড়ায় মাঝবয়সীরা লেখাপড়া বড় একটা জানে না। কিন্তু সবাই প্রায় তাদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে দিয়েছে। এ পাড়ার একটি মেয়ে বছর আট-দশ আগে আর একটি ছেলে বছর পাঁচ-ছয় আগে ম্যাট্রিক দিয়েছিল।

পাশ করতে পারে নি। পরীক্ষা দেবার বছর দুই পরে মেয়েটি মারা যায়।

শুনে সৌম্যেন বলল, 'জানেন, আমাদের বাড়িতে মেথরের কাজ করে যে নগেন জমাদার, নিজে নিজে বাড়িতে সে বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। আর নগেনের বড় মেয়ে ভারতী পড়ছে হাইস্কুলে।'

নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে অনেকখানি রাস্তা ভেঙে যখন আমরা আমবাগানে এলাম, তখন ছবি তোলার কাজ পুরোদমে চলেছে। ট্রলির ওপর ক্যামেরা বসানো। আমের ডালে দোলনা বাধা। রীণা তার ওপর বসে। শাড়ি পরে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

দুশো গজ দূরে দাঁড়ালেও সত্যজিৎকে চোখে না পড়ে পারে না। যা ঢ্যাঙা! তাছাড়া চোখেমুখে তখন তার অন্য ভাব। দেখে মনে হবে কিছুতে ভর করেছে। মাঝে মাঝে উঠছে পড়ছে একটা হাত। গোটা দলটা কেউ চালাচ্ছে, না আপনি চলছে বোঝবার উপায় নেই।

দোলনায় মৃন্ময়ী দুলছে। আস্তে। ডাঙার ওপরে ওপরে। তারপর জোরে। ডাঙা ছেড়ে আকাশ। পেছনে শুধু আকাশ। চোখের ওপর এখনও ভাসছে।

চায়ের বিরতি শেষ হতে না হতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। মাঝদরিয়ার নৌকোগুলো তরতরিয়ে ডাঙায় ভিড়ছে। পড়ে রইল চা। রায়ের ক্যামেরা তখন মেঘ ধরতে ব্যস্ত। মেঘের গায়ে চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। যে যেখানে ছিল নদীর পাড়ে ভেঙে পড়েছে। অনেক দূরে আকাশের গায়ে কী যেন চিক চিক করছে। পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'বৃষ্টি!' তখন পালে বাঘ পড়ার মতো এক দৃশ্য। যারা ছবি তোলা দেখবার জন্যে সকাল থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই সব হাওয়া।

নদীর পাড়ে অন্য দৃশ্য। ক্যামেরা গুটিয়ে সকলের আগে যাদের পালাবার কথা, সেই গোটা দলটা দেখি আনন্দে নাচছে। সেপ্টেম্বর মাস। এমন পাগলের মতো এসে মেঘ যে এমন লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে দেবে কে ভেবেছিল! অথচ ওরা যে মনে মনে এতক্ষণ এটাই চাইছিল বুঝি নি। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো গায়ে যেন নখের হিংস্র আঁচড় বসিয়ে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর

সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠছে মেঘ। দমকা হাওয়ায় টলে টলে উঠছে গাছ। মাঝে মাঝে হাওয়া যখন দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, ক্যামেরা চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

একে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবৃষ্টি, তার ওপর অনবরত জল লেগে লেগে চশমার কাঁচও ঝাপসা। হঠাৎ একটা রণধ্বনির মতো শুনলাম। দীর্ঘকায় একটা লোক তীরবেগে সামনের দিকে ছুটে গেল। নদীর ধার বরাবর পায়ে চলা রাস্তা ধরে। সাংঘাতিক পিছল হয়ে আছে এঁটেল মাটি। দলের পেছনে পেছনে আমিও ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে দুমদাম করে একেকজন পড়ছি। রায় পড়ে যেতেই পূর্ণেন্দু ক্যামেরা তুলে নিয়ে ছুটল। পূর্ণেন্দু পড়ে যেতে সত্যজিৎ। সত্যজিৎকেও পড়তে হলো।

বর্ষার সে ছবি পরে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ডকুমেন্টারিতে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। গলা বুঁজে এসেছিল দেখতে দেখতে। শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে কিভাবে ঢেলে দিতে হয়—সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলা আর সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখা, দুটো মিলিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট হলো।

পরদিন সকালে শুটিং নেই। শৈলেনবাবু এসে বললেন, 'চলুন, তাঁতীপাড়াটা ঘুরে আসি।' শৈলেনবাবুর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা, সেটা ফেরার সময় টের পেলাম।

তাঁতীপাড়ায় যেতে পথে পড়ল ঔরঙ্গাবাদের বাজার। বাজারটার খুব জাঁকজমক। রাত্তিরে গেলে দেখা যায় ফ্লুরেসেন্ট আলোর বাহার। এ জায়গাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে দেশভাগের পর। রাতবিরেতে নদীতে মাল পারাপারের ব্যবসায়। আয়ুব খাঁর আমল থেকে সে কারবারে বড় রকমের ঘা পড়েছে বলে শোনা যায়। অনেকে ধরা পড়েছে, সীমান্ত পুলিশের গুলি খেয়েও অনেকে মরেছে। নিমতিতায় সিনেমা বলতে এক ঔরঙ্গাবাদে। দেয়ালে দেয়ালে হিন্দী ছবির রঙীন পোস্টার। ঘিঞ্জি গলির মধ্যেও গায়ে গায়ে দোকান। দু-পাশে বিড়ির বড় বড় ফ্যাক্টরি। একটা সাইনবোর্ড দেখে বেশ মজা লাগল: অমুকচন্দ্র অমুক। নামের নিচে লেখা: বিলেত ফেরত।

ঠক-ঠকাস। ঠক-ঠকাস। তাঁতীপাড়ায় যে এসে পড়েছি, আওয়াজ

শুনেই তা বোঝা যায়। ঔরঙ্গাবাদে তাঁত আছে শ-তিনেক। দেড়শো দুশো ঘর তাঁতী। এ ছাড়া আড়াইশো তিনশো তাঁত আছে মোমিনদের। আবার কোনো কোনো মহাজনেরও তাঁত আছে। সেসব তাঁতে যারা কাজ করে তারা তাঁতী হয়েও আসলে অবশ্য মজুর। তাঁত থুইয়ে দোকান করছে, চাকরি করছে, জমিতে খাটাখাটুনি করছে—তেমন লোকও এ পাড়ায় যথেষ্ট মিলবে।

হরেন দাসের দাওয়ায় বসে সব শুনছিলাম।

সুতো কিনতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে। বত্রিশ আর চল্লিশ নম্বরের সুতোরই বেশি কাজ। বত্রিশ নম্বর আর চল্লিশ নম্বরের সুতোর পাঁচ-সেরী বাণ্ডিল হরেদরে একই পড়ে। চাল পেষো, তাতে তুঁত মেশাও, জ্বাল দিয়ে আঠা করো—তাতেই তো গলে যাবে পাঁচসিকে পয়সা। চল্লিশ নম্বরে ভাতের ফ্যান হলেই চলে যায়।

সুতো হলেই শুধু হলো না। সুতো রং করিয়ে আনতে হবে রংগোলা থেকে। তারপর জলকাচা করে রঙীন সুতোয় আঠা মাখানো। ববিনে সুতো জড়ানো। তারপর বাগানে নিয়ে গিয়ে সুতো খুলে তানা দেওয়া। চার মোড়া পাড় জুড়লে পর পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের বারো জোড়া কাপড় হয় এক বাণ্ডিল সুতোয়। এক বাণ্ডিল সুতো জড়াতে লাগে আশিটা ববিন। বাগানে শানার রীডের দুটো করে সুতো প্রতি খাঁজে পরানো হয়। তারপর সেই সুতো নরোদে জড়িয়ে বাগান থেকে বাড়িতে আনা। বাড়িতে এনে একজোড়া ব-র ভেতর দিয়ে গলিয়ে তাঁতে যখন লাগানো হলো, একমাত্র তখনই বোনার কাজ শুরু হতে পারবে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে বাগানের কাজ আর ফিট করার কাজ মিলিয়ে তিন দিনেই হয়ে যায়। নইলে বর্ষার সময় কখনও কখনও এক সপ্তাহও লেগে যায়। দিনে কাপড় হয় গড়ে দেড়-দুখানা; খুব বেশি হলে তিনখানা। দশহাতি কাপড় মাসে বিশ জোড়ার বেশি হয় না। মাসে কমপক্ষে ছ-দিন বাগানে কাজ, বাইশ দিন তাঁতে। দৈনিক আট ঘণ্টা খাটুনি। মাসান্তে মজুরি গড়ে পঞ্চাশ টাকা। সাজসরঞ্জামের পেছনেও মাসে চার-পাঁচ টাকা খরচ হয়। সে খরচ তাঁতীকেই দিতে হয়। নতুন একটা তাঁত তৈরি করতে একশো টাকা খরচ।

নিজের তাঁতে যারা পরের মজুর এ হলো তাদের কথা।

পুজোয় নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁত চালানো, সুতো কাপড় কেনাবেচা

একেবারে বন্ধ থাকবে। এখন তাই হাত চালিয়ে কাজ হচ্ছে। একাদশীর দিন প্রত্যেকটি তাঁতে হবে তাঁতপুজো। সেদিন তাঁতের গায়ে তেলসিঁদুর দিয়ে পুরুত ডেকে বিশ্বকর্মা পুজোর মতো সকাল দশটার মধ্যে ষোড়শোপচারে পুজো হবে। দুপুরে ভাত খাবে না কেউ, নিরামিষ লুচি তরকারি খাবে।

তাঁতীপাড়া থেকে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। হাটবার বলে সেদিন ভালো মাছ মিলেছিল। অনিলবাবু এমন ভাব করলেন যেন তাঁরই হাতযশ। আমি রেয়োভাট। আমি ওসব সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। খাওয়ার পর তিন তাসে দেখলাম আমার কপাল রীণার মার ঠিক পরেই।

কাজেই বিকেলে ভারী ট্যাক নিয়ে গেলাম নিমতিতার হাটে। রায়-বাড়ির ঠিক পাশেই নিমতিতার হাটতলা। হাট বসে হপ্তায় দুদিন। মঙ্গলবার আর শুক্রবার। হাটে অন্য যা সব থাকার তা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি করে চোখে পড়ল, তা হলো প্রচুর সংখ্যায় দেশী ঘোড়া। সওদাপত্র ঘোড়ার পিঠে আসে, ঘোড়ার পিঠে যায়। আশপাশের জেলা থেকে ধানও আসে ঘোড়ায়। ঘোড়া রাখলে গরুর গাড়ির চেয়ে খরচ কম হয়। বলদ তো আর একজোড়ার কমে হবে না। একজোড়া বলদের দাম ফেলেছেড়ে তিনশো টাকা। গাড়ি বানাতে চাকা ছাড়াও বাঁশটাঁশ লাগবে। দুটো চাকার দামই তো পড়ে যাবে ষাট থেকে একশো টাকা। সব মিলিয়ে শ চারেক টাকার ধাক্কা। তাছাড়া গরুর খড় কিনতেই তো ফতুর হয়ে যেতে হয়। পাওয়াও শক্ত। সে তুলনায় ঘোড়ার দানাপানি যোগাড় করাও সহজ, খরচও কম।

সন্ধ্যেবেলা রাধানাথবাবু নবদ্বীপ বিশ্বাসকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করাতে।

নবদ্বীপ বিশ্বাস থাকেন নিমতিতার পশ্চিমে ক্রোশখানেক দূরে ধুস্তরীপাড়া কলোনিতে। কলোনিতে আছে পৌনে চারশো মাছ-ধরা পরিবার। তারা এসেছে পাবনা জেলার সদরের বেড়া থানার নানান অঞ্চল থেকে। যমুনা আর হোড়াসাগর বা বড়াল নদীর ধারেকাছে আগে এদের বাস ছিল। কলোনির বেশির ভাগ লোককেই ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছিল শুধু-হাতে। চার-পাচটার বেশি নৌকো বর্ডার পেরিয়ে আসতে পারে নি। যারা ট্রেনে করে এসেছে, তারা সঙ্গে জাল আনতে পারে নি।

দেশে ছিল নবদ্বীপ বিশ্বাসের চার-চারটে নৌকো। ছুটো ছিল সাতাশ-আটাশ হাত লম্বা, একটা বিশ হাত আর একটা হাত-চোদ্দ। আসবার সময় নবদ্বীপ বিশ্বাস শুধু বিশহাতি নৌকোটাই আনতে পেরেছিলেন। আর সেই নৌকোয় করে কিছু কোণা জাল। গ্রামের বাড়িতে তাঁর আরও ছিল বিস্তর জাল: বাছাড়ি, ঘনবেড়, খেওলা, ভেসাল, মই জাল, বিরিণ্ডি, বাঁশগেড়ে, ছাঁদি, শাংলো—আরও অনেক। আর ছিল সেই জগৎবেড় জাল, যা ফেলতে লাগে একশো জন লোক; পাশ থেকে তিনখানা নৌকো লাগে তিরিশ-বত্রিশ হাত, তদ্বির করতে ডিঙি লাগে চার-পাঁচখানা আর মাছ সরবরাহ করতে আরও চার-পাঁচখানা ডিঙি। সবই ফেলে আসতে হয়েছিল।

এপারে এসে ব্যবসা আর ঘর করবার লোনের টাকায় নবদ্বীপ একটা টুনিবেড় জাল করলেন। টুনিবেড় জালে লোক লাগে পঁচিশজন। তারপর হলো টানাবেড় জাল; টানাবেড়ে লোক লাগে বত্রিশজন। তিন বছর ঐ জালেই চলল। তারপর নবদ্বীপ শুরু করলেন ডিম ধরা সাবাড়।

নবদ্বীপের হাতে যেই দশ হাজার টাকা জমল, অমনি তিনি জগৎবেড় জাল তৈরি করতে লেগে গেলেন। নিজের টাকা ছাড়াও আলকাতরা ইত্যাদি বাবদ ঔরঙ্গাবাদের মুদিখানার এক দোকানদারের কাছে হাজার তুই টাকা দেনা আর তুজন মহাজনের কাছে হাজার পনেরো টাকা স্থদে ধার হলো। জগৎবেড় জাল তৈরি করতে পনেরো হাজার টাকা লাগল বটে, কিন্তু সেই এক বছরেই মাছ উঠল এক-লক্ষ বাইশ-হাজার টাকার। যেখানে যা ধারদেনা ছিল সব শোধ হয়ে গেল। লোকজনদের ছ-মাসের দেনাপাওনা মিটিয়ে হাতে নগদ লাভ থাকল পাঁচ-ছ হাজার টাকা।

তার পরের বছর? পরের বছর নদীতে মাছই হলো না। অথচ জালের কাছি প্রত্যেক বছরই নতুন করে কিনতে হয়। কাছি বলতে সত্তর বাম লম্বা (ছু-হাত ছড়ালে যতটা হয়, ততটাতে এক বাম) সাত ইঞ্চি মোটা পনেরোটা কাছি। এককেটা কাছির ওজন ছ হন্দর। বাষট্টি টাকা করে কাছির হন্দর। তাছাড়া তিরিশ-বত্রিশ টাকা মণের পাট লাগবে তিরিশ-চল্লিশ মণ; আর বারো-তেরো টাকা মণ দরের আলকাতরা একশো মণ। তাহলেই বুঝে দেখুন জগৎবেড় পোষার কী খরচ! পরের বছর মাছ না পেয়ে নবদ্বীপ বিশ্বাসকে হাজারে সাড়ে বত্রিশ টাকা স্থদে সাড়ে এগারো হাজার টাকা ধার করতে হলো।

পুঁজির অভাবে গত ক-বছর নদীতে জগৎবেড় জাল ফেলাই হয় নি। কিছু জমানো সোনা ছিল। বিশ-পঁচিশ ভরি চলে গেছে। তাছাড়া নদী ভাঙছেও খুব। কলোনির দশ আনা অংশই এখন নদীর পেটে।

নবদ্বীপ বিশ্বাসের অধীনে কাজ করে কলোনির শতখানেক জেলে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত: তারা যা মাছ ধরবে, তা থেকে দাদন ইত্যাদির টাকা কেটে নিয়ে যা থাকবে তার সমান ভাগ হবে। যারা বেশি খাটুনি করে, তারা একটা করে 'মান্ত' পায়। মালিক পায় খুব বেশি হলে পাঁচশো টাকা, ম্যানেজার তুশো-আড়াইশো, মুহুরি দেড়শো, মাঝি পঞ্চাশ। মোটা মোটা কাছি জলে যারা নামায় ওঠায় তাদের বলে 'শিশালদার'। তিন নৌকোয় শিশালদার থাকে ছ-জন। তারা প্রত্যেকে পায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে একটা সোরগোল ওঠায় ঘরের মধ্যে সকলেই আমরা কথা বলতে বলতে থেমে গেলাম। একটা আর্ত চিৎকার। একছুটে আমরা সবাই পুবের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে যতদূর দেখা যায় নিকষ কালো অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা পরিষ্কার একটা আওয়াজ: 'বাঁ-চাও, বাঁচা-ও, বাঁ-চা-ও'!

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর চারিদিক জুড়ে একটা বুকচাপা স্তব্ধতা আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

নদীর অন্ধকার জলে কয়েকটা আলোর ফোঁটা ছুটে গিয়ে একজায়গায় হয়ে আবার আলাদা হয়ে হয়ে পিছিয়ে এলো। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

পরে ভানুই খবর নিয়ে এলো। নৌকো উল্টে গিয়ে সাত-আটজন ডুবন্ত লোক 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে স্রোতে ভেসে চলেছিল। কয়েকটা নৌকো এগিয়েও ছিল সাহায্যের জন্যে। স্রোতের টানে তারা ভেসে যাচ্ছিল পাকিস্তানের দিকে। এগিয়ে যেতে পারলে হয়তো তাদের বাঁচানোও যেত। কিন্তু পাকিস্তানী পুলিশের খপ্পরে পড়বার ভয়ে শেষপর্যন্ত তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। 'বাঁচাও, বাঁচাও' আওয়াজটা কানের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রইল।

নিমতিতায় এখন সবচেয়ে ফলাও হয়ে উঠেছে বিড়ির ব্যবসা। বছর তিরিশ আগেও গ্রামে হুঁকোতামাকেরই বেশি চল ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় প্রয়োজনে খুচরোভাবে কিছুটা বিড়ি বাঁধা হতো। এখানে বিড়ির প্রথম কারখানা খোলে এম. বি. এম. কোং, বিশ্ববিজয় বিড়ি ফ্যাক্টরি। তখন থেকেই বিড়ি বাইরে রপ্তানি হতে থাকে। এখন তো ধুবড়ি, গুড়িয়া, ভাগলপুর, উত্তর বাংলা, কলকাতা থেকে বড় বড় লোক এসে এখানে কারখানা খুলেছে। এদিককার লোকের যার যেটুকু জমি ছিল নদীই তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কাজেই মজুরের কোনো অভাব হয়নি। অন্যান্য জায়গার চেয়ে মজুরিও এখানে কম। ক্ষেতমজুরদের দেড় টাকা রোজ। কাজেই বিড়ি কারখানা এখানে খুলবে না তো খুলবে কোথায়! কলকাতার রাজাবাজার থেকে নাসিরুদ্দিন, খলিল মিঞারা এসে এখানে কারখানা খুলেছে। কেননা কলকাতায় বিড়ি বাঁধতে হাজারে মজুরি দিতে হয় দু টাকা সাড়ে দশ আনা, এখানে দেড় টাকা।

মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানির কারখানাই এখানে সবচেয়ে বড়। খাস কোম্পানির অধীনেই কাজ করে দশ-বারো হাজার মজুর। তাছাড়া আছে মুন্সীদের অধীনে কাজ করা মজুর। সব মিলিয়ে মোট সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশ হাজার হবে। মৃণালিনীর দৈনিক বিড়ি হয় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ লাখ। তার পরেই হয় মলয় বিড়ি ওয়ার্কস্-এর। দৈনিক বারো-তেরো লাখ। এছাড়া আছে আসাম, নিউ আসাম, দিলীপ, বিশ্ববিজয়, এস. কে. খলিলুদ্দিন। সব ঘর মিলিয়ে এখান থেকে দৈনিক এক কোটি সওয়া কোটি বিড়ি বাইরে চালান যায়। পাঁচ টাকা করে হাজার হলে রোজ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বিড়ি। তার জন্যে মজুরি দিতে হয় রোজ প্রায় হাজার পনেরো টাকা।

কোম্পানির মালিকরা নিজেদের কারখানায় সব বিড়ি তৈরি করে না। তাদের সাব-এজেন্ট থাকে। এই সাব-এজেন্টদের বলে মুন্সী। মালিকরা মুন্সীদের দেয় সুতো, তামাক আর বিড়ির পাতা।

সাধারণ হাজার বিড়িতে লাগে পাঁচ ছটাক তামাক। বড় বিড়িতে ছ ছটাক। বড় পাতার বড় বড় বাণ্ডিলে থাকে দু সের আড়াই সের পাতা। তাতে তিন হাজার বিড়ি হয়। দেড়-দু ছটাক ওজন হয় ছোট পাতার ছোট ছোট বাণ্ডিল। তাতে বিড়ি হয় একশো থেকে একশো বিশ। এককেটা বড় পাতায় পাঁচ ছটা আর ছোট পাতায় গোটা দুই।

কোনো কোনো কোম্পানির মুন্সী হতে গেলে দুশো-আড়াইশো টাকা কোম্পানির কাছে জমা রাখতে হয়। সেই সঙ্গে এমনও চুক্তি থাকে যে, দৈনিক পঞ্চাশ হাজার বিড়ি বানিয়ে দিতে হবে। মুন্সীরা মজুর খাটায় দু-ভাবে। আটচালায় লোক বসিয়ে কারখানা খুলে, কিংবা মজুরদের বাড়িতে বাড়িতে বিড়ির মশলা জুগিয়ে। কারখানায় যারা খাটে তারা পায় দেড় টাকা আর বাড়িতে বসে কাজ করলে পায় এক টাকা ছ আনা।

আগে মুন্সীদের ছিল পঞ্চাশ টাকা মাইনে। মজুরদের ছিল তিরিশ টাকা। তখন মুন্সীরা করত কি, কোম্পানির কাছ থেকে দাদন-পাওয়া তামাক আর পাতা মজুরদের কম করে দিয়ে বাড়তি তামাক আর পাতা চোরাবাজারে বেচে দিয়ে দেদার পয়সা করত। তাছাড়া সে-সময়ে ঔরঙ্গাবাদে ছিল চোরাচালানের বড় রকমের ব্যবসা।

আর একটা ব্যাপারে মালিকদের সঙ্গে ষড় ছিল বলেই মুন্সীদের ওসব হাতটান মালিকরা দেখেও দেখত না। ব্যাপারটার নাম ছাঁটাই। মুন্সীদের যোগানো তামাক আর পাতা থেকে মজুররা যেসব বিড়ি তৈরি করে দিত, তার নানারকম খুঁত বার করে মুন্সীরা বেধড়ক বিড়ি ছাঁটাই করে দিত। এইসব বিড়ি বাবদ মজুররা কোনো পয়সা পেত না। সেই ছাঁটাই-করা বিড়ি মুন্সীদের কাছ থেকে নিয়ে বিড়ি কোম্পানিগুলো বাজারে বেচত। এই বিড়ির জন্যে কোনোরকম মজুরি দিতে হতো না বলে মালিকদের মোটা লাভ হতো। দিনে যে মজুর দু-হাজার বিড়ি বাঁধত, দিনের শেষে তার পাঁচশো বিড়িই হয়তো বাতিল করে দিত। এ ব্যাপারে রেকর্ড করেছিল বেলাল মিঞার মুন্সী। হাজারের মধ্যে একেবারে সাতশো।

মুন্সীরা যাতে বেশি বেশি করে খুঁত ধরে বিড়ি ছাঁটাই করে, তার জন্যে মালিকদের দিক থেকে নানা রকমের লোভনীয় ব্যবস্থা থাকত। মুন্সীরা পেত রকমারি বখশিস—কেউ গ্রামোফোন, কেউ রেডিও, কেউ হাতঘড়ি।

কিন্তু বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কেঁচে গেল। মজুররা কোর্টকাছারি করায় সরকারের পক্ষেও আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। ত্রিদলীয় সম্মেলনে বসে রফা হলো এই যে, মুন্সীরা এখন থেকে মাসমাইনের বদলে কমিশনে কাজ করবে। আর ছাঁটাইয়ের ব্যাপারটাও আগের মতো ঢালাওভাবে হতে পারবে না; ছাঁটাই চলবে হাজারে দু-মুঠো—পঁচিশটায় এক মুঠোর হিসেবে দু-মুঠোয় পঞ্চাশটা। এখন সেইভাবেই চলছে।

চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সাল অবধি বিড়ি কারখানায় আরও একটা মধ্যযুগীয় প্রথা ছিল। তার নাম ঈশ্বরবৃত্তি। এ প্রথাটা এসেছিল সটান সেকালের জমিদারদের কাছ থেকে। মজুরি থেকে সপ্তাহে চার আনা করে পয়সা কেটে রেখে দেওয়া হতো ঠাকুর-দেবতার নামে। সে টাকার কোনো হিসেব থাকত না। গোটাটাই যেত মালিকের পকেটে। শেষপর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপে এই বাজে আদায় বন্ধ হয়।

যে জুলুমগুলো নিমতিতায় বন্ধ হয়েছে তার অনেকগুলো নাকি এখনও ধুলিয়ানে চলছে। আসলে মজুরের ঘরে সিঁদকাঠি দেওয়াটা বন্ধ হয়নি। বন্ধ হবারও নয়। যেটা ঠেকানো গেছে, সেটা হল দিনে-ডাকাতি।

বিকেলের দিকে গ্রামের ভেতরটা খানিকক্ষণ ঘুরলাম। গ্রামে এমন বাড়ি খুবই কম যেখানে বিড়ি বাঁধা হয় না। পাড়ার মধ্যে অনেক ঘুরেও কানে কোনো গ্রাম্য সুর ভেসে এলো না। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে কেউ কেউ গাইছে হিন্দী সিনেমার গানের কলি।

পৌষ মাসে নাকি এসব দিকে এখনও কী একটা গান হয়। শাগবোল, না সাঁঝবোল। ছেলেরা দল বেঁধে বেরোয় সন্ধ্যেবেলায়। শাগবোল গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-পয়সা চাঁদা তুলে বেড়ায়। তারপর সংক্রান্তি নাগাদ সেই চাঁদায় চড়ুইভাতি করে।

আর এক আছে আলকাপ। সামাজিক প্রহসন ধরনের এক রকমের যাত্রা। স্থানীয় ভাষায় লেখা। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত লোকেরাই এসব জিনিস লেখে। বেশি দেখা যায় মেলায় আর নিচু সমাজে।

এ গ্রামে গত বিশ বছর ধরে উচ্চশিক্ষার দিকে সাধারণ মানুষের একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে! নাপিত, রাজবংশী, মাহিষ্য পরিবারে গ্র্যাজুয়েট আছে। মাঝারি চাষীর মেয়ে আছে স্কুল ফাইনাল পাশ। নাপিতদের এক ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে সেট্‌লমেন্ট অফিসে কাজ করছে। পড়াশুনো করেছে সে বিড়ি বেঁধে।

স্কুলে-পড়া অনেক ছেলেমেয়েকেই বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধতে হয়। শুধু পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে নয়, সংসারের সাশ্রয়ের জন্যে।

বাড়ির মেয়েদের কথা তো ওঠেই না। বিড়িমজুরদের তিন ভাগের এক ভাগই মেয়ে। শুধু বাড়ির মা-বউরা নয়, মেয়েরাও ছোট থেকে বিড়ি বাঁধে।

এ গ্রামের মেয়েরা চাষী পরিবার হয়ে থাকার সময় আগে কখনও যা পায়নি, আজ বিড়ি বাঁধার কাজ ক'রে তা পাচ্ছে। বাড়িতে এই প্রথম তারা পাচ্ছে মর্যাদা। বিড়ি বেঁধে তারা পায় পুরুষের সমান মজুরি। বিড়ি বাঁধার কাজ জানে বলে বিয়ের বাজারে এ-গাঁয়ের মেয়েদের খুব আদর। এদিকে বাপ-মারাও রোজগেরে মেয়েদের হাতছাড়া করতে চায় না। এমনও নাকি হয়েছে যে, বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়ি এলে তাকে নানা অছিলায় আটকে রাখা হয়েছে—শ্বশুরের ঘরে পাঠানো হয়নি। অবশ্য পুরোটাই যে মেয়ের অমতে তা নয়। তার কারণ, বিড়িবাঁধা মেয়েরা একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষী ঘরের বউ হয়ে নিজেদের পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারে না। এখানে যাহোক হাতে দুটো কাঁচা পয়সা থাকে; শখ-সৌখিনতা করবার ইচ্ছে হলে ভিখিরির মতো কারো কাছে হাত পাততে হয় না। শ্বশুর-বাড়িতে সে স্বাধীনতাটুকু কে দেবে?

মোট কথা, নিমতিতার গ্রামগুলোতে বিড়িবাঁধা পরিবারগুলোতে মজার মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। পুরনো সংস্কারের বাঁধনগুলো এখনও বজ্র আঁটুনি না ফস্কা গেরো, জোর করে কিছু বলা শক্ত।

এ গাঁয়ের বিয়ে-হওয়া মেয়েরা সেই ছড়াটা জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। সেই যে সেই ছড়াটা—

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম
এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক টুক করে—
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে।
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

এদিকের অঞ্চলগুলোতে জমিদাররা এখন সেই হিতোপদেশের নখদন্তহীন বাঘ। বেনামীতে আর কত জমিই বা খাস করে রাখা যায়। বনেদী হিংস্রতার মধ্যে একটা পালিশ ছিল। নতুন বড়লোকদের সেই পালিশটা নেই। পালিশটা আনতে তাদের সময় লাগবে। ঈশ্বরবৃত্তি উঠে যাওয়ার ব্যাপারটাই

ধরুন না কেন। অমন গাঁক-গাঁক ভাব চলবে না। ফোঁটাতিলকে স্বভাব আস্তে আস্তে মিহি হবে।

নতুন যারা বড়লোক হয়েছে, তারা সকলেই বিড়ির পয়সায় বড়লোক। চাষ-আবাদ করে নয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নামডাক দু-জনের। এক জনের বাড়ি ছাবঘাটি গ্রামে, আরেকজনের বাড়ি ধুলিয়ানে। দু-জনেই পয়সা করেছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে। এদের প্রত্যেকেই নাকি কোটিপতি। ব্যবসাতে একেকজনের বিশ-তিরিশ লাখ টাকা খাটছে।

যিনি ছাবঘাটির তাঁর বয়স ষাট। তাঁর দাদা হাটবাজারে দা-কাটা তামাক বিক্রি করতেন। দাদা ছিলেন নিরক্ষর, ভাইয়ের কিন্তু সামান্য বাংলা জ্ঞান আছে। মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালেও ছেলেদের ইনি ইস্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন। বড় ছেলে বিয়ে করেছে নিজে দেখে।

কলকাতায় অফিস এলাকায় বাড়ি আছে, ভাড়া খাটে। এখানকার বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে, রেডিও আছে। বইপত্র কিনে সাজিয়ে রাখার অভ্যেস যে নেই সেকথা সবাই জানে। ফুলের বাগানটাগান? সে-সবও নাকি নেই। ফিল্মে একবার টাকা লাগিয়েছিলেন। তারপর আর বেলতলা-মুখো হননি। বিড়ি ছাড়া আর কোনো ব্যবসাও বিশেষ নেই। গ্রামের শিক্ষিত লোকদের টানারও কখনও কোনো ব্যবস্থা করেননি। অভ্যেসটভ্যেস সব রকমেরই আছে। দানধ্যান বলতে নিজের গ্রামে একটা ইস্কুল আর মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র।

ধুলিয়ানের যিনি টাকার কুমির, তিনি আগে ছিলেন রাজমিস্ত্রি। নিজের বিড়ির প্রচারকৌশলের দিক দিয়ে কিন্তু তিনি সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রোজেকটর আছে। নিজের বিড়ির বিজ্ঞাপনের ছবি তুলে লাইনে লাইনে তিনি দেখিয়ে বেড়ান।

মালিকদের টাকার পাহাড় তুলতে গিয়ে মজুরদের ফুসফুসগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে যক্ষ্মায়। হাড়ভাঙা খাটুনি, দিবারাত্রি বসে বসে কাজ, তামাকের ধুলো, পুষ্টিকর খাবারের অভাব—সব মিলিয়েই বোধহয় এমন হচ্ছে। শিগগিরই একটা চেস্ট ক্লিনিক খোলা হবে। জায়গা নেওয়া হয়েছে স্টেশনের পেছনে। টাকা উঠেছে হাজার চোদ্দ-পনেরো। তার ইতিহাস আছে।

একবার মজুরদের তরফ থেকে এই বলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল যে, সরকারী ব্যবস্থামতো ন্যূনতম মজুরি তাদের দেওয়া হচ্ছে না। যাইহোক,

শেষ পর্যন্ত একটা আপস হলো। মিটমাট হলো এই শর্তে যে, মালিকরা নিজেরা টাকা তুলে মজুরদের জন্যে একটা চেস্ট ক্লিনিক খুলে দেবে। সেই টাকাতেই ক্লিনিক হচ্ছে।

এক হাতে ফুসফুসে ঘা করা, অন্য হাতে সেই ঘায়ে মলম দেওয়া। শুনে খুব হাসি পেল। তামাসাটা মন্দ নয়।

সন্ধ্যের পর পুবের বারান্দায় গোল হয়ে বসে ঘরোয়া খেলা হচ্ছিল। সত্যজিৎ এত খেলাও জানে। বুদ্ধির খেলা বলে প্রত্যেকটাতেই আমি হেরে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ বংশী আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য-হওয়া গলায় বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন—কী ওটা?'

রেলিঙে ভিড় করে আমরা সবাই বংশীর আঙুলের নিশানা লক্ষ্য করে তাকালাম। জ্বলজ্বলে একটা তারা। কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই। যেন হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে। কে যেন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল: 'স্পুৎনিক! স্পুৎনিক!'

আর কোনো কথা নয়। আমরা সব হুড়মুড় করে ছুটলাম ছাদে। গোটা আকাশটা পাড়ি দিয়ে চোখের আড়াল হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আশ্চর্য! কলকাতায় কতবার দেখবার চেষ্টা করেছি। ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়েছি রাস্তায়। কখনও দেখতে পাইনি। সেই স্পুৎনিক শেষে দেখলাম নিমতিতার আকাশে। একেই বলে কপাল।

নিমতিতাকে মনে থাকবে। নিমতিতা। তেতো কে বলল? মিষ্টি।

সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র

ধ্রুব গুপ্ত

আত্মসংকটের সরব ঘোষণামাত্রেই সম্ভবত এক ধরনের আত্মতৃপ্তি আছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকটের নানান আলোচনার মধ্যে যেন আমাদের আত্মকণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি অনেকটাই সক্রিয়। তাই মনে হয় সংকটের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আপসহীন আত্মজিজ্ঞাসায় স্থির করে নেওয়া উচিত এই সংকটের কতখানি আমাদের স্বকীয় সৃষ্টি।

একথা অনস্বীকার্য যে ব্যবসাগত সংকটের ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে—ছবির ক্রমহ্রাসমান সংখ্যায় তার একটা হিসাবনিকাশ পাওয়া যায়। যেহেতু অন্যান্য শিল্পাঙ্গের তুলনায় চলচ্চিত্র অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ সৃষ্টি কাজেই আর্থিক সংকট একে সহজেই বিপন্ন করে তোলে। কিন্তু কে জানে এই সংকটের অনেকটাই আমাদের অব্যবস্থারই ফলে তৈরি হয়েছে কিনা। 'স্টার সিস্টেমে'র প্রসাদে চিত্রতারকাদের পেছনে টাকার শ্রাদ্ধ করে অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীদের উপবাসী রাখার জঘন্য বিষম বণ্টনকে সমূলে উচ্ছেদ করলে আর্থিক সমস্যার সমাধানের পথ অনেকটাই সুগম হয়—Low Budget-এ ছবি করবার সুযোগ তৈরি হলে অনিশ্চয়তার আশংকা অনেকটা কমে যায়। সে ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কিছু না করে "বাংলা ছবি বিপন্ন" বলে শুধু কপাল চাপড়ে লাভ কি ?

অনেকে পরামর্শ দেন হিন্দী ছবি তৈরি করতে—সর্বভারতীয় দর্শক পাবার আশায়। এ-প্রসঙ্গে কতকগুলি মৌল প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রথম কথা, বোম্বের ছবির সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হলে বাংলাদেশে তৈরি ছবিকে নিতান্ত বেলেল্লাপনার আশ্রয় নিতে হবে—তাই করে ব্যবসায়ীদের ঘরে কিছু টাকা হয়তো আসতে পারে—কিন্তু এতে "বাংলা ছবির" কি উন্নতি হবে ? নিউ থিয়েটার্স-এর নজীর অনুযায়ী বলা যেতে পারে বাংলা ছবির হিন্দী সংস্করণ করতে কিন্তু সেটাও যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। বরঞ্চ ডাবিং-এর কথা ভাবা যেতে পারে—যে উপায়ে, ফরাসী পোলিশ

বা ইতালিয়ান ছবি ইংরেজভাষীর কাছে গ্রাহ্য করে তোলা হয়। কিন্তু ইতালীর কয়েকজন চিত্রনির্মাতার নির্লজ্জ হলিউড-অনুকরণের ব্যবসায়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা দেশের ছবির বোম্বে অনুকৃতির প্রস্তাব আদৌ গ্রাহ্য নয়।

সংকট মোচনে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে। নানা উপায়ে যোগ্য শিল্পীকে আশ্রয়দান, উৎসাহদান, আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করে বিদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিল্পকৃতির পরিচয়ের পথ সুগম করা, এসব কাজের মাধ্যমে চলচ্চিত্রশিল্পকে সরকার নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন। আমাদের সরকার করেছেন কিছু কাজ—কিন্তু সবক্ষেত্রেই তার যৌক্তিকতা সন্দেহাতীত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে 'পথের পাঁচালী'র সৃষ্টিকে সম্ভব করে গৌরব অর্জন করেছেন বটে তারপর এ-ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকার পরিচয় নেই। কাগজে-কলমে সভা-সমিতিতে অনেক বড় বড় কথা লেখা ও বলা হয়েছে—কাজের কাজ কিছুই হয় নি, এখনও সরকারপক্ষ প্রযোজক-পরিবেশকের পাপচক্র ভেদ করে 'সুবর্ণরেখা'র মতো উচ্চপ্রশংসিত ছবির মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন বটে তবে বিচারাদর্শের যে নমুনা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাতে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়—বিশেষ করে যখন সরকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি বিদেশে ভারতের মুখে চুনকালি মাখায়। আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজনের বিভ্রাটের বেদনাদায়ক স্মৃতি জাগিয়ে তোলার দরকার নেই। সুখের বিষয় সম্প্রতি Film Finance Corporation গঠিত হয়েছে যোগ্য শিল্পীদের ছবি করবার জন্য মূলধন ধার দেবে এবং বাংলা দেশে উৎপল দত্ত সে সাহায্য পেয়েছেন তাঁর 'ঘুমভাঙ্গার গান' ছবি তৈরীর জন্য। কিন্তু সরকারপক্ষ থেকে এ-ব্যাপারে আরো অনেক সাহায্যই প্রত্যাশিত। চলচ্চিত্রের শিল্পগত চর্চার মাধ্যমে চিত্রবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে এ-দেশে ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এ আন্দোলনের অনেক কাজই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

ব্যবসাগত বাধা মোটের ওপর বাইরের বাধা—এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সে বাধার অপসরণ সম্ভব হতে পারে—চলচ্চিত্র শিল্পান্দোলনকে তাই জোরালো করা দরকার। কিন্তু বাধা যদি অন্তরের হয় তবে তাকে বাইরে থেকে ফতোয়া জারী করে দূর করা সম্ভব নয়। যে-কোনো শিল্পের সৃজনীগত সংকটই হলো

অন্তরের বিপত্তি। সৃজনের ব্যাপারটি এমন গোলমেলে যে উপদেশদানে সে সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয়। তবুও "বাংলা ছবি বিপন্ন" এই রব ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়ে মুক্তচিত্তে ভাবা দরকার শিল্পগতভাবে বাংলা ছবি কতদূর এগোলো—যার জন্য আন্দোলন করা হবে তার প্রকৃত গুণগত চেহারাটা কি।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য 'পথের পাঁচালী' দিয়ে বাংলা ছবির যে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হলো তা সাত-আট বছর অতিক্রম করে আজ কোনো ফসল ফলাচ্ছে, এরূপ কোনো আনন্দকর সংবাদ নেই। ঐ ছবির অব্যবহিত পরে কয়েকটি উজ্জল সম্ভাবনায় আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হয়েছিল—ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' এই আশ্বাস দিল যে বাংলা চলচ্চিত্রকে সৎশিল্পের আসন দেবার ব্রতে সত্যজিৎ রায় হয়তো একক থাকবেন না। মৃণাল সেন 'বাইশে শ্রাবণে' প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেন। অসিত সেন এবং তপন সিংহ প্রমুখ দক্ষ কলাকুশলী বাংলা ছবিতে প্রশংসনীয় আঙ্গিকগত পারিপাট্য আনলেন—তাঁদের কোনো কোনো ছবিতে ('চলাচল' বা 'ক্ষণিকের অতিথি') সংবেদনশীলতার ছাপও পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে রাজেন তরফদার 'গঙ্গা' ছবিতে বলিষ্ঠ শিল্পকৃতির পরিচয় দিলেন। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম অব্যাহত চলতে থাকল, ঋত্বিক ঘটকও অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় চলচ্চিত্রে তন্নিষ্ঠ শিল্পচর্চ্চাকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

কিন্তু গত দু-বছরেই যেন হঠাৎ আবার সব শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে—এবং সেই হতাশাজনক সত্যটি প্রকট হয়ে উঠেছে—সত্যজিৎ রায় শেষপর্যন্ত বুঝি একক। ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'তে শোনা যায় আধুনিক সমাজজীবনের ট্র্যাজেডিকে চরম তিক্ততার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। অথচ সে-ছবি কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রদর্শনের জন্য ছাড়পত্র পাচ্ছে না—সরকারী ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও। 'কোমল গান্ধারে'র পর তিনি প্রকৃতপক্ষে তাই আমাদের কাছে নীরব। শুধু সাম্প্রতিক দুটি ছবির ('কুমারী মন' ও 'দ্বীপের নাম টিয়া রং') চিত্রনাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া গেছে—এবং তাঁর মতো শি ীর নাম ঐ দুটি ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকা তাঁর গুণগ্রাহীদের কাছে বিশেষ অস্বস্তিকর হয়েছে। 'গঙ্গা'র পরিচালক 'অগ্নিশিখা'র মতো চূড়ান্ত conventional নিম্নস্তরের ছবি তৈরি করে আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। মৃণাল সেন 'অবশেষে'তে উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত বাণিজ্যিক পাকচক্রে পড়ে মেলোড্রামার বন্যা বইয়েছেন বাধ্য হয়ে (আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে বাণিজ্যিক

সার্থকতার খাতিরে এরা শিল্পী-পরিচয় ঘোচাতে বসেছেন, সে সার্থকতাও ঐ দুটি ছবিতে অর্জিত হয়নি—মাঝখান থেকে চলচ্চিত্রের শিল্পমূল্য অর্জনের প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে)। অসিত সেন 'আগুনে' তারাশংকরের উপন্যাসকে গরম মশলায় রেঁধে পরিবেশন করেছেন। তপন সিংহ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' থেকে কঙ্কালসার ন্যারেটিভ রচনা করেছেন—তাতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভালো ক্যামেরার কাজ দেখা গেছে এইমাত্র। 'হেডমাস্টার' ছবিতে 'অগ্রগামী'-গোষ্ঠী যে সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন—তার কোনো প্রত্যাশিত চেহারা পাওয়া যায় নি 'নিশীথে' ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের গল্পকে রবারের মতো টেনে লম্বা করে বিরক্তিকর শ্লথগতি এক ছবি তৈরি করে, তার এক হাস্যকর স্বকীয় পরিণতি রচনা করে, এঁরা কর্তব্য সমাধা করেছেন। এখানেও শেষ পর্যন্ত লভ্য কিছু ভালো অভিনয়, দু-চার জায়গায় অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সৃষ্টি এবং ভালো ক্যামেরার কাজ।

গত বছরে অনেক নবাগত পরিচালকের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য সে সাক্ষাতের ফল আদৌ আশাপ্রদ নয়। প্রচুর ঢক্কানিনাদের শেষে স্বতীশ গুহঠাকুরতা এবং ভূপেন সান্যালের 'ঢেউ-এর পর ঢেউ' যখন প্রদর্শিত হলো, তখন দেখা গেল সেটি একগাদা picture postcard-এর বাণ্ডিলমাত্র—বাদবাকি সবকিছু বিরক্তিকর ছেলেমানুষি—কাব্যের ভেকধারী ন্যাকামি। সহজ পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও অরূপ গুহঠাকুরতার 'বেনারসী' শিল্পগত প্রত্যাশা পূরণ করে নি। আর নাগরিক জীবনের বাইরে চলচ্চিত্রের ভূগোলকে প্রসারিত করবার নাম করে 'কুমারী মন' বা 'দ্বীপের নাম টিয়া রং' যে শস্তামির পরিচয় দিল তাতে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে। 'কাঁচের স্বর্গ' অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—কোনো কোনো মহল থেকে একে বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা দেবার কথাও উঠেছে। অথচ এই omnibus entertainment-জাতীয় সেন্টিমেন্টাল ছবিটি প্রাক্-সত্যজিৎ পর্বের নভেলীছাঁদের ফর্মা—বাংলাছবির একটু ঘষামাজা চেহারা মাত্র—এই ছবি যদি 'নবতরঙ্গে'র প্রতিনিধিত্ব করে তবে সে নবতরঙ্গকে অন্যান্য শিল্পাঙ্গের পক্ষ থেকে বিদ্রূপ করলে বলবার কিছু থাকে না। বরঞ্চ প্রাচীনতরদের মধ্যে অজয় করের সাম্প্রতিক ছবি 'সাত পাকে বাঁধা'-তে সামাজিক বৈষম্যের পটভূমিকায় স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের চিত্রণে কিছুটা পরিণত বুদ্ধির ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু পারিবারিক ঘটনার ফর্মুলামাফিক ছবি তৈরি এখনও চলছে অব্যাহত। শরৎচন্দ্রীয় ভাবালুতার তরলীকৃত রূপ পরিবেশিত হচ্ছে অশ্রুপ্লাবী

ছবিতে—চরম দুঃখের বিষয় সত্যজিৎ রায়-এর পরও ঐ জাতীয় ছবি পয়সা পিটছে সবচেয়ে বেশি। 'বধূ' বা 'মায়ার সংসার' বা স্কুলপাঠ্য পুস্তকসুলভ দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের বুলি-মেশানো 'দাদাঠাকুর'-এর ব্যবসায়িক সাফল্য যে গৌরবের কথা নয়—একথা স্বীকার করবার মতো সৎসাহস ও অকপট শিল্পপ্রেম আমাদের পেশাদারী চিত্র-সাংবাদিকদের নেই।

সমস্ত হতাশার গুরুভারকে অগ্রাহ্য আমরা করতে পারি শুধুমাত্র একটি কারণে—সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম অব্যাহত এবং সর্বদাই নতুন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। তাঁর 'অভিযান' তাঁর অন্যান্য মহৎ শিল্পকর্মের সমপর্যায়ের সৃষ্টি না হলেও আশাভঙ্গের কোনো কারণ নেই প্রথমত এই কারণে যে, একজন স্রষ্টার সবকটি কাজেই সমান গুরুত্ব নাও পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত ঐ ছবি নানা গুণে সাধারণ বাংলা ছবির তুলনায় শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এবং সবচেয়ে বড় কথা ঐ বছরেই 'অভিযান' ছাড়াও তাঁর কাছ থেকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো মৌলিক সৃষ্টি লভ্য হয়েছে। প্রথানুসারী কাহিনী রচনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এক নিম্নগ্রামে নিবদ্ধ সঙ্গীতের মতো চিত্রনাট্যে কতগুলি উজ্জ্বল ক্ষণের সমাবেশে আধুনিক অস্তিত্বের আনন্দ-বেদনা স্ফটিকীকৃত রয়েছে ঐ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য়। দৈনন্দিনের ঊর্ধ্বে বাস্তবাতিক্রান্ত পটভূমিকায় কয়েকজন ব্যক্তি প্রথা ও অভ্যাসের পটকে উন্মুক্ত করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুভাবনায় মগ্ন বা চঞ্চল, তাদের সম্পর্কের আপেক্ষিকতাকে, তাদের মূল্যবোধের অনিশ্চয়তাকে কখনও মৃদু উপহাসে, কখনও অনুচ্চার ধিক্কারে, কখনও চাপা দীর্ঘনিশ্বাসে, চিত্রিত করা হয়েছে। রং-এর ব্যঞ্জনাপূর্ণ ব্যবহারে এ-ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন সমৃদ্ধি এনেছে। কেবলমাত্র এই স্বল্পাকৃতি ছবিটির অনন্যতা ও গভীরতাই বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পগত অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় যথার্থ চিহ্ন।

কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম যে এখনো বাংলা চলচ্চিত্রে কোনো স্থায়ী ও স্থির নব্য আদর্শের প্রবর্তন করতে পারে নি এই নিরাশকারী সত্যকে অস্বীকার করায় বিশেষ কোনো লাভ নেই। প্রতিকূল অবস্থার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে আত্মদৈন্য গোপন করবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করাই বরং শ্রেয়। কেননা আরমা জানি প্রতিকূল অবস্থাসত্ত্বেও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিফ্' সম্ভব হয়েছিল। চরম প্রতিকূল অবস্থাও 'পথের পাঁচালী'তে সত্যজিৎ রায়কে বাণিজ্যিক আপসের স্তরে টেনে নামায় নি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' যে আনুকূল্যের সৃষ্টি করেছিল তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে প্রত্যাশিত ফসল ফলাতে আমরা পারিনি, সে অপারগতা আমাদেরই। প্রতিকূল অবস্থা দূর করবার জন্য চেষ্টা চালানো হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পীদের মনে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহস, শক্তি ও সৃজনশীলতা না থাকে, তবে হাজার কান্নাকাটিতেও বাংলা ছবির কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবেনা। বাংলা ছবি 'বোম্বাই'-এর ছবি হলে ছবিরও লাভ নেই, বাংলারও না।

পাঠকগোষ্ঠী

মহাশয়,

পরিচয় চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায় শ্রীধ্রুব গুপ্ত মহাশয়ের "অভিযান" বিষয়ে আলোচনা সহসা চোখে পড়ল। আলোচনার পূর্বাপর জানি না। অতএব সে বিষয়ে নীরব থাকাই ভালো। শুধু একটি প্রতিবাদ জানাচ্ছি—নিতান্ত ব্যক্তিগত। আমার নামে একটি উক্তি শ্রীগুপ্ত তাঁর যুক্তির সপক্ষে (কিম্বা বিপক্ষে) এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা থেকে আমি নিজেই সঠিক ধারণা করতে পারলাম না সেরকম উক্তি আমি কোথায়, কবে, কেন করেছি। শ্রীগুপ্ত যদি স্মরণ করিয়ে দেন তবে উপকৃত হব। এবং উদ্ধৃতিহীন এই ধরনের দায়িত্ববর্জিত উক্তি "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন" বলে আমার স্কন্ধে আরোপ না করলেই সুখী হব। "নাকি" এই শব্দের ব্যবহার কি প্রমাণ করে না যে তিনি নিজেই নিশ্চিত নন আমি এই কথা বলেছি কি না? এহেন অনিশ্চয়তাসূচক কথা আলোচনার মধ্যে বোধকরি স্থান না পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভবিষ্যতে শ্রীগুপ্ত আমার বা অন্য যে কোনো মনুষ্যের উক্তি তাঁর লেখাতে গ্রহণ করলে তাকে যেন অক্ষত অবস্থায় যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধার করে লেখক হিসেবে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নববর্ষ সংখ্যা পরিচয় ২৫শে বৈশাখ প্রকাশের কথা ছিল। 'বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের কল্যাণে ছাপাখানা অচল হওয়ায় প্রকাশে কিছু বিলম্ব হলো। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।

কর্মাধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩ ইং মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেছেন। মাত্র দিন সাতেক পূর্বে তাঁর সত্তর বৎসর পূর্ণ হয়েছিল। রাহুলজী অবশ্য দীর্ঘদিন পীড়িত ছিলেন। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর স্মৃতিশক্তিও বিনষ্ট হয়েছিল। মস্কোতে প্রায় ছ-মাস কাল চিকিৎসায় তাঁর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি দেখা গিয়েছিল, কিন্তু স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্ধারের আশা ছিল না। তথাপি তাঁর দেহান্ত শুধু তাঁর প্রিয়জনদের নিকট শোকের কারণ নয়, তাঁর অগণিত দেশবাসীর, বিশেষ করে হিন্দী পাঠকসমাজের, পক্ষে পরম বেদনাদায়ক। পরিচয়-এর সুহৃদমণ্ডলীর পক্ষেও তাই আমরা সকলকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই—রাহুলজীর উদ্দেশে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

রাহুলজীর জীবন একালের একটি বিচিত্র কথা। শুধু জীবন-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও তা শ্রেষ্ঠ জীবনীকারের আদরণীয় শিল্পোপকরণ হতে পারে। সত্তর বৎসর পূর্বে তখনকার 'ইউ-পী'র পূর্ব-অঞ্চলের আজমগড় জেলার পন্‌ঠা গ্রামে তাঁর জন্ম। পারিবারিক নাম ছিল কেদারনাথ পাণ্ডে। গ্রামের ব্রাহ্মণ বালকের অনুরূপই তাঁর জীবনারম্ভ—গ্রাম্য শিক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতির নিয়মে বাঁধা হয়ে। সে গণ্ডী পেরিয়ে প্রতিভাবান কেদারনাথ যৌবনেই বৈষ্ণব মোহান্তের ধর্মজীবন গ্রহণ করেছিলেন—আর্যসমাজীদের সম্পর্কে এসে বেদাধ্যায়ন করেন। কিন্তু সামাজিক গণ্ডীর মতোই শাস্ত্রের গণ্ডীও একটি-একটি করে তিনি পেরিয়ে এলেন নির্ভীক মনে। অসহযোগের রাজনৈতিক অন্দোলনে বরণ করে নেন কারাবাস। তিব্বতী এক কারাসঙ্গীর সাহচর্যে আকৃষ্ট হলেন বৌদ্ধদর্শনে, ধর্মে ও সভ্যতায়। বৌদ্ধ শ্রমণরূপে সিংহলে বৌদ্ধ মঠে সুদীর্ঘকাল অধ্যয়ন করে লাভ করলেন বৌদ্ধ জগতের চরম মর্যাদা—'ত্রিপিটকাচার্য' এই উপাধি। সেই শ্রমণ-জীবনেরই নাম 'রাহুল সাংকৃত্যায়ন।'

কিন্তু প্রতিভা ও প্রাণাবেগ সেখানেও তাঁকে স্থাণু হতে দেয় নি। বারে বারে তিব্বতে গিয়েছেন—সেই তাড়নায়, জাপান হয়ে সাইবেরিয়ার পথে যান সোভিয়েত দেশ। দেখলেন নতুন কালের জীবন—গ্রহণ করলেন তার আহ্বান। দেশে ফিরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে বিহারের কৃষক আন্দোলনের,

স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। গ্রহণ করলেন কমিউনিস্টের প্রাপ্য সকল নির্যাতন। যুদ্ধান্তে লেনিনগ্রাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনায় গিয়ে 'ভারতের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে ফিরে আসেন দেশে—স্বদেশই তাঁর কর্মক্ষেত্র। গত পনের বৎসর তাঁর জীবন প্রধানত মহাপণ্ডিতের বিরাট অধ্যয়ন আলোচনা-গ্রন্থ প্রণয়ণের জীবন। রাজকীয়-সম্মান দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রভৃতির অভাব হয় নি, কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গে ও পারিবারিক দায়িত্বে সেই প্রসন্নচিত্ত বলিষ্ঠ পুরুষ সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারেন নি। প্রায় ১৭০ খানা গ্রন্থ তিনি তৎপূর্বে প্রণয়ণ করেছেন। অসামান্য যার মেধা, অসামান্য যাঁর দৈহিক শক্তি, প্রাণের দুর্দমনীয় তেজ, শেষপর্যন্ত পীড়া-কবলিত সেই মহাপণ্ডিত শয্যাগ্রহণ করলেন। স্মৃতিশক্তিও হারালেন। জীবনের জয়-পরাজয়ের এমন নিদর্শন দুর্লভ।

আগামী সংখ্যা 'পরিচয়'-এ আমরা রাহুলের স্মৃতিকথা প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। কিন্তু শুধু তা নয়, পরিচয়-এর পৃষ্ঠায় তাঁর কীর্তির পরিচয়, কেউ প্রদান করবেন, আমরা আশা করব।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এই বৈশাখে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মশতাব্দ সম্পূর্ণ হলো। সৌভাগ্যের কথা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাঙলাদেশে বিস্মৃত হবেন না—প্রতিদিন কিশোররাই পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন—সুকুমার রায়ের মতো। আমরাও আশা করেছিলাম পরিচয়-এর পাতায় এই শিল্পী পিতামহের কথা যথোচিত ভাবে স্মরণ করব। ব্যবস্থাপনার নানা ত্রুটীতে তা এখন সম্ভবপর হলো না। কিন্তু এই বৎসর যখন শতবার্ষিকীর বৎসর, তখন এই বর্ষকালের মধ্যে আমরা আমাদের ত্রুটী দূর করে সে কর্তব্যপালন করতে পারব, আশা করি। ইতিমধ্যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ও নব-প্রকাশিত 'সন্দেশ'কে এই শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্য অভিনন্দন জানাই। এ উপলক্ষে কিশোর-প্রতিষ্ঠান ও কিশোর-সাহিত্যের পরিচালকগণ সমবেত হয়ে কোনো একটি কেন্দ্রীয় আয়োজন করবেন, এবং কোনো একটি সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবেন—কিশোর গ্রন্থাগার, কিশোর-চিত্রশালা বা ঐরূপ কিছু—তা কি অসম্ভব?

গোপাল হালদার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হেমেন্দ্রকুমার লোকান্তরিত হলেন।

উনিশ শতকের শেষ যখন হব হব করছে তখন থেকে শুরু করে, বিশের শতকের দুপুর যখন গড়িয়ে যায় যায়, তখন তিনি বিদায় নিলেন। পঁচাত্তর বছর বয়স একটা শতাব্দীর তিনপাদ জুড়ে থাকে। হেমেন্দ্রকুমার রায় মৃত্যুকালে পঁচাত্তরের কোঠায় পা দিয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা যারা তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, জানি যে, দেহ তাঁর অনিবার্য, অমোঘ, নিশ্চিতভাবেই প্রতিনিয়ত কালের অধীনস্থ হচ্ছিল যদিও, মন তাঁর কোনোদিন বুড়ি ছোঁয়া ছোঁয় নি।

কেন না, হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন আজীবন চির-নবীনত্বের প্রতীকোপাসক, যদি তাকে তাই-ই বলা যায়; স্বীয় দীর্ঘজীবনে আকৈশোর যা তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন তা হলো শিল্প—কথাশিল্প, সৃজনধর্মিতা। এমনকি, আকস্মিক শেষবারের মতো রোগশয্যা গ্রহণ করার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্তও তাঁর বিশ্রামহীন লেখনী চালনা স্তব্ধ হয় নি। তাঁর সর্বশেষ লেখা এখনও মুদ্রিত হরফে পাঠকদের কাছে পৌছবার অপেক্ষায় রয়ে গেছে। এই লেখনীর কাছ থেকে বিশ্রাম না পাওয়া অনেক সময়, তাঁর নিজের কাছেই ক্লেশকর মনে হয়েছে। অনেক সময় তিনি 'কলমের দাসত্ব' থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন, 'ফরমায়েশী' রচনা জোগান দেওয়ার তাগিদ থেকে ক্ষান্তি। নিজের মনের মতো, প্রিয়তর আকাঙ্ক্ষাগুলি নিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে বাধা হয়েছিল সাহিত্য হাটের চাহিদা-জোগানের, প্রকাশনালয়ের মর্জি এবং একজন লেখকের জীবিকা, এমনকি হেমেন্দ্রকুমারের মতো একালের শিশু-সাহিত্যের, বলা উচিত কিশোর সাহিত্যের যশোশীর্ষে স্থাপিত, সর্বাগ্রগণ্য, লোকপ্রিয় সাহিত্যকারের পক্ষেও। (সাহিত্য ছাড়া জীবনে তিনি অন্য কোনোও পেশা ধরেন নি, প্রথম যৌবনে একটি ক্ষণস্থায়ী চাকরীতে বাঁধা পড়া ছাড়া; যা তিনি সামান্যতম বিকল্প পেয়েই ত্যাগ করে আসেন)।

রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি (হেমেন্দ্রকুমার) কবি, গল্প-লিখিয়ে, সাহিত্যিক এবং বাঙালী।" নিজের জীবনে রবীন্দ্র-কথিত এই চতুর্বর্গকে এমন উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার! আজীবন রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন, এই সেদিনও লিখে গেছেন, 'সৌখীন নাট্যকলায়

রবীন্দ্রনাথ।' শহর কলকাতারই পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে এই পরিবারের পুরনো আবাস। পরে নিজে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে বাড়ি করে চলে গিয়েছিলেন। সেই যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্রতা তিনি দেখেছেন, ভালবেসেছেন।

এ যুগে 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'পঞ্চনদের তীরে' প্রভৃতি এ্যাডভেঞ্চার ও ঐতিহাসিক কিশোরোপান্যাস গ্রন্থের রচয়িতা রূপেই হেমেন্দ্রকুমারের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ালেও, দীর্ঘজীবনে প্রবন্ধ-অনুবাদ-গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে সাহিত্যের নানাদিকে তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় দু'শ। শিশু-সাহিত্যের জাদুদণ্ডটি যখন তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সে কিন্তু তাঁর বেশ পরিণত বয়সেই। 'ভারতী'র যুগে যখন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তখন কিন্তু তাঁর পরিচয় শিশু-সাহিত্যিকরূপে নয়। "কবি-গল্পলিখিয়ে-সাহিত্যিক"রূপে। লিখেছেন অজস্র গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস। তাঁর 'ঝড়ের যাত্রী,' 'বেনোজল' এসব উপন্যাসের প্রকাশকালের কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। সে যুগের তাঁর 'তরুণী' উপন্যাস, পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়, আলোড়ন এনেছিল। এই কয়েকবছর আগেও তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' চলচ্চিত্র-রূপায়ণ হয়। গল্পকার হিসাবে হেমেন্দ্রকুমারের সুনাম শুধু এদেশে নয়, জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়ে বাইরেও পৌছেছিল। আর, তাঁর কবিতাবলী বই হয়ে বেরিয়েছিল সেযুগে।

বাংলাদেশের সে যুগের প্রত্যেকটি বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ। 'ভারতী' গোষ্ঠী থেকে শুরু, তারপর এলেন 'যমুনা'য়। সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে সৌহার্দ্য হলো তা শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তাঁর নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'নাচঘর' পত্রিকা—সাহিত্য ও শিল্পকলা-বিষয়ক সাময়িকী। যাতে অনেকেই সে সময় তাঁকে 'নাচিয়ে সম্পাদক' বলেছিলেন। বস্তুত, হেমেন্দ্রকুমার নৃত্য-পরিচালক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা ও তাঁর গানগুলিও তিনি লিখেছিলেন। সেই 'কঙ্কাবতীর অন্তরালে অশ্রুবাদল ঝরে' গান তো সেকালে ঘরে ঘরে পৌছেছিল। সাংবাদিক, নাট্যশিল্প-সমালোচক হিসেবেও তিনি পাত্র-পত্রিকায় একসময় নিয়মিতভাবে লিখেছেন।

শেষজীবনে তিনি যে মূল্যবান সম্পদ আমাদের দিয়ে গেছেন, সে তাঁর

স্মৃতিচারণ সাহিত্য। সেই 'ভারতী'র যুগ থেকে—"যাঁদের দেখেছি" "যাঁদের দেখছি।" তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত এই চিত্র-চরিত্র-পরম্পরা—বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের প্রবহমান ধারাটির,—রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত প্রধান-পুরোধা সাহিত্যিকদের যে সাক্ষাৎ স্মৃতিচিত্র তিনি এঁকে গেছেন, তা যেন তাঁর প্রথম জীবনের ছবি আঁকার হাতকেই লেখায় ফিরিয়ে দিলে। হেমেন্দ্রকুমার প্রথমজীবনে একবার চিত্রবিদ্যা চর্চা করেন। সেই সূত্রে আসেন অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে।

মনে আছে বেশ কয়েকবছর আগে একবার তাঁর অন্তরঙ্গ শিশিরকুমারের কাছে গিয়েছি। হেমেন্দ্রকুমার তখন অসুস্থ। শুনে শিশিরবাবু চুপ করে রইলেন। তারপর শিশিরকুমারের মৃত্যু হলো আগে। হেমেন্দ্রকুমার তখন আমায় বলেছিলেন, 'তোরা আমার আশাও আর বেশিদিন করিস না।'

সেই 'ভারতী'র যুগ থেকে একাল পর্যন্ত সাহিত্যের তিনযুগের হেমেন্দ্রকুমার নিজের সাধনধারায়, যোগ ঘটিয়ে গিয়েছেন। সেদিক থেকে একালের লেখকদের কাছে তিনি ঊর্ধ্বতন দুই বা তিনপুরুষ স্থানীয়।

সিদ্ধেশ্বর সেন

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য





কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে
৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

